রোড টু বাংলাদেশ সিরিজ
আতোয়ার রহমান

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট হাউস (৬ষ্ঠ তলা)
৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৫৬৫৪৪১, ৯৫৬৫৪৪৩, ৯৫৬৫৪৪৪
E-mail: info@uplbooks.com.bd
Website: www.uplbooks.com.bd

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৪
প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২

প্রচ্ছদ
রফিকুল ইসলাম

ISBN 978 984 506 191 9

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ। কম্পিউটার ফরমেটিং: নবনী কম্পিউটার্স, ২৬/বি তোপখানা রোড, ঢাকা। আবর্তনের তত্ত্বাবধানে একতা অফসেট প্রেস, ১১৯ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

সূচী

পূর্বকথা	v
আপন ঘরে ছোবল	১
বিহারীরাও মুসলমান	৬
কুলখানির পরও জীবিত	৯
তালেব সাহেবের খবর নেই	১৭
চঞ্চল–অঞ্জুর সংগ্রাম	২৮
যমের মুখ থেকে ফেরা	৩৪
বিহারীদের বিজয় অভিযান	৩৭
জনপ্রিয়তা বর্ম নয়	৪৪
সিঁদুর যাদের মুছে গেল	৪৯
সংগ্রাম ভিন্নতর	৫৬
ধসকেযাওয়া একজন	৬১
রাজিয়ার কিশোর বন্ধু	৬৪
রাজাকারের রাজাগিরি	৬৮
বাইয়ারার জ্যান্ত শহীদ	৭০
সাইজ্যা মিয়া কোথায় গেলেন	৭৭
পরিহাস নানাবিধ	৮১
জীবন যখন সূতোয় ঝোলে	৮৫
পালাতে গিয়ে পগারে পড়া	৯৩
সুলতান মুনশীর দুটি সপ্তাহ	৯৯
পার হলে পাটনী শালা	১০৯
প্রতিরোধের প্রতিশোধ	১১৩
ষোলোদাগে সন্ত্রাসরাজ	১১৭
আতিয়ারের অভিজ্ঞতা	১২৩
খাঁচার ভেতর খাঁচা	১২৬

বড়ো খাঁচায় এক দিন	১৩৩
আট মাসের নরকবাস	১৪২
গলার কাছে ইঞ্জিনের চাকা	১৪৮
নিষ্ঠুরতা কতো রকমের	১৫৭
হানা ঘরে ঘরে	১৬১
দিনটা কি খারাপ ছিলো	১৬৬
মিনি আকারে গণহত্যা	১৬৯
চণ্ডীপুরে চণ্ডলীলা	১৭৬
আবার আপন ঘরে ছোবল	১৮৫
এবং তারপর	১৯১
নির্ঘন্ট–ক	১৯৪
নির্ঘন্ট–খ	১৯৯

পূর্বকথা

১৯৭১ সাল। বাঙালী জাতির অস্তিত্বচেতনা শক্ত জমিনে প্রতিষ্ঠার কাল। যে-প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম স্বাধীনতা, সবচেয়ে বাস্তব পরিচয় বাংলাদেশ। পূর্ণ প্রাণের আকুল প্রার্থনার ফল। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর উৎসাহের মতো দীপ্ত এবং দৃপ্ত রক্তধারার সিঞ্চনে শ্যামলে সবুজে, ভেজা মাটির মন-মাতাল-করা সোঁদা গন্ধে ভরা একটি অনন্য-সাধারণ সত্তা। যা কবলিত ছিলো বিশ্বের হিংস্রতম শোষক-শাসকের তীক্ষ্ণনখ থাবায় এবং আমরা যা ছিনিয়ে নিয়ে পরম শ্রদ্ধায় আর ভালোবাসায় বিছিয়ে দিয়েছি পৃথিবীর মানচিত্রে, অমিত সম্ভাবনার রক্তলাল সূর্যের সুমুখে।

কিন্তু আমাদের দেহের প্রতিটি কোষে মিশে-থাকা রবীন্দ্রনাথের অমর বাণী,-পূর্ণ প্রাণে চাওয়ার জিনিষ শূন্য হাতে চাইতে নেই। রক্তলাল সূর্যই সাক্ষী, আমরা তার মূল্যও দিয়েছি পূর্ণ হাতেই। যা ছিলো আমাদের জন্মগত অধিকার আর জীবনের আমানত, তার মুখ চেয়ে। সে-মূল্যের এক নাম সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর এক দেহে এক প্রাণে রূপ নিয়ে সংগ্রাম, আর এক নাম শতবিধ ত্যাগস্বীকার তথা নির্যাতনভোগ। এই সংগ্রাম, ত্যাগস্বীকার আর নির্যাতনভোগের কালে প্রতিপক্ষ আমাদের কখনো বাধ্য করে প্রাণ দিতে, কখনো বিষয়-আশয়, কখনো বা মান-সম্মান-ইজ্জত। তবু আমাদের সংগ্রাম চলেছেই, চলেছেই, যতো দিন না দুশমনের 'খড়্গ-কৃপাণ'-এর ঝনাৎকার থেমে গেছে, বিষদাঁত সমূলে ভেঙে পড়েছে।

আমাদের জন্মগত অধিকার বাবদ এমনি মূল্য দিতে যারা আমাদের বাধ্য করেছিলো, তারা ছিলো নানা নামে পরিচিত। তাদের মূল দল আমাদের স্বদেশী, স্বজাতির মানুষের ছদ্মনামে হানাদার শ্বাপদবাহিনী। এবং তাদের দোসর ছিলো দুটি। চরিত্রে তারাও ভণ্ড এবং শ্বাপদ। একটি হল ভারত থেকে পালিয়ে এসে এই দেশেরই আলো-হাওয়ায় আশ্রয় নিয়ে, এরই মাটির রসে বেঁচে-যাওয়া কিন্তু আমাদের থেকে পৃথক সত্তায় এখানকার মানুষের বুকের ওপর মুরুব্বীর মতো চেপে-বসা তথাকথিত মোহাজেরের দল। অন্যটি ঘরের শত্রু বিভীষণ। যারা নকল দেশপ্রেম প্রদর্শনের নাটমঞ্চে দেখা দিয়েছিলো দালাল, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্, শান্তিকমিটি ইত্যাদির তকমা পরে।

এই তিন দুশমনের সন্ত্রাসী কীর্তিকলাপের কোনো তুলনা নেই। তৈমুর-চেঙ্গিসের বাহিনীর পর পৃথিবীর ঘৃণ্যতম হন্তা মার্কিন বাহিনী নাগাসাকি-হিরোশিমা-মাইলাইতে যা করেছে, নিষ্ঠুরতম জার্মান বাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের নানা দেশে-বিশেষতঃ, রাশিয়ায় যে পাশবিক লীলায় মেতে উঠেছে, উক্ত তিন দুশমনের কুকীর্তি সেসবকেও লজ্জা দেয়। মার্কিন-জার্মান-পাকিস্তানী এই সব পশুর অপরাধ সুস্থ মানবিক চেতনার কোনো মানুষ কখনো ভুলে যায়নি, কখনো তাদের ক্ষমা করেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রায় পাঁচ দশক পার হয়ে গেছে। কিন্তু আজও রাশিয়ার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকর্মের সিংহভাগ জুড়ে থাকে জার্মান হানাদারদের বর্বরতার কথা। হিরোশিমা-মাইলাইয়ের প্রসঙ্গে মার্কিন মুলুকের নাম শুনে সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ এখনো ঘৃণায় নাক সিটকায়। তাদের নিয়েও লেখা হয়েছে কতো কাহিনী! কেবল জাপানে, ভিয়েতনামে নয়, সেসবের বাইরেও নানা দেশে।

শুধু আমরা এক ব্যতিক্রম,-আজব এবং অকল্পনীয়। আমাদের সংগ্রাম আর প্রতিরোধের, ত্যাগস্বীকার আর নির্যাতনভোগের কাহিনী ছড়িয়ে আছে দেশের প্রতিটি শহর-বন্দরের অলিতে গলিতে, প্রায় পঁচাত্তর হাজার গ্রামের প্রতিটি পরিবারে। তার কোনো সংখ্যা নেই। সেসব কাহিনী আমাদের ইতিহাসের অঙ্গ। সেগুলির সমাহারই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। অথচ সেদিকে দৃষ্টি দানের কথা আমরা ভেবেছি কদাচিৎ। তার এক অনিবার্য ফল, সমাজে রাজাকার আর মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদার আসনে অদলবদল ঘটছে। দ্বিতীয়তঃ, মৌলবাদের নবজন্মে আমরা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূল ভিত্তি বাঙালী জাতীয়তাবাদ হারিয়ে

বাংলাদেশীতে পরিণত হয়েছি। অন্য দিকে, ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা,–এমনকি, অনেক অধ্যায় একে একে লেখনের বা উদ্ধারের অতীত হয়ে বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে।

একটু আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি, ’একাত্তরের সংগ্রাম আর প্রতিরোধ, ত্যাগস্বীকার আর নির্যাতনভোগের ইতিহাস আমরা যে একেবারেই স্পর্শ করিনি, তা নয়। তার কথা ইতিমধ্যে কিছু কিছু অবশ্যই লেখা হয়েছে। কিন্তু তা এতোই অকিঞ্চিৎকর যে, তার উল্লেখমাত্রও লজ্জা দেয়। কেবল তা–ই নয়, তার মধ্যে একটি বিভ্রান্তিরও প্রকাশ আছে। লিখিত কাহিনীগুলির যাঁরা কুশীলব, তাঁরা কোনো না কোনো দিক থেকে বিশিষ্ট, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। অথচ ’একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে শরীক তো ছিলো আপামর জনসাধারণ, সর্ব শ্রেণীর মানুষ। কাহিনী কেন এই কথা মনে রেখে লেখা হবে না?

অবশ্যি, মনে রাখা ভালো, তেমন করে লেখা একা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্যে প্রয়োজন এক অক্ষৌহিণীর। তাই বলে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে – কিংবা হাত কোলে নিয়ে বসে থেকেও তো লাভ নেই। যতো দিন কোনো অক্ষৌহিণী এদিকে দৃষ্টি না দেয়, ততো দিন বিষয়টির প্রতি বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি দানে দোষ কি? আমার প্রয়াস বস্তুতঃ এমনি এক বোধেরই ফল। ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে/ তবে একলা চলো রে’,–এমন কিছু বলবার ধৃষ্টতা আমার অবশ্যই নেই। আমার এই সামান্য প্রয়াস কেবল এক ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ থেকে জাত দুঃসাহস। এবং এর লক্ষ্য শুধু সন্ত্রাসী নির্যাতনের সংবাদ সংগ্রহ।

প্রসঙ্গতঃ, ‘নির্যাতন’ শব্দটি আমি এ–গ্রন্থে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। বলা যায়, জাতি নির্যাতনের প্রতিশব্দ রূপে। আসলে ’একাত্তরে হানাদাররা সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে তৎপরতা চালিয়েছিলো, তাকে জাতি নির্যাতন ছাড়া আর কীই বা আখ্যা দিতে পারি? এই গ্রন্থে সংগৃহীত এবং বিবৃত ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, তারই কতকগুলি নমুনা।

কোনো কোনো ঘটনায় আমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনের কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি,–যেখানেই তা সম্ভব হয়েছে। এ–কারণে যে, বিবৃত ঘটনাগুলি ব্যক্তিজীবনের পটভূমিতে ব্যাপক তাৎপর্য রাখে। সে–তাৎপর্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। আমার অবশ্যি অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিলো। ঘটনাগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভবিষ্যতের পাঠকদের কৌতূহল নিবারণ। নির্যাতন যে কতো রকমের, কতো শ্রেণী, পেশা, মানসপ্রবণতা ইত্যাদির বাঙালীকে সইতে হয়েছে, ব্যক্তিপরিচয় সেসবের

অন্ততঃ কিছুটা আভাস দেবে।

সংগৃহীত ঘটনাগুলির বর্ণনাকালে আমি কোথাও কোথাও আনুষঙ্গিক কিছু কথাও বলেছি। বাহ্য দৃষ্টিতে এগুলিকে অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, এসবেরও ঐতিহাসিক প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে, যুদ্ধপরবর্তী কালের প্রজন্মের জন্যে। আনুষঙ্গিক কথাগুলি ছোটো ছোটো তথ্য। যেমন, রাজারবাগে হানাদারদের হামলার পর পালিয়ে-আসা পুলিসদের প্রতি প্রতিবেশী বাঙালীর সক্রিয় সহানুভূতি আর সাহায্য দান, অসহযোগ আন্দোলনকালে হার্ডিঞ্জ ব্রীজে রেলগাড়ী চলাচল বন্ধ থাকা, বিশেষ কোনো জায়গায় পীস কমিটি বা রাজাকার বাহিনী গঠনের তারিখ বা সময় ইত্যাদি। ছোটো বলে সংশ্লিষ্ট স্থান-কালের ব্যক্তি ছাড়া আর কারো এগুলি জানা বা মনে থাকার কথা নয়। নতুন প্রজন্ম এসব জানবে কেমন করে? অথচ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এগুলিরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই কথা ভেবেই আমি তথ্যগুলি বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি।

এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণেই এ-জাতীয় তথ্য আর ব্যক্তিপরিচয়, সংগৃহীত ঘটনার বিবরণ ইত্যাদির প্রামাণিকতার ব্যাপারে আমাকে যতো দূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। যাতে এসব নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো প্রশ্ন না ওঠে, কারো মনে কোনো সন্দেহ দেখা না দেয়। যেখানেই সম্ভব, নানারকম অসুবিধা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাঁদের বক্তব্য অন্যের মাধ্যমে যাচাই করে নিয়েছি। যেসব ক্ষেত্রে সংগ্রাহক লাগানো ছাড়া গতি ছিলো না, বলা নিষ্প্রয়োজন, সেগুলিতে আমার সবচেয়ে বড়ো কাম্য হয় তাঁদের বিশ্বস্ততা এবং সংগ্রহকার্যে আন্তরিকতা। এবং তাঁদের প্রতি আমার নির্দেশ তথা অনুরোধ ছিলো, তাঁরাও যেন ব্যক্তিগত যোগাযোগের পরও যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য বা বিবরণ গ্রহণ না করেন।

বিবরণাদি সংগ্রহকালে দেখেছি, এ-কাজ বড়ো কঠিন। এর একটি কারণ ব্যক্তিগত,-আমার স্থায়ী অসুস্থতা। অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিলো বিবরণদানকারীদের স্মৃতিভ্রংশ, অনাবশ্যক তথ্যদানের প্রবণতা, ঘটনার আনুষঙ্গিক বিষয়াদির গুরুত্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তি ইত্যাদি। এ-সমস্ত কারণে সব বিবরণই আমাকে সম্পাদনা করে নিতে হয়েছে। দুই-একটি ঘটনার কথা বাদ দিতেও। আর একটি উল্লেখ্য বিষয়,-কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটনার বিবরণদানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় উৎসাহের অভাব দেখেছি। এমনকি, অনীহাও। তাঁরা প্রথম দিকে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেও পরে আমাকে নিরাশ করেছেন।

একজন তো আমাকে মাস ছয়েক ঘোরানোর পর সাফ 'না' বলে দেন। তাঁদের এমনি ক্ষীণ উৎসাহ আর অনীহার কারণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাদ পড়ে বা অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

আমার এই দুঃসাধ্য এবং দুঃসাহসী প্রয়াসে উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন বহুজনে। তাঁদের মধ্যে আমার পরিবারের সদস্য আর আত্মীয়-স্বজন যেমন আছেন, তেমনি আছেন এমন অনেকে, যাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে কেবল তথ্যাদি সংগ্রহের প্রয়োজনে। এক পর্যায়ে তো আমার এমন অবস্থা ছিলো, যখন আমি প্রায় যাঁকে সামনে পেয়েছি, তাঁরই কাছে তথ্য বা ঘটনার বিবরণের জন্যে হাত বাড়িয়েছি। আবার বলি, আমার বয়েস এবং অসুস্থতা এ-ধরনের প্রয়োজনে ছোটাছুটির পথে ছিলো দুস্তর বাধা। তার ফলে, কেবল দূরের সমবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথেই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের ব্যক্তিদের সাথেও চিঠিপত্র, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটাতে হয়েছে। সাহায্য-সহযোগিতাকারীদের সবার কাছেই আমার ঋণ অপ্রতিশোধ্য। তাঁদের অধিকাংশেরই নাম আমি গ্রন্থের ভেতরে যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য কুমিল্লার বাইয়ারা গ্রামের পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা শ্রদ্ধেয় আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী, লেখক-মুক্তিযোদ্ধা শাহ কামাল, অনুজ আবদুল হাই (মাসুম), ভ্রাতুষ্পুত্র আখতার জামিল ওরফে একরাম, সহধর্মিনী লায়লা রহমান, প্রতিবেশিনী কল্পনা ধর গুপ্ত, ভাগিনেয় অমিতাভ রহমান ওরফে সুমন, ভগ্নীপতি আনিসুর রহমান আর প্রীতিভাজন নাজরুল খন্দকারের কথা।

সবশেষে আমার বক্তব্য, আমি যা করেছি-'মা ফলেষু কদাচন', এই কথা মনে রেখে করেছি। তবু আমার কৃতকর্মের বিচারের অধিকার তো অনিবার্যভাবেই পাঠকদের হাতে সংরক্ষিত।

আ. র.

আপন ঘরে ছোবল

আপন ঘরের কাহিনী দিয়েই শুরু করি। যে-কাহিনীর নায়ক আমার চাচাতো ভাই পুলিস অফিসার আবদুর রশীদের ছেলে বাবলু। পোশাকী নামে কায়সার রশীদ। 'একাত্তরে সে ছিলো আমার ঘনিষ্ঠতম মহলে পাকিস্তানী জিঘাংসার প্রথম শিকার।

কিন্তু তার কাহিনী বলবার আগে অনেক পরের একটি ঘটনার কথা বলে নিতে হয়। তাতে ওই কাহিনীর একটি আজব অথচ সত্যিকার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ঘটনাটি ১১ আগস্ট, '৭১-এর।

রাত তখন গোটা তিনেক। ফ্ল্যাটের গেটে দুড়ুম দাড়াম শব্দ শুনে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। গৃহিণীকে আস্তে করে বললাম, মিলিটারি এসেছে। গেট খুললেও দেখা যায়, তা-ই।

তাদের সঙ্গে বাঙালী রাজাকার ছিলো। সে বলে, বাসা সার্চ করবো।

সার্চ হয়। তারপর তারা আমাকে নীচে নিয়ে গিয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড় করিয়ে রাখে। এক পাশে ঝিলম থেকে প্রায় সদ্য-আসা এক ছেলেমানুষ গোছের রাইফেলধারী সৈন্য, অন্য পাশে এক রাজাকার। আমার মনের অবস্থা তখন যেমনি হোক, আমি আস্তে আস্তে এই দুই দেহরক্ষীর সাথে গল্প জুড়ে দিই। বিশেষ করে, রাজাকারটির সাথে। বোঝা যাচ্ছিলো, আদিতে সে ছিলো কলকাতার বাসিন্দা। তখন ঢাকার মীরপুরের। নাম মোহাম্মদুল্লাহ্।

কথায় কথায় এক সময় সে আমাকে বলে, ইস্ট পাকিস্তান মে আদমি

জিয়াদা হো গিয়া। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে মানুষ বেশী হয়ে গেছে।

সহজেই অনুমেয়, তার কথার অনুক্ত অংশ ছিলো, অতএব কমিয়ে ফেলতে হবে। এবং বলা বাহুল্য, তাদের কাছে 'আদমি'-র অর্থ দাঁড়ায় বাঙালী।

বাংলাদেশে অধিকাংশ মোহাজেরই ছিলো অবাঙালী। তারা এদেশে এসেও কখনো এখানকার মানুষের সাথে মিশে যেতে চায়নি। সব সময়ই থেকে গেছে মোহাজের। আর, পাকিস্তানী শাসকরা সুচতুর বিভেদকামী কৌশলে তাদের পরিণত করে এক সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ে। তারপর, আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় ওই মোহাজেরদের লেলিয়ে দেয় বাঙালী নিধনে তাদের দোসর হিসেবে। বাঙালীর সংখ্যা কমে গেলে এদেশে মোহাজেরদের আধিপত্য বাড়বে, তারা আরো সুবিধা পাবে,--কানে এই মন্ত্র ঢুকিয়ে।

মোহাম্মদুল্লাহ্ এক অসতর্ক মুহূর্তে আমার সামনে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ফেলে।

কিন্তু বাস্তবে তারা এর প্রয়োগ শুরু করে আগস্টের অনেক আগে, ২৫ মার্চ থেকেই। আর, হতভাগ্য বাবলু তার শিকার হয় এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে। ঢাকা থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময়।

সে অবশ্যি ঢাকার বাসিন্দা ছিলো না। তার বাবা আমাদের গ্রামের ভিটেমাটি রেখেই পাবনা শহরে রাধানগর এলাকায় নতুন বাড়ী করেন। বাবলুর শৈশব আর ছাত্রজীবন কখনো কেটেছে বাবার বিভিন্ন কর্মস্থলে, কখনো ওই নতুন বাড়ী রশীদ মঞ্জিলে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে হঠাৎ তার বাবা মারা গেলেন সেখানেই। অবসর নেয়ার অল্প কাল আগে। বাবলু তখন এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী। সে-সময়ে বাবার মৃত্যুতে তার পড়াশোনায় মন বসবার কথা নয়। কিন্তু সে ছিলো অসাধারণ মেধাবী ছেলে। টাটকা পিতৃশোক বুকে নিয়েও যথারীতি পরীক্ষা দেয়।

পরীক্ষার কিছু দিন পর সে ঢাকায় আমার বাসায় আসে। এখানে তার এক সঙ্গীও জোটে। চট্টগ্রামে রেলওয়ের একাউন্টস অফিসের কর্মচারী, আমার বন্ধু অনিল চক্রবর্তীর ছোটো ছেলে অদৃত। যাকে আমি আদর করে বলতাম দস্যি। সেও এসেছিলো এস.এস.সি. পরীক্ষার পর আমার এখানে বেড়াতে।

তা-বাবলু সঙ্গী তো পেলো। কিন্তু কেবল নামে। দুটি একবয়েসী কিশোর একই টেবিলে খায়দায়, একই বিছানায় থাকে। তবু তাদের মধ্যে মিল পাওয়া যায় না কোথাও। দুজনের বন্ধু হয়ে ওঠার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা তাদের

চলনবলন। দস্যি মুখর, চঞ্চল স্বভাবের ছেলে। আর, বাবলু প্রায় নির্বাক, অতি শান্ত এবং নিরীহ। দস্যি দু'দিনেই নিঃসঙ্গতায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

ক্রমে ক্রমে তাদের পরীক্ষার ফল বেরুনোর সময় আসে। একদিন আমার অফিসে বেরুনোর সময় তারা আমাকে রোল নম্বর দিয়ে ফল জেনে আসতে বলে। সেদিন বাসায় ফিরে আমি বাবলুকে প্রশ্ন করি, কোন্ বিভাগ পাবি বলে তোর আশা?

সে মৃদু গলায় কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে জবাব দেয়, প্রথম।

ঃ লেটার–টেটার?

বাবলু এবারও আগের মতো সুরে চারটি বিষয়ের নাম করে। সবই বিজ্ঞান আর অঙ্কের। আমি দেখি, আমার জেনে–আসা রেজাল্টের সাথে তার প্রত্যাশা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

দস্যিও প্রথম বিভাগ পেয়েছে। কিন্তু তার লেটার নম্বর কেবল এক বিষয়ে,–ইলেকট্রিসিটিতে।

দুই–একদিন পরই দুজনে আপন আপন বাসায় ফিরে যায়।

বাবলু কিন্তু কিছু দিন পর আবার আমার কাছে আসে। ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে। তার ভাষায়, সবাই বলেছে, ঢাকায় পড়ো। শুনে আমি খুশী হই। ঢাকা কলেজই তার উপযুক্ত জায়গা। কিন্তু মনে মনে একটু আতঙ্কিতও হই। তার খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে বাছবিচার বড়ো বেশী। এ–মাছ খাইনে, ও–মাংস খাইনে ইত্যাদি। এই ছেলে যদি আমার কাছে থাকে, –

আমাকে উদ্ধার করে অবশ্যি সে নিজেই। অল্প দিন পরই হোস্টেলে ঢুকে। আমি শুধু লোকাল গার্জিয়ান হয়ে রইলাম।

মাস কয়েক পর বাবলু হঠাৎ ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের দরখাস্ত হাতে আমার সই নেয়ার জন্যে বাসায় এসে হাজির। মুখে তার এবারও পুরোণো কথা, সবাই বলছে, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে পড়ো।

বুঝে উঠতে পারলাম না, 'সবাই' আগে তাকে ঢাকা কলেজে আসতে বলেছিলো কেন? আসলে ঢাকায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা চালানো তার পক্ষে তখন কঠিন হয়ে পড়েছে। বাবার মৃত্যুর পর তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো যাচ্ছিলো না।

এডওয়ার্ড কলেজ থেকে সে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় পাশ করে পাঁচটি বিষয়ে লেটার পেয়ে স্টার মার্কস্‌সহ। সেবার তার নাম মেধা তালিকায় ছিলো।

বাবলুর পরবর্তী শিক্ষাপীঠ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ। যে–কারণেই হোক,

এবার সে আমার সাথে যোগাযোগ করেনি। সরাসরি উঠেছিলো নিউ মার্কেটের কাছে তার বড়ো বোনের বাসায়।

এর কিছু দিন পর দেশে ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। মুখচোরা নিরীহ বাবলু স্বেচ্ছায় তাতে জড়িয়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, মাত্র কয়েক মাসের ডাক্তারী বিদ্যা নিয়েই অন্য ছাত্রদের সাথে মিলে আহতদের চিকিৎসা করতে থাকে। ২৫ মার্চের সর্বাত্মক পাকিস্তানী হামলার পর ঢাকা থেকে পালানো তার এক সহপাঠীর কাছে তার বড়ো ভাই কাইয়ুম রশীদ (ডন) খবর পায়, বাবলু ভালো আছে এবং ঢাকা ছেড়ে যাবে না। মেডিক্যাল কলেজের যে সমস্ত ছাত্র স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করছে, সে তাদের দলে যোগ দিয়েছে।

এই সময়ই আরো খবর মেলে, স্বাধীনতাবিরোধী কিছু ছাত্র তার কাজে বাধা দিচ্ছে। তাকে তারা এমনকি শাসাতেও শুরু করেছে। তারা ছিলো জামাতে ইসলামীর সমর্থক। বাবলু তাই একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজতে থাকে। এপ্রিলের শেষের দিকে একটা ছোট্টো পুঁটলি হাতে আমার কাছে এসে বলে, চাচা, আমি কিছু দিন আপনার বাসায় থাকবো।—তার গলায় উদ্‌ভ্রান্তের সুর।

আমার আপত্তি করবার কিছু ছিলো না। বাবলু কিন্তু থাকতে এলেও বেশীক্ষণ বসেনি। 'একটু ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে যায়। তার চাচী তাকে খেতে বলেছিলেন। বাবলু তার জন্যেও অপেক্ষা করেনি।

আমরা অবাক, তার সেই 'একটু ঘুরে আসা' সময় নেয় কয়েক দিন। সে ফিরে আসে সম্ভবতঃ ২৬ এপ্রিল। বলে, বিহারীরা ঢাকা আক্রমণ করবে। এখানে আর থাকা সম্ভব নয়। তার পরিচিত কয়েকজন লোক একখানা নৌকো ভাড়া করেছে। সে তাদের সাথে পাবনায় চলে যাবে।

তারপর অনেক দিন তার আর কোনো খবর নেই।

অবশেষে একদিন জানা গেল, বাবলুই নেই। নৌকো সে ধরেনি। ২৫ মার্চের পর অনেক দিন আন্তঃজেলা বাস বন্ধ ছিলো। ২৮ এপ্রিল (তখন) ই.পি.আর.টি.সি.-র কোচ প্রথম চালু হয়। বাবলু তাতে উঠে পাবনার দিকে রওনা দেয়।

কিন্তু পাবনা দূর অস্ত। গাড়ী কল্যাণপুর বাস ডিপোর কাছে পৌঁছতেই এক পাল বিহারী তাকে ঘিরে ফেলে। তাদের প্রথম কাজ হয় গুলি করে ড্রাইভারকে মেরে ফেলা। তারপর তারা মিছিল সহকারে বাসখানা নিয়ে দারুস সালাম, মীরপুর এক নম্বর গোল চক্কর হয়ে বারো নম্বর সেকশনের কালশী গোরস্তানের কাছে নিয়ে যায়। মিছিলে সারা পথ তাদের শ্লোগান ছিলো, 'মারো মারো,

বংগালী মারো।'

কালশীতে যাত্রীদের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ, মাঝবয়েসী এবং তরুণদের পৃথক করে ফেলা হয়। তারপর বিহারীরা তরুণ আর মাঝবয়েসী যাত্রীদের নিয়ে যায় গোরস্তানের শেষ মাথায়। এবং সেখানে একে একে সবাইকে নির্মমভাবে জবাই করে।

বাবলু পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিলো। তার এই পরিণতি। একেই বুঝি বলে, প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত।

আমরা এসব খবর পেয়েছিলাম অনেক পরে, বিভিন্ন সূত্রে।

বিহারীদের কবলে-পড়া যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন একজন হাজী। তিনি হজ্ব সেরে ঢাকায় ফিরে আটকা পড়েন। সরকারী বাস চালু হওয়ায় তাতে চেপে দেশের বাড়ী যাচ্ছিলেন। পথে এই কান্ড। কিন্তু তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। তাঁকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে কসাইদের কেউ কেউ নাকি বলে, লোকটা সদ্য-সদ্য আল্লাহ্‌র ঘর থেকে ফিরেছে। ওকে ছেড়ে দাও।

তিনি অবশ্যি অক্ষত দেহে ছাড়া পাননি। কিছু অস্ত্রের আঘাত তাঁকেও সইতে হয়েছিলো। ছাড়া পাওয়ার পর তিনি কোনো ক্রমে ফিরে এসে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ঢোকেন। বাবলুকে তিনি চিনতেন না। কিন্তু হাসপাতালে সাক্ষাৎকারীদের বলেছিলেন, শহীদদের ভেতর পাবনার একটি অল্পবয়েসী ছেলে ছিলো। তার পাঞ্জাবির পকেটে মিনি সাইজের একখানা কোরাণ শরীফ পাওয়া যায়।

বাবলুর বড়ো ভাই ডন তার খোঁজ নিতে গিয়ে জেনেছিলো, শুধু বাবলুদের কোচই নয়, বিহারী কসাইয়ের দল ঘটনার দিন আরো কিছু গাড়ী আটক করে। বি.আর.টি.সি.-র দুটি ডবল ডেকার বাস, কয়েকটি আন্তঃজেলা কোচ এবং কয়েকখানা প্রাইভেট গাড়ী। সেগুলিতে আরোহী তথা যাত্রী ছিলো একশোর ওপর। তাদেরও সবাইকে বাবলুদের সাথে জবাই করা হয়।

বিহারীরাও মুসলমান

কালশীর এই হত্যালীলা যে মূল ব্যাপারের সূচনার বা প্রথম দিনের ঘটনা নয়, তা আগেই বলেছি। আমরা আরো জানি, তার কুশীলবও নয় কেবল বিহার থেকে আসা মোহাজের।

কুশীলবদের বেশীর ভাগই এসেছিলো অবশ্যি বিহার থেকেই। তাদের পরের বড়ো দলের আদিনিবাস কলকাতার বস্তি। ছোটো দলগুলির কোনোটির সাবেক ঠিকানা উত্তর প্রদেশ, কোনোটির বা অন্য কোথাও। বাংলাদেশের পশ্চিম পাশে বড়ো বাংলাভাষী এলাকা। ছোটো একটি এলাকা পূব সীমান্তের ওপারেও। সেসব জায়গা থেকে বাঙালী মোহাজেরও এখানে কিছু কম আসেনি। তারা ছাড়া বাকী সবারই পাইকারী নাম বিহারী। সেই 'সাতচল্লিশের আগস্ট থেকে। যখন তারা বাংলাদেশে আসতে শুরু করে।

জাতে বিহারীরা ছিলো মুসলমান। যেমন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ। কিন্তু সে শুধু আমাদের হিসেবে। তাদের হিসেবে তারা ছিলো বিশেষ শ্রেণীর মুসলমান। রাজনীতির ভাবনায় রাজার জাত। তারা তাই এদেশে এসেও এদেশবাসীর সাথে মেশেনি। এবং এখানকার মাটিতে এসেই শুরু করেছে ল্যাজ আছড়ানো আর ছোবল মারা। এসবের লক্ষ্যটিও গোপন রাখেনি। বাংলাদেশে তাদের মোড়লি চাই। সেই জন্যেই বাঙালীর ছেলে বাবলুর পকেটের কোরাণ শরীফ তাদের কাছে মর্যাদা পায়নি।

গোড়ায় তাদের সাধটির প্রকাশ দেখা গেছে সারা দেশেই। কিন্তু তখন ল্যাজ আছড়ানি আর ছোবল মারার ঘটনা ছিলো ছোটো ছোটো। বড়ো হওয়ার সুযোগ পেয়েছে কদাচিৎ। বাঙালীরা তাদের কুমতলব দেখে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো শুরুতেই। মনে মনে যেমন, তেমনি বাইরেও। বিহারীরা ছোবল মারবার প্রথম বড়ো সুযোগ পায়–কবে এবং কখন, কার মদদে, কেমন করে, তা আমাদের সবারই জানা। হ্যাঁ, পাকিস্তানী হানাদারদের দেওয়া মন্ত্রের বলে বলীয়ান, তারা ফণা তোলে ২৫ মার্চ, বাংলাদেশের সবখানে একযোগে। বিশেষ করে, তাদের বড়ো বড়ো ঘাঁটিতে। উত্তরে সৈয়দপুরে, সান্তাহারে, ঈশ্বরদীতে, মধ্যিখানে ঢাকার মীরপুর আর মোহাম্মদপুরে, দক্ষিণে চট্টগ্রামে।

মীরপুর, মোহাম্মদপুর আগে ছিলো গ্রাম। তারা শহরের রূপ ধরে

মোহাজেরদের ঠাঁই দিতো। কিন্তু সেই মোহাজের কারা? ওসব দিকে গেলে,–যেমন তাদের আর সব বড়ো ঘাঁটিতে গেলেও,–প্রশ্নটির জবাব মিলেছে অতি সহজে, বাসিন্দাদের ভাষা থেকে। আমাদের কখনো মনে হয়নি, ওগুলো বাংলাদেশের এলাকা। কিন্তু পাকিস্তানী শোষকরা ধোঁকা দিতেও ছিলো রীতিমতো ওস্তাদ। তাই, চালাকি করে জায়গা দুটোয় ঢুকিয়ে রাখে দু'চার ঘর বাঙালী মোহাজেরও। আর, সরকারী প্লট দেয় কিছু এদেশী বাঙালীকে। ২৫ মার্চের বিহারী ফণার তারাই প্রথম শিকার। কসাইগুলির কাজ শুরু হয় পাড়াপড়শীর গলায় ছুরি চালিয়ে।

এই শিকারদের সবার কথা আমরা আজও জানিনে,–প্রথম শিকার কে, তা জানা তো অসম্ভব। গোড়ার দিকের যে দুই–একজনের খবর মেলে, তাদের মধ্যে থেকে সবার আগে মনে পড়ছে মীরপুরের একটি অসহায় মেয়ের কথা। 'ষাটের দশকের সাহিত্যিক মহলে তাঁর নাম ছিলো সুপরিচিত। তিনি কবি মেহেরুন্নিসা। তাঁরা ছিলেন বাঙালী মোহাজের।

মেহেরুন্নিসার জীবনকাহিনী বড়ো করুণ। জীবনসংগ্রাম নিদারুণ। সহায়সম্বলহীন মোহাজের, তাঁর বাবা ছিলেন এক দুরারোগ্য ব্যধিতে–না, অচল ঠিক নন, সচলই,–কিন্তু কাজকর্মে অক্ষম। দুটি ছেলের দুজনই নাবালক। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোনো তাই নিত্যিকার ব্যাপার। পড়াশোনার কথা আর কে ভাবে?

ভাবলেন,–শেষে, বাবার প্রথম সন্তান, সদ্য কৈশোর–পেরুনো মেয়েটি। ওই মেহেরুন্নিসা। তাও শুধু পড়াশোনার কথা নয়, তার থেকে অনেক বেশী। আসলে সব কিছুরই। তিনি মাথায় তুলে নিলেন সংসারের সকল ভার, যেমন নেয় তরুণ বড়ো ছেলো। টাকাপয়সার অভাবে এস.এস.সি.–র বেড়াটাও ডিঙোতে পারেননি। তার ওপর, ওই তো বয়েস। জীবনসংগ্রামে নামবার মতো কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। মেহেরুন্নিসা তবু দমবার পাত্রী নন। অভ্যেস ছিলো কবিতা লেখার। তাকেই করেন পুঁজি।

কিন্তু এদেশে তখন একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকেরই লেখা থেকে পেটের ভাত জোটে না। মেহেরুন্নিসার কবিতার আয়ে একজন মানুষের শুধু নাশতার টাকাও আসবার কথা নয়। তখনকার দিনে সাহিত্যপত্রিকা বা দৈনিক কাগজের সাহিত্য বিভাগই বা ছিলো কয়টি? তবু মেহেরুন্নিসা কবিতা হাতে নিয়ে সারা দিন ঘুরে বেড়ান সেসবের অফিসে, শহরের এ–মাথা থেকে ও–মাথা অবধি।

ক্রমে এই ছোটাছুটির সাথে যোগ হয় এক ধরনের শ্রমিকগিরি,– নকলনবিসি। কোনো কোনো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তাদের হাতের কাটাকুটি-ভরা পাণ্ডুলিপির নতুন কপি করিয়ে নেয়। কিন্তু তার জন্যে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তার পরিমাণ রীতিমতো লজ্জাজনক। একদিন বাংলা একাডেমীতেও দেখি, মেহেরুন্নিসা সেই কাজ করছেন। একজন কবির কি দুর্গতি!

পরে তাঁকে পুরো শ্রমিকও হতে হয়। তিনি ফিলিপসে একটা চাকরি নেন। কাজ টিভির বিভিন্ন অংশের এ্যাসেম্বলিং। সেকাজের সামাজিক মর্যাদা যেমনি হোক, মেহেরুন্নিসার অন্নচিন্তা কিছুটা কাটে, আয় নিয়মিত হয় বলে। কবিতা থেকে আয় ছিলো একেবারেই অনিয়মিত। আর, নকলনবিসির কাজই অনিশ্চিত, মিলতো কেবল হঠাৎ, মাঝে মাঝে। তবু, একটি তরুণীর যখন ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখার কথা, তখন মেহেরুন্নিসা ওই সব নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন। মুখের হাসি বজায় রেখে।

এরই মধ্যে দেখেছি তাঁর আর এক ধরনের ব্যস্ততা। তিনি ছিলেন সাহিত্যগতপ্রাণ। তার দরুন ঢাকার সাহিত্যসভাগুলিতে প্রায়ই দেখা যেতো তাঁকে। এগুলির একটি ছিলো সাপ্তাহিক 'বেগম' অফিসে লেখিকাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান। এই সব সভা আর অনুষ্ঠান মেহেরুন্নিসাকে শুধু সাহিত্যচর্চায় আর লেখক-লেখিকাদের সাথে মেলামেশার সুযোগই দেয়নি, দিয়েছে তাঁর শ্রান্তি-ক্লান্তিভরা জীবনে একটুখানি চিত্তবিনোদনের সুযোগও।

সেই মেহেরুন্নিসার সব সংগ্রাম, সব চিত্তবিনোদন একদিন থেমে যায়। ২৫ মার্চের রাত্তিরে জারি-করা কারফিউতে তিনি আটকা পড়েন মীরপুরের বাড়ীতে। মীরপুরের আবহাওয়া ছিলো তার আগে থেকেই একেবারে থমথমে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ই। তবু, বাঙালী-বিহারীর মিলিত চেষ্টায় গড়া তখনকার শান্তি কমিটি পরিস্থিতি একটু সামলে রেখেছিলো। কিন্তু কারফিউ কসাই বিহারীদের আসল চেহারা তুলে ধরবার একতরফা সুযোগ এনে দেয়। তারা উল্লাসভরে ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়ে বাঙালী প্রতিবেশীদের খোঁজে। তখন নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কোনো বাঙালীই রেহাই পায় না। পরে-পাওয়া ছিটেফোঁটা খবরে জেনেছি, কসাইয়েরা মেহেরুন্নিসার পরিবারের সবাইকেই 'মারো মারো, বংগালী মারো' নীতিতে অতি উৎসাহে জবাই করে। তাদের লাশের কোনো সৎকার হয়নি।

মানুষ মেহেরুন্নিসা এমনি করে দৈহিকভাবে আমাদের ভেতর থেকে হারিয়ে যান।

হ্যাঁ, দৈহিকভাবেই। কিন্তু তাঁর তো আরো একটি সত্তা ছিলো,-তিনি ছিলেন কবি। সে-সত্তার নিধন তখনও বাকী। কর্মটি বিহারীরা করেনি, করেছি আমরা বাঙালীরাই।

বাংলাদেশ দখলদারদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পর বাংলা একাডেমী শহীদ কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলী প্রকাশের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। তখন মেহেরুন্নিসার কবিতাসংগ্রহ প্রকাশেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংগ্রহটির সম্পাদনার ভার পড়ে একজন অধ্যাপকের ওপর। তিনি সেটি নিয়েও যান। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তিনি সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি নিয়ে আর ফিরে আসেননি।

তার ফল, একালের কোনো পাঠক কবি মেহেরুন্নিসার নামটিও জানে না। 'ষাটের দশকের জনপ্রিয় কিন্তু গ্রন্থহীন কবি মেহেরুন্নিসা এখন টিকে আছেন কেবল আমাদের মতো দু'চারজন বুড়ো-হাবড়ার মনে। আমরা চলে গেলেই –

এখন ভাবুন, মেহেরুন্নিসারই যখন এই হাল, তখন তাঁর থেকে সাধারণ, একেবারে সাধারণ নির্যাতিত মানুষদের দশা কেমন দাঁড়াবে–কিংবা ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়েছে! তাঁদের অনেকেই এমনকি এখনো জীবিত। আছেন আমাদের আশপাশেই। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক-একটি জীবন্ত কাহিনী হয়ে। কিন্তু আমরা ভুলেও তাঁদের কথা ভাবিনে,–একটু খোঁজও রাখিনে।

কুলখানির পরও জীবিত

ঠিক এই মুহূর্তে এমনি যে মানুষটির কথা প্রথমেই মনে পড়ছে, তিনি বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার সন্তান সৈয়দ আবদুল কাইয়ূম। মীরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এখানে তিনি যোগ দেন ১৯৬৯ সালের ১ মার্চ। তিনি 'একাত্তরে প্রাণে বেঁচে যান প্রায় অলৌকিকভাবে। এবং তাঁর কুলখানির খবর শোনেন নিজের কানেই!

মেহেরুন্নিসাদের ঘটনা 'একাত্তরের মার্চে বাঙালীনিধন যজ্ঞের শুরুর ব্যাপার। কিন্তু শুরুরও শুরু থাকে। কাইয়ূম সাহেবের ঘটনাটি তখনকার। ২৫ মার্চের ঠিক দু'দিন আগের। সে-আমলের এক জাতীয় দিবস পাকিস্তান দিবসের রাত্রিবেলার। যখন তিনি যমদূত বিহারীদের কবলে পড়েন।

মার্চের গণ-আন্দোলন তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। চারদিকে শুধু মিছিল, মীটিং আর স্বাধীনতার কথা। মুজিব-ইয়াহিয়ার আলোচনার মধ্যেই ছাত্ররা তৈরি করে ফেলেছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। যার বুকে আঁকা. বাংলাদেশের মানচিত্র। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস। সে-দিবস শোক দিবস রূপে ঘোষিত। সেদিন ছাত্রদের এক বিরাট সভায় এক দিকে প্রবল উৎসাহে ওড়ানো হয়েছে বাংলাদেশের পতাকা, অন্য দিকে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকায়। বাঙালীর জাতীয় জাগরণ দমন আর পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা দেশের নানা জায়গায় বাঙালী নিধনের প্রতিবাদে।

বাংলাদেশের পতাকা তখন স্বাভাবিক কারণেই দুর্লভ। তা সত্ত্বেও তাঁর কয়েকটি প্রিয় ছাত্র একখানি পতাকা সংগ্রহ করে। বেলা দশটা-সাড়ে দশটার দিকে সেখানি হাতে নিয়ে তারা কাইয়ূম সাহেবদের কাছে চলে আসে। বলে, স্যার, চলুন, আমাদের ইস্কুলে এই পতাকা ওঠাবো। কাইয়ূম সাহেব এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানান, তিনিও তখন তরুণ, বয়েস মাত্র ছাব্বিশ-সাতাশ। রক্তে গণ-আন্দোলনের ঢেউ লাগা ছিলো স্বাভাবিক। ছাত্রদের অনুরোধ শুনে তিনি তাই কোনো কিছু না ভেবে সোজা তাঁর ইস্কুলে চলে যান। বেলা এগারোটার দিকে সেখানে পতাকা ওঠানো হয়।

খাস বিহারী উপশহর মীরপুরে এই কাণ্ড! তাও আবার সেই সময়ে, যখন পাকিস্তানী শাসন প্রবলপ্রতাপ। এবং যখন তার নাটের গুরু ইয়াহিয়া খান সশরীরে ঢাকায় বিরাজমান। বিহারী মহলে তাই গুঞ্জন ওঠে, ইয়ে কৌন্ রাজ হ্যায়? অর্থাৎ এ কোন্ রাজত্ব?

কাইয়ূম সাহেব অবশ্যি তখন এ-গুঞ্জন শোনেননি, শুনেছিলেন অনেক পরে, খবর হিসেবে। পতাকা ওঠানোর পরই তিনি ছুটে যান দশ নম্বর সেকশনের 'বি' ব্লকে, দু'নম্বর রোডের তেরো নম্বর বাসায়। সেখানে থাকেন খন্দকার আবু তালেব। তিনি ছিলেন বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সদস্য —এবং কাইয়ূম সাহেব যখন চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দেন, তখন সদস্য ইন্টারভিউ বোর্ডেরও। তখন থেকেই তাঁর সাথে কাইয়ূম সাহেবের পরিচয়।

তারপর, বছর না পেরুতেই, সেই পরিচয় দাঁড়ায় এক অভাবনীয় ঘনিষ্ঠতায়। তালেব সাহেব হয়ে ওঠেন তাঁর অভিন্নপ্রাণ বন্ধু, সেই সঙ্গেই স্নেহপরায়ণ অগ্রজও। তেমন বন্ধু এবং ভাই তিনি পরে আর পাননি। তখন অকৃতদার, কাইয়ূম সাহেব অবসর পেলেই চলে যান তালেব সাহেবের বাড়ীতে। সেখানে সময় কাটান গল্প-গুজবে, আড্ডাবাজিতে আর তাস খেলায়। ইস্কুলে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওঠানোর খবরটা সবার আগে এহেন তালেব সাহেবকে না দিলে কি চলে?

খবর দেওয়ার পর কাইয়ূম সাহেব আর নিজের বাসায় ফেরেননি। দিনের বাকীটা এবং রাত সাড়ে বারোটা অবধি তালেব সাহেবের বাসাতেই থাকেন। সময় কাটে তাঁর এবং অন্য কয়েকজন প্রতিবেশীর সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে।

তারপর তাঁর এবং প্রতিবেশীদের বাড়ী ফেরার পালা। তাঁরা পথে নামতেই কয়েকজন লোক তাঁদের অনুসরণ করে। কাইয়ূম সাহেব তাদের দেখেও দেখেন না। কিন্তু বাসায় ফিরে কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়তেই,-রাত তখন একটা পঁয়ত্রিশ মিনিট,-হঠাৎ তাঁর কানে আসে কিছু হুঙ্কার : দরওয়াজা উতার দো, উসকো পাকড়ো ইত্যাদি। সেই সঙ্গে চলতে থাকে দরজা-জানলা ভেঙে ফেলার উপক্রম। তাঁর সঙ্গে একই কামরায় থাকতেন তাঁদের অঙ্কের শিক্ষক আলমগীর সাহেব (পরে রাজাকার) আর দফতরী। তাঁরা যথাসময়েই সরে পড়েন। সুতরাং কালক্ষেপ না করে তিনি বাসার পেছন দিক দিয়ে বাইরে চলে আসেন। তারপর নর্দমা বরাবর ছুট। লক্ষ্য তালেব সাহেবের বাসা।

কিন্তু পথে কয়েকজন বিহারী তাঁকে আটকে ফেলে। এবং তাদের একজন তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে আসে। প্রাণ রক্ষার তাগিদে কাইয়ূম সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত বাড়িয়ে ছোরাখানা ধরে ফেলেন। তাতে বুক বাঁচে বটে, কিন্তু হাতের দুটি আঙুল কেটে যায়। ছোরাখানা ছিলো দুধারী। তার কাটা দাগ তাঁর আঙুলে এখনো আছে।

ছোরা ঠেকানোর পর কাইয়ূম সাহেবের আবার ছুট। কিন্তু তাতে বিহারীদের ধাওয়া ঠেকে থাকে না। এদিকে, আঙুল কেটে যাওয়ার দরুন ডান হাতখানা ক্রমে অবশ হয়ে আসে, হাঁটু এবং কনুই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এবং মন জুড়ে বসে আতঙ্ক। এই অবস্থায়, তালেব সাহেবের বাসা থেকে শ'খানেক গজ দূরে, তিনি পড়ে যান।

যমদূতগুলি তখন আবার সুযোগ নেয়। সোজা তাঁর ঘাড় লক্ষ্য করে কোপ

মারে। কাইয়ূম সাহেব কোপ ঠেকানোর জন্যে এবার বাম হাত তোলেন। তাতে এবারও প্রাণ বাঁচে। কিন্তু পর পর দুটি কোপ খেয়ে কবজিটা হাত থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এরপর যা ঘটতো, তা অনুমান করা চলে সহজেই। কিন্তু আর এক আকস্মিক ঘটনায় সেটি আর ঘটে না। কাইয়ূম সাহেব যেখানে পড়ে যান, তার কাছেই এক বাঙালীর বাড়ী। হৈ-হল্লা শুনে তিনি ভাবেন, তাঁর ছোটো ভাইয়ের ওপর হামলা হয়েছে। তিনি তাই একটি শাবল হাতে নিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে আসেন। আর,কি আশ্চর্য, সেই একটি মানুষকে দেখেই বিহারীগুলি সরে পড়ে! মানুষটি তখন তাঁকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যান।

স্থানীয়ভাবে 'মোল্লা' নামে পরিচিত, বাঙালী ভদ্রলোক এরপর 'ভাইয়ের' দিকে তাকান। আর, তাকিয়েই অবাক। এ-মানুষটি তো তাঁর ভাই নন। ইনি মহল্লার এক শ্রদ্ধেয় পুরুষ, হেড মাস্টার কাইয়ূম সাহেব।

তা-এমন শ্রদ্ধেয় পুরুষের কেন এই হাল?

আশ্রয়দাতা ভদ্রলোকের কিন্তু বেশী কিছু ভাববার সময় নেই। পরিস্থিতি তখন রীতিমতো গোলমেলে। কাইয়ূম সাহেবের অবস্থাটা বুঝেও তিনি বলতে গেলে চুপ মেরেই থাকেন। মনের ভেতর শুধু জট পাকায় রাশি রাশি চিন্তা। সেই সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ভয় আর উদ্বেগ। তাঁর পরিবারের লোকজনের দশাও তাঁরই মতো।

এমনিভাবে ঘন্টা দুয়েক কেটে যায়।

তারপর তালেব সাহেব খবর পান। তাঁর সাথে আরো অনেকেই। তখন বিশ-পঁচিশজন লোক আশ্রয়দাতার বাড়ীর দিকে ছুটে আসে। সবার হাতেই অস্ত্র। কারো হাতে বন্দুক, কারো হাতে বা অন্য কিছু। কিন্তু সেসব নিয়ে লড়বার জন্যে কোনো প্রতিপক্ষ সামনে মেলে না। তবে, অন্য করণীয় কাজ ছিলো। সেটা জরুরী। কয়েকজন ধরাধরি করে কাইয়ূম সাহেবকে তাঁর শ্রদ্ধেয় তালেব ভাইয়ের বাড়ীতে এনে তোলেন। তাঁকে বৈঠকখানার একটি বিছানায় শুইয়ে দেন।

কাইয়ূম সাহেব তখন যেন রক্তে নেয়ে উঠেছেন। তাঁর ছোরায়-কেটে-যাওয়া হাত দুখানি থেকে সেই যে দু'ঘন্টা আগে রক্তপাত শুরু হয়েছিলো, তা আর থামেনি, কিছুতেই থামানোও যাচ্ছে না। এমনি রক্তপাত দেখে তালেব সাহেবের স্ত্রী আর স্থির থাকতে পারেননি। কিছুক্ষণ পরই তিনি আধা-অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যান। আর, তালেব সাহেবেরা পড়েন ভাবনায়। এই

রক্তপাত অবিলম্বে বন্ধ করতে না পারলে কাইয়ূম সাহেবকে প্রাণে বাঁচানো হয়তো সম্ভব হবে না। এখন তাহলে উপায়?

একটা উপায় অবশ্যি ছিলো। কাছেই একটা সরকারী ডিসপেন্সারি। তার ডাক্তার বাঙালী। সেখানে গেলে তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা বিহারীদের পাড়া। তালেব সাহেবেরা তাই রোগীকে সেখানে নিয়ে যেতে সাহস পান না। বিকল্প ব্যবস্থার জন্যে তাঁদের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

সকাল সাতটা–সাড়ে সাতটায় সেই বিকল্প ব্যবস্থা করেন তালেব সাহেব, ডিসপেন্সারির বাঙালী ডাক্তার এবং দুই–একজন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইতিমধ্যে কাইয়ূম সাহেব ভয়ে আর রক্তপাতের দরুন কার্যতঃ অচেতন হয়ে পড়েছেন। কাটা হাতখানা গামছা এবং সূতো জড়িয়ে কবজির নীচের অংশটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা থেকে কোনো রকমে আটকে রাখা। তালেব সাহেবেরা তাঁকে সেই অবস্থায় একখানা গাড়ীতে উঠিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দিকে রওনা হন।

পথে আর এক বিপত্তি। গাড়ী কল্যাণপুর পৌঁছতেই তার ওপর পড়তে থাকে বাঁশ–লাঠিসোঁটার বাড়ি। আর, হামলাকারীরা সবাই বাঙালী! তালেব সাহেব গাড়ী থামিয়ে তাদের কাছে জানতে চান, ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার যে–এই। গাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা নেই কেন?

তালেব সাহেব এবার সংক্ষেপে কাইয়ূম সাহেবের ব্যাপারটা জানান। তখন আবার গাড়ী ছাড়বার অনুমতি মেলে।

তাঁরা যখন হাসপাতালে পৌঁছন, তখন খবর পেয়ে ছুটে আসেন এক ডাক্তার। হেড মাস্টার সাহেবের আপন ফুফাতো ভাই। তাঁর ডিউটি তখন শেষ হয়ে গেছে। তিনি বাসায় চলে যাবেন। কিন্তু গেলেন না, ভাইয়ের অপারেশনের প্রয়োজনে হাসপাতালে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে উদ্যোগ–আয়োজনও।

বেলা বারোটায় তাঁকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন। তাঁর জ্ঞান ফেরে রাত সাড়ে তিনটেয়। রাত পোহালে, ২৫ মার্চ সকালবেলা, তাঁকে অপারেশন থিয়েটার থেকে ওয়ার্ডের বেডে নিয়ে আসা হয়।

ইতিমধ্যে মীরপুরের বাঙালী মহলে খবর রটে যায়, হেড মাস্টার সাহেব মারা গেছেন। তাঁর ওপর হামলার কথা এর আগেই সারা মীরপুরে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই হামলার কথা আর খবরটির ফলে বাঙালী মহলে দেখা দেয় দারুণ উত্তেজনা। কিন্তু তখন পরিস্থিতি জটিল। তাদের তাই নিজেদের সামলে

রাখতে হয়। অসহযোগ আন্দোলন তখনও চলছিলো। মীরপুরে, যেমন দেশের আরো অনেক জায়গায়, শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রধানতঃ অবাঙালীদের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছিলো, বাঙালীর হাতে তাদের নিরাপত্তা যেন কোনো ক্রমেই ক্ষুণ্ন না হয়।

এমন পরিস্থিতিতে কিছু বাঙালী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছুটে আসেন। সম্ভবতঃ কাইয়ূম সাহেবের মৃত্যুর সংবাদটির সত্যাসত্য যাচাই করতে। এই দিন দৈনিক 'ইত্তেফাক'–এর প্রথম পৃষ্ঠায় একটি খবর বেরিয়েছিলো, এক দিকে মুজিব–ইয়াহিয়া আলোচনা, অন্য দিকে বাঙালীর বুকে ছুরি। কাইয়ূম সাহেবের ওপর হামলা সম্পর্কিত এই খবরটি তালেব সাহেবই দেন। হাসপাতালে আসা বাঙালী ভদ্রলোকগুলির জন্যে খুশির কথা, তাঁরা তাঁকে জীবিতই দেখতে পান। তাঁর সঙ্গে তাঁরা কথাও বলেন। কিন্তু চাপা গলায়। হয়তো মীরপুরের আতঙ্ক হাতপাতালেও তাঁদের তাড়া করে ফিরছিলো। হেড মাস্টার কাইয়ূম সাহেব তাঁদের কাছেই তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত গুজবটির কথা শুনতে পান।

এরপর শুরু হয় তাঁর আর এক নির্যাতন। যা 'একাত্তরের নির্যাতনের ভিন্ন এক রূপ।

তাঁর অপারেশনটি ভালোভাবেই হয়েছিলো,—হাতের বিচ্ছিন্নপ্রায় অংশটি জোড়া লাগানো হয় প্লাস্টিকের হাড় দিয়ে। তাঁর এখন শুধু সেরে ওঠবার অপেক্ষা। তিনি তাই মোটামুটি হিসেবে নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাঁর নিশ্চিন্ততা ছিলো স্বল্পায়ু। ২৫ মার্চ দিনটি পার হওয়ার কিছু পরই তার অবসান ঘটে। রাত দশটার দিকে যখন তাঁর কানে আসে কিছু ভয়ংকর শব্দ।

এই শব্দগুলি ছিলো কামানের। জানা যায়, হাসপাতাল সংলগ্ন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শেল মেরে সেটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তার আওয়াজে হাসপাতালের লোহার খাটগুলি পর্যন্ত খটখট শব্দ তুলে কেঁপে উঠছে। এই সময় বিজলী চলে যায়। নিরেট অন্ধকারের মধ্যে খবর মেলে, সর্বত্রই কারফিউ। আর, চারদিক থেকে কানে আসে গোলাগুলীর আওয়াজ। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে হামলা করেছে।

রাতটা দারুণ ভয় আর উদ্বেগের মধ্যে কাটে। সেই ভয় আর উদ্বেগ চরমে পৌঁছয় সকালবেলা। যখন কারফিউয়ের মধ্যেই একের পর এক লাশ আসতে থাকে হাসপাতালে। ক্রমে হাসপাতাল ভর্তি হয়ে যায়। কাইয়ূম সাহেব লাশের স্তূপের ভেতর তাঁর চেনা একজন বিখ্যাত অমুসলিম পণ্ডিতের মুখও আবিষ্কার

করেন। এই পণ্ডিত ব্যক্তিটি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের প্রধান। অবস্থা দেখে কাইয়ূম সাহেব তাঁর বেড থেকে ঝুলানো রোগী পরিচিতির কার্ডখানা লুকিয়ে ফেলেন। তাতে লেখা ছিলো, অবাঙালী কর্তৃক আহত। এমন কার্ড কোনো অবাঙালী বা হানাদারদের চোখে পড়লে তাঁর নতুন বিপদ ঘটতে পারে, এই আশঙ্কাতেই ওটা সরিয়ে ফেলা।

পরদিন, ২৭ মার্চ, সকাল আটটা থেকে দুই-এক ঘন্টার জন্যে কারফিউ শিথিল করা হল। এই সুযোগে তাঁর এক বন্ধু এবং সহকর্মী ফারুক আহমদ খান হঠাৎ হাসপাতালে এসে হাজির। এবং কাইয়ূম সাহেবকে বলেন, স্যার, মরতে হয়, সবাই এক জায়গায় মরবো। বাসাবোতে আমার বোন থাকে। চলুন, তার বাসায় যাই।

হেড মাস্টার কাইয়ূম সাহেব কোনো আপত্তি করেন না। হাসপাতালের পোশাকেই ফারুক সাহেবের সাথে বেরিয়ে পড়েন। ফারুক সাহেব তাঁকে রিকশায় নিজের কোলে বসিয়ে বাসাবোর দিকে রওনা হন। তাঁর তখন হাত-পায়ের নানা জায়গায় প্লাস্টার আর ব্যান্ডেজ। বিহারীদের তাড়া খেয়ে পালানোর সময় পড়ে গেলে হাত-পায়ের নানা জায়গায় কেটে গিয়েছিলো। তাঁর এতো প্লাস্টার-ব্যান্ডেজ দেখলে মিলিটারির মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তারা হয়তো জিজ্ঞেস করবে, কি হয়েছিলো? ফারুক সাহেব তাঁকে এমন প্রশ্নের একটা জবাব শিখিয়ে রাখেন। তাঁকে বলতে হবে, সিঁড়িসে গির গিয়াথা-অর্থাৎ সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।

কাইয়ূম সাহেব পরম যত্ন সহকারে জবাবটা মনে মনে আওড়াতে থাকেন। কিন্তু অতি যত্নের আর সতর্কতার ফলে এক সময় সেটা ভুলে যান। তবে, ভাগ্য ভালো, পথে তাঁকে মিলিটারির সামনে পড়তে হয়নি।

বাসাবোতে তাঁরা রইলেন চার দিন। কিন্তু পরিস্থিতি সেখানেও ভালো নয়। তাঁরা বুঝলেন, সেখানে থাকা চলবে না। এবার তাঁরা স্থানীয় এক ভদ্রলোকের সাহায্য নেন। তিনি তাঁদের নিজের গাড়ীতে করে ডেমরা ঘাটে পৌছিয়ে দেন। যাওয়ার পথে দু'পাশে অসংখ্য লাশ চোখে পড়ে তাঁদের।

ডেমরা থেকে নতুন যাত্রা। তারাবোতে পৌছে ফারুক সাহেব একখানা ট্রাক ভাড়া করলেন। তাতে চেপে নরসিংদী তক যাবেন বলে। তার পরের গন্তব্য নৌকোপথে তাঁর গ্রামের বাড়ী। কাইয়ূম সাহেব আপাততঃ সেইখানেই থাকবেন।

সে-বাড়ীতে তিনি রইলেন ১১ এপ্রিল তক। ততো দিনে বেশ সেরে

উঠেছেন। পরদিন বন্ধু–সহকর্মী, ২৭ মার্চ থেকে ছায়ার মতো সাথী ফারুক সাহেব তাঁকে নিয়ে নদীপথে রওনা হন কুমিল্লার নাসিরনগর থানার দিকে, তাঁর গ্রামের বাড়ীর উদ্দেশে।

বন্ধুসহ বাড়ী পৌছে কাইয়ূম সাহেব অবাক। এবং অবাক বাড়ীর লোকজনও। কেউ যেন নিজের চোখ–কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না। তিনি তো মৃত। তাঁর কুলখানি পর্যন্ত হয়ে গেছে। এমন মানুষ সশরীরে কোথা থেকে গ্রামে এসে হাজির !

রহস্যটা ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়। বাড়ীর লোকজন 'ইত্তেফাক'–এ কাইয়ূম সাহেব সম্পর্কিত খবরটি পড়েছিলেন। তারপর বাবা, ভাই, বোন –সবাই নানাভাবে চেষ্টা করেন তাঁর খোঁজ নিতে। কিন্তু সবার সব চেষ্টা বৃথা। অবশেষে তাঁরা ধরে নিলেন, তিনি মারা গেছেন।

তারপরের কাজ–কুলখানি। সে তো ধর্মের বিধান।

কিন্তু এখন–মধুরেণ সমাপয়েৎ।

এরপর থেকে মুক্তিযুদ্ধের শেষ অবধি কাইয়ূম সাহেব গ্রামের বাড়ীতেই ছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং একদিন আবার তাঁর ইস্কুলে যোগ দেন।

এই ঘটনার পর বহু দিন পর্যন্ত পথে ঘাটে লোকে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছে, আপনি কি বাংলা ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক?

তিনি উত্তরে বলতেন, হ্যাঁ।

তারা অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো, বিশ্বাস করতে পারতো না। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা প্রশ্ন। যা কাইয়ূম সাহেব দেখেছিলেন ১২ এপ্রিল গ্রামের বাড়ীতে পৌছে, তাঁর আপনজনদের চোখে মুখে ঃ যে–মানুষ মারা গেছে, তার আবার কি করে এইভাবে পথে ঘাটে দেখা মেলে?

তালেব সাহেবের খবর নেই

'মৃত্যুর পরও কাইয়ুম সাহেবের দেখা মেলে। কিন্তু যাঁর বাড়ীতে তিনি প্রায় মরণদশায় সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিলেন, সেই তালেব সাহেবের কোনো খবর নেই।

২৪ মার্চ সকালে যাঁরা কাইয়ূম সাহেবকে নিয়ে হাসপাতালে যান,–তালেব সাহেব, প্রতিবেশী হান্নান সাহেব, ডিসপেন্সারির বাঙালী ডাক্তার প্রমুখ,–তাঁরা রোগী ভর্তির পরই ফিরে আসেন। তাঁদের বাহনটি ছিলো তালেব সাহেবের আর এক প্রতিবেশী চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট আলম সাহেবের। সেই গাড়ীতে করেই তাঁরা মীরপুরের দিকে রওনা হন। কিন্তু তালেব সাহেব মাঝপথে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে নেমে বঙ্গবন্ধুর বাড়ী গিয়ে ওঠেন। উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুকে মীরপুরের পরিস্থিতি জানানো। শেষ রাত্তিরে তিনি হৈ হল্লা আর গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু এসব কথা শুনে আই.জি.–কে ফোন করলেন, মীরপুরে যেন পুলিস সরিয়ে ই.পি.আর. (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস–এখনকার বি.ডি.আর.) দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তারপর তালেব সাহেবের প্রতি নির্দেশ, তুই সর্বক্ষণ মীরপুরে থেকে আমাকে ওখানকার খবরাখবর জানাবি।

৩২ নম্বর রোডে সংবাদ দিয়ে এবং অন্য কিছু কাজ সেরে তাঁর বাসায় ফিরতে বেলা তিনটে পার হয়ে যায়। অর্থাৎ বাসায় তিনি অনুপস্থিত প্রায় আট ঘন্টা। ইতিমধ্যে মীরপুরে কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। সেসবের এক বড়ো কারণ তালেব সাহেবের কাজকর্ম।

আমি এসবের বিস্তারিত বর্ণনা শুনেছি তালেব সাহেবের মেজো ছেলে– আমাদের স্নেহভাজন খন্দকার আবুল আহসান ওরফে অঞ্জুর মুখে। সে আমাকে পরে একটি দীর্ঘ লিখিত বিবরণও দিয়েছিলো। ঘটনাগুলির পরেকার দুই–একটি কথা আমি আগে থেকেই জানতাম।

অঞ্জু আমাকে বলে, হেড মাস্টার সাহেবকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের বাড়ীতে ছোটোখাটো একটা ভীড় জমে যায়। ভীড়ে বাঙালী যেমন ছিলো, তেমনি বিহারীও। সবাই হেড মাস্টার কাইয়ূম সাহেবের খবর জানতে চায়। কিন্তু–তিনি হাসপাতালে আছেন, আর, তালেব সাহেব বঙ্গবন্ধুর বাড়ী গেছেন, এর বেশী কোনো খবর মেলে না।

তিনটের দিকে বাঙালীরা চলে যেতে থাকে। তখন অবধি তালেব সাহেবকে না পেয়ে। বিহারীদের দলে ছিলো জামিল নামে একটি প্রভাবশালী লোক। মীরপুরের তখনকার শান্তি কমিটির এক নেতা। বাঙালীরা চলে যাওয়ার পর সে অঞ্জুকে একান্তে ডেকে নিয়ে উর্দূতে কিছু বচন ঝাড়তে শুরু করে। তালেব সাহেব শেখ সাহেবের বাসায় গেলেন কেন? তিনি তো এখানকার সমস্যার সমাধানের জন্যে জামিলদের সাথে পরামর্শ করতে পারতেন। এখন তাঁর জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাদের পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব নয়। তিনি যেন নিজের দায়িত্বে চলেন।

অঞ্জু তখন ছেলেমানুষ। সে আর এই হুমকির কি জবাব দেবে? তবু সাহস করে একটি পুরোণো কথা তোলে।

তখন ১০ নম্বর সেকশনের 'এ' ব্লকের ৪ নম্বর রোডের ১ নম্বর বাড়ীতে—এখন যেখানে আছে প্রিপারেটরি গ্রামার স্কুল,—সেখানে ছিলো খাস বিহারীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদারে মিল্লাত উর্দূ মিডিয়াম স্কুল। আগের দিন—বাঙালী ছাত্রদের দ্বারা পাকিস্তান দিবসের বিপরীতে শোক দিবস রূপে ঘোষিত হয় ২৩ মার্চ—সেখানে কে বা কারা বাংলাদেশের অর্ধনমিত পতাকা তোলে। সেই সঙ্গে একটি কালো পতাকাও। পতাকা দুটি দেখে বিহারীরা ক্ষেপে যায়। তারা এমনকি রিকশায় করে বোমা নিয়ে বাঙালীদের ওপর হামলা চালাতে আসে। হুঙ্কার দিয়ে বলে, বাঙালীদের চিহ্নও রাখবে না।

তারা নাকি আগে থেকেই ক্ষেপে ছিলো। সৈয়দপুর, রংপুর, খুলনা এবং আরো কোনো কোনো জায়গায় বিহারী নিধন চলছে, এমনি কিছু খবর শুনে। তবু ৪ নম্বর রোডের ব্যাপারটি বেশী দূর গড়ায়নি। সেখানকার বেশীর ভাগ বাসিন্দা বিহারী, তাদের পড়শী সামান্য কয়েক ঘর বাঙালী। তারা সবাই মিলে হামলাকারীদের বোঝাতে থাকে, ১০ নম্বরে আমাদের নেতা আবু তালেব সাহেব। তিনি বলেন, আমরাও বলি, এখানে আমরা কেউ বাঙালী বা বিহারী নই। সবাই শুধু মীরপুরী। আমরা নিজেদের মধ্যে কোনো বিরোধে যাবো না।

এই প্রতিরোধে হামলাকারীরা তখনকার মতো ফিরে যায়।

ঘটনাটির উল্লেখ করে ছেলেমানুষ অঞ্জু বলে, আপনি যদি এর পর পরই বা বিকেলে একটা মীটিংয়ের ব্যবস্থা করতেন, তাহলে রাত্তিরে স্যারকে জখম হতে হত না।

কথাটা শুনে জামিল তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। এবং তখনই অঞ্জুদের বাড়ী থেকে চলে যায়।

বিকেলে বাসায় ফিরে তালেব সাহেব ছেলের মুখে জামিলের হুমকির কথা শোনেন। হেড মাস্টার সাহেবের ঘটনার দরুন ইতিমধ্যে বাঙালীদের মধ্যে নিদারুণ হতাশা আর আতঙ্ক দেখা দিতে শুরু করেছে। মীরপুরের শতকরা প্রায় নব্বুইজন বাঙালী ঘরবাড়ী ছেড়ে ঢাকায় পলাতক।

একদিন অঞ্জু আমাকে বলেছিলো, ২৩ মার্চ দিবাগত রাত্রে কাইয়ূম স্যার আহত না হলে কোনো বাঙালী মীরপুর ছাড়তো না এবং ২৫ মার্চ রাতে বা তারপর মীরপুরের কোনো বাঙালী বাঁচতো না। কথাটা অপ্রিয় হলেও বলা যায়, সমগ্র মীরপুরের বাঙালীদের আঘাত, মৃত্যু স্যারের ওপর দিয়ে গেছে।

কিন্তু এ তো অনেক পরের হিসেব। ছেলের মুখে রিপোর্ট শুনে তালেব সাহেব তাৎক্ষণিক হিসেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। প্রতিবেশী বন্ধু হান্নান সাহেব আর আলম সাহেব তখন সপরিবারে মীরপুর ছাড়বার আয়োজন করছেন। তালেব সাহেব তাঁর পরিবারের সদস্যদের ডেকে বললেন, তোমরাও ওঁদের সাথে বেরিয়ে পড়ো।

তাঁর কথায় তারা প্রায় এক কাপড়ে বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়। গিয়ে ওঠে চামেলীবাগে, তাঁর বোনের বাসায়। কিন্তু যাঁকে লক্ষ্য করে বিহারী জামিল হুমকি দিয়েছিলো, সেই তালেব সাহেব নিজে রয়ে গেলেন মীরপুরে। সেখানকার অবস্থা সরেজমিনে জানবেন বলে।

তিনি চামেলীবাগ যান পরদিন – ২৫ মার্চ সকালে। মীরপুর সম্পর্কে তখন তিনি রীতিমতো দুশ্চিন্তিত। সবাইকে জানালেন, ওখানকার অবস্থা থমথমে। রাত্তিরে বিহারীরা বেশ কয়েকটি বোমা ফাটায়। পুলিসের জায়গায় ই.পি.আর. দেওয়া হয়নি। এবং পুলিসের সংখ্যাও কম। পরিস্থিতি কখন কেমন মোড় নেয়, তা জানার জন্যে তিনি মীরপুর ফিরে যাবেন। তাঁর নাকি অন্য একটি জরুরী কাজও আছে।

অন্য কাজটি কাইয়ূম সাহেবের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর তেরো–চৌদ্দশো টাকা মীরপুরে পড়ে ছিলো। সেগুলো এনে দিতে পারলে এই দুঃসময়ে হয়তো কাজে লাগবে।

কিন্তু পরিবারের সবাই বেঁকে বসে। কাজ তাঁর যেমনি হোক, যতো জরুরীই হোক, তারা তাঁকে মীরপুরে ফিরে যেতে দিতে কিছুতেই রাজী নয়। তাদের চাপে পড়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাদের কথা দিতে বাধ্য হন, না, যাবেন না।

রাত্তিরে তিনি অঞ্জুকে সাথে নিয়ে গেলেন ৫ চামেলীবাগে। তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, 'ইত্তেফাক'–এর বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেনের বাসায়।

'ইত্তেফাক'–এ দুজনে সহকর্মী। এদিকে, ৬৪ নর্থব্রুক হল রোডে পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাটে আগে একটানা তেরো বছর বাস করেছেন সপরিবারে। তার ফল বন্ধুত্ব আর আত্মীয়তার মাঝখানের সীমা লোপ। সিরাজুদ্দীন হোসেনের বাসায় দুই বন্ধুতে শুরু হল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা। আবু তালেব বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল বা আদর্শের সমর্থক নন। কিন্তু দেশের জন্যে তাঁর ভালোবাসা আর দশজন বাঙালীর দেশপ্রেমের থেকে কোন অংশে কম যায় না। আর, সিরাজুদ্দীন হোসেন তো সচেতনভাবেই আওয়ামী লীগার। এদিকে, পেশায় নেশায় দুজনেই সাংবাদিক। তাঁদের আলোচনা তাই সহজে থামে না।

তালেব সাহেব ছেলেকে নিয়ে বোনের বাসায় ফেরেন রাত দশটার দিকে, রাত্তিরের খাওয়দাওয়ার পাট বন্ধুর ওখানেই চুকিয়ে।

তারপর তাসের আসর। তালেব সাহেবের এক অভ্যেস ছিলো, নির্মল আনন্দ ভোগে ছেলেদেরও বন্ধুর মতো সঙ্গী করে নিতেন। তাসের আসরে তাঁর তাই পার্টনারের অভাব হয় না। তিনি খেলতে বসেন বড়ো ছেলে চঞ্চল, মেজো ছেলে অঞ্জু আর ভগ্নীপতিকে নিয়ে।

এই আসরের সময় সবারই চোখে পড়ে এক করুণ দৃশ্য। রীতিমতো খাপছাড়া। তালেব সাহেবের স্ত্রী বসে আছেন একা, যেন দলছুট হয়ে, একেবারে ঝিম মেরে। কারো সাথে কোনো কথা নেই। মীরপুরে হেড মাস্টার সাহেবের সেবাযত্ন করেছিলেন সাহসের সাথেই। কিন্তু তখনই মানুষটির সারা গায়ে রক্ত দেখে সেই যে একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন, সে–ভাবটা আর কাটেনি। পরের দু'দিনে সেটা বরং আরো বেড়েছে।

ঘন্টাখানেক পরই ঘটে আর এক ভয়াবহ ঘটনা। হঠাৎ তালেব সাহেবদের কানে আসতে থাকে গুলির শব্দ। আর কিছুক্ষণ পর,–রাত তখন সম্ভবতঃ সাড়ে এগারোটা,–সেই শব্দকে ছাপিয়ে ওঠে মর্টার, ট্যাঙ্কসহ নানারকম স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিকট আওয়াজ। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে হাইড্রলিক বোমা ছুঁড়ে চারদিক আলোয় আলোময় করে ফেলা। তারপর ট্যাঙ্ক থেকে শেল মারা। লক্ষ্য রাজারবাগ পুলিস লাইন্‌স্‌।

ঘটনার আকস্মিকতায় তালেব সাহেবদের বাসায় সবাই হকচকিয়ে যান। তাঁরা ছিলেন রাজারবাগের ঠিক পাশেই। তাঁদের বাসা আর পুলিস লাইন্‌সের মাঝখানে শুধু কাঁটাতারের বেড়া। তালেব সাহেবদের তাই বলতে গেলে কিছুই দেখতে বাকী থাকে না।

রাজারবাগে সেদিনকার বর্বর পাকিস্তানী হামলার অনেক বিবরণ আমরা

পরবর্তী কালে পেয়েছি, নানা সূত্রে নানা জায়গায়। তবু, সে-রাতে অঞ্জুর যে অভিজ্ঞতা হয়, তার কিছুটা এখানে লিখলে বাহুল্য হবে না।

অঞ্জুর ফুফুদের ভাড়াবাড়ীটি ছিলো ছোটো। পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনির। ওপরে টিন। হামলা যতোই বাড়তে থাকে, এই বাড়ীটিও ততোই তার আওতায় এসে পড়ে। জানলার কাচগুলি গোড়ার দিকেই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো গোলার আওয়াজে। এক সময় টিনের চালে ছিটকে পড়া গুলি বিকট শব্দ তোলে। দেয়াল থরথর করে কাঁপতে থাকে।

এরই মধ্যে অঞ্জুরা বুঝতে পারে, পুলিসও কিছুটা বাধা দিচ্ছে। কিন্তু সে-বাধা বড়োই ক্ষীণ। হানাদারদের আধুনিক সমরাস্ত্রের মোকাবেলায় রাইফেল দিয়ে।

শেষ রাত্তিরের দিকে কিছু পুলিস কোনো ক্রমে পালিয়ে এসে তাদের বাসায় ঢুকে পড়েন। তখন জানা যায়, পুলিস লাইন্‌সে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের উপযোগী যে সমস্ত অস্ত্র ছিলো, হানাদাররা প্রথমেই সেগুলি ধ্বংস করে ফেলে। পুলিস তাই সাধারণ রাইফেল ছাড়া আর কিছুই ব্যবহারের সুযোগ পায়নি। আবার, সে-সুযোগও ছিলো অত্যন্ত সীমিত। তার কারণ গুলির অভাব। পুলিসের কাছে গুলি ছিলো গড়ে ২৫ রাউন্ড বা তার থেকেও কম। এসব দিয়ে আর কতোক্ষণ আত্মরক্ষা করা যায়?

পালিয়ে-আসা পুলিসগুলি অঞ্জুদের কাছে লুঙ্গি, সার্ট-পায়জামার মতো সিভিল পোশাকের জন্যে কাকুতি মিনতি করতে থাকেন। উর্দি ছেড়ে সিভিল পোশাক পরতে পারলে একটু নিরাপত্তা পাওয়া যাবে, এই ছিলো তাঁদের আশা। বাসার লোকজন তাঁদের লুঙ্গি এবং অন্যান্য কাপড় দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করে।

কিন্তু সিভিল পোশাক পেলেও এ-বাসায় থাকাটা তাঁরা নিরাপদ বলে মনে করেননি। শেষ পর্যন্ত তাই ভোর হওয়ার আগেই আপন আপন প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে এদিক-সেদিকে পালাতে শুরু করেন। হাতের অস্ত্রশস্ত্র বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে।

সকাল হওয়ার সাথে সাথে গোলাগুলির শব্দ কিছুটা কমে আসে। তখন বাসার লোকজন বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে, বাড়ীটার চারদিকে পুলিসদের ফেলে-যাওয়া রাইফেল, বেয়োনেট, পিস্তল, রিভলবার, গুলির খালি খোসা ইত্যাদি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এসব যদি কোনো ক্রমে পাকিস্তানী হায়েনাদের চোখে পড়ে, তাহলে এখানকার কারো রক্ষা থাকবে না। বাসার সবাই মিলে তাই জিনিষগুলো কুড়িয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে ফেলে দিয়ে

আসে। রীতিমতো প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। গোলাগুলি তখনও চলছিলো।

অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে আসবার পরও কিন্তু স্বস্তি মেলে না। যদি পাকিস্তানীরা এদিকে আসে! শেষ পর্যন্ত তাই সবাই পাঁচিল টপকে পাশের বাড়ীতে গিয়ে ওঠে। সেখানে তাদের আশ্রয় মেলে ছোটো ৮´ x ৮´ মাপের একটি কামরায়। মোট লোক ছাব্বিশজনের মতো। ২৬ মার্চ দিনগত রাতটি কেউ শুয়ে, কেউ বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে সেইখানেই কাটায়। বাইরে কারফিউ। বেরুলেই গুলি খেতে হবে। সুতরাং ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঘুম বা খাওয়াদাওয়ার তো কথাই নেই।

ভেতরে কষ্টের ব্যাপার ছিলো অনেক। সবচেয়ে বড়ো কষ্টের বিষয়,তালেব সাহেবের স্ত্রী তখন মানসিক ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপেই হারিয়ে ফেলেছেন। কিছুক্ষণ পর পরই 'জয় বাংলা' বলে শ্লোগান দিচ্ছেন। তালেব সাহেব তখন তাঁর মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে এবং ধমক দিয়ে তাঁকে থামাবার চেষ্টা করেন।

অবশেষে কষ্টের রাত পোহায়। সকালে রেডিয়োর মাধ্যমে জানা যায়, সেদিন—২৭ মার্চ—ভোর ছ'টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত কারফিউ থাকবে না। ঘোষণাটিতে একটু স্বস্তি আসে। তালেব সাহেবেরা আবার দেয়াল টপকে বোনের বাসায় ফেরেন। কোনো মতে মুখে দু'মুঠো গুঁজে নেন।

তখন রুহুল আমিন নামে তালেব সাহেবের দূর সম্পর্কের এক ভাই সেক্রেটারিয়েটে কোনো এক বিভাগে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। থাকতেন পলাশী ব্যারাকে রিক্রুটিং সেন্টারের পূব পাশে সরকারী বাসায়। তালেব সাহেব খাওয়াদাওয়ার পর মেজো ছেলেকে ডেকে বললেন, এখানে থাকা তো নিরাপদ নয়। তুমি একটু পলাশীতে গিয়ে দেখে এসো, তোমার আমিন চাচারা বেঁচে আছেন কিনা।

তাঁর কথামতো অঞ্জু সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অসংখ্য পচা লাশ আর দুর্গন্ধের মধ্যে দিয়ে তার পথ। লাশের পচা গন্ধে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসার যোগাড়। অনেক লাশ তখন হানাদাররা ট্রাকে করে সরিয়ে ফেলছে।

পলাশীতে অঞ্জু চাচার কোনো সন্ধান পায়নি।

ফেরবার সময় সে আসছিলো কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে দিয়ে। শহীদ মিনার তখন হানাদারদের হাতে নিজেই শহীদ। গোলার ঘায়ে বিধ্বস্ত তার সিঁড়ি। মিনার ভেঙেচুরে প্লাস্টার (মোজাইক) উলটে আছে। কোনো কোনো জায়গায় কংক্রিট দেখা যাচ্ছে। মিনার নুয়ে পড়েছে। রডগুলি বেরিয়ে আছে।

এই বিধ্বস্ত মিনারের মেঝের ডান কোনায় বিহারীরা অনেক দিন আরবী

হরফে লিখে রেখেছিলো, 'মসজিদ'।

অঞ্জু ফুফুর বাসায় ফিরে আসে এগারোটার দিকে। এবং এসেই পড়ে এক আকস্মিক বিপদে। বাসায় কেউ নেই! ভয়ে কিশোর অঞ্জুর দশা দাঁড়ায় তখন নিদারুণ। সে রীতিমতো চীৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়।

তার কপাল ভালো, কাঁদতে কাঁদতেই এক সময় সে হঠাৎ দেখতে পায়, দরজার গায়ে একটা চিরকুটে লেখা রয়েছে, বাসার সবাই আরামবাগে দূর সম্পর্কের এক কুটুম্ব–তালেব সাহেবের খালাতো ভাইয়ের শ্যালক গিয়াস সাহেবের বাসায় আছে। অঞ্জুও যেন সেখানে চলে যায়।–এতোক্ষণে অঞ্জুর ধড়ে জান ফিরে আসে। সে সেই মুহূর্তেই সাইকেল নিয়ে আরামবাগের দিকে ছুট দেয়।

সেদিনও কারফিউ আরম্ভ হওয়ার পর আবার গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। কিন্তু আগের দিনের তুলনায় কম। রেডিয়োতে শোনা গেল, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু রাস্তায় অতো লাশ দেখে আসবার পর অঞ্জু কথাটা সত্যি বলে মেনে নিতে পারে না। বাসার অন্য কেউও।

২৮ মার্চও সকাল ছ'টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়। সেদিন তালেব সাহেব স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠে একটি ঘোষণা শুনতে পান। ঘোষণাটি তাঁকে খুবই উদ্দীপ্ত করে। তাঁর সেদিনের মন্তব্য ঃ সর্বস্তরের মানুষ এবার সৈনিকদের সাথে মিলে ২৫ মার্চের হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নেবে।

কিন্তু এই উদ্দীপনার সাথে তাঁর মনে ছিলো একটি বিষাদও। সেদিন সকালবেলা তিনি 'ইত্তেফাক' ভবনে যান। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানীরা বাড়ীটা ধ্বংস করে দিয়েছিলো। তালেব সাহেব সেখানে কয়েকজনের পোড়া লাশ দেখেন। কিন্তু কাউকেই সনাক্ত করতে পারেননি। মানুষগুলির জন্যে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁর মনটা কাতর হয়ে পড়ে, বুকের ওপর ভারী হয়ে বসে তাদের পরিবার–পরিজনের জন্যে বেদনাবোধ।

এবং কিছু বাড়তি চিন্তাও। বড়ো ছেলে চঞ্চলের বন্ধু মনসুর আহমদ (তখন বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসের কস্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট, পরে মুক্তিযোদ্ধা, বর্তমানে সাতক্ষীরা ৪–এর আওয়ামী লীগ সদস্য)। খুঁজতে খুঁজতে সে গিয়াস সাহেবের বাসায় এসেছে। তালেব সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তার পর ঠিক হয়, পরদিন–২৯ মার্চ–কারফিউ না থাকলে অঞ্জু এবং মনসুর সকালবেলাই মীরপুরের বাসায় যাবে। উদ্দেশ্য, হেড মাস্টার কাইয়ূম সাহেবের বাসা থেকে উদ্ধারকৃত এবং

তালেব সাহেবের বাড়ীতে রেখে আসা (তেরো–চৌদ্দোশো) টাকা নিয়ে আসা। তালেব সাহেব হেড মাস্টার সাহেবের জন্যে তখন খুবই উদ্বিগ্ন। ভাবছিলেন, টাকাগুলো এনে দিতে পারলে বিপদের দিনে হেড মাস্টার সাহেবের কাজে লাগবে। তাঁর জন্যে টাকা ধার করবার চেষ্টাও তালেব সাহেব করেন। কিন্তু পাননি।

মনসুর আর অঞ্জুকে মীরপুরে পাঠানোর আরো দুটি উদ্দেশ্য ছিলো। এক, সেখানকার বাড়ী এবং এলাকার খোঁজখবর নেয়া। দুই, তাঁর গাড়ীখানা টায়ার–ফাটা অবস্থায় তাঁদের গ্যারেজে পড়ে ছিলো, সম্ভব হলে সেখানা সেই অবস্থায়ই আরামবাগে নিয়ে আসা। এদিকে চলাফেরায় খুবই অসুবিধা হচ্ছিলো। বিশেষ করে, কারফিউ মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে ওঠে বলে।

পরদিন, ২৯ মার্চ, মনসুর আসতে দেরী করে। হয়তো সে অফিসে আটকা পড়েছে। পাকিস্তান সরকার তখন রেডিয়ো মারফত তাগিদ দিচ্ছে, সবাই যেন নিয়মিতভাবে অফিসে যায়। ঘোষণাটি শুনতে শুনতে তালেব সাহেবও একটা সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তখন বসতেন মতিঝিলে শিল্প ভবনের নীচতলায় বি.এন.আর.–এর একটি শাখার ঘরে। তাদের আইন উপদেষ্টা হিসেবে। ঠিক করেন, সেখানে গিয়ে কোনো রকমে মাইনেটা নিয়ে নেবেন। এবং সম্ভব হলে, পাশের এক আইনজীবী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মালিক রহমান সাহেবের গাড়ীখানাও। উদ্দেশ্য, সেই গাড়ীতে চেপে মীরপুর গিয়ে সেখানকার অবস্থাটা সরেজমিনে দেখে আসবেন।

তিনি মাইনে আনতে যান, তাতে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে সবারই ঘোর আপত্তি। অঞ্জুরা ইতিমধ্যে মীরপুর থেকে বেঁচে আসা এক বাঙালীর কাছে ওদিকের কিছু খবর শুনেছে। বিহারীরা মাথায় লাল পট্টি বেঁধে বাঙালীদের হত্যা করে বেড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে চলছে তাদের বাড়ীতে লুটপাট। সব শুনে তালেব সাহেব কথা দেন, না, মীরপুর যাবো না। শুধু অফিস থেকে ঘুরে আসি।

বেলা সাড়ে দশটা। মনসুর তখনও আসেনি। অঞ্জু কি ভেবে সাইকেল নিয়ে গুলিস্তানের দিকে বেরিয়ে পড়ে। সেখানে গিয়ে দেখে, গভর্ণর হাউসের (বর্তমান বঙ্গভবন) প্রধান ফটক তখন বি.আর.টি.সি.–র বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে। তাতে তালা লাগানো। পাশে পড়ে রয়েছে দুটি পুরুষ আর এক মহিলার লাশ। একটি পুরুষের লাশ দেখা যায় একটু উত্তরে, পার্কের ভেতর পুকুর পাড়ে। লাশটি পোড়া, কিন্তু মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এসব দেখে হঠাৎ অঞ্জুর মনে হয়, এগুলো কুলক্ষণ। হয়তো তার কোনো আপনজনের বিপদ–আপদের ইঙ্গিত। কথাটা ভাবতেই সে যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে।

এরই মধ্যে তার চোখ যায় একখানি দোতলা বাসের দিকে। বাসখানি আসছে মীরপুর থেকে। অঞ্জু মনে একটা আশা নিয়ে এগিয়ে যায়। বাসে যদি কোনো পরিচিত যাত্রী থাকে, তার কাছে মীরপুরের বাড়ীর খবর নেবে। তা–বাঙালী কোনো যাত্রী মেলে না। পাওয়া যায় শুধু ১৮/২০ বছরের এক বিহারী ছোকরাকে। সে অরিজিন্যাল ১০ নম্বরের এক পানবিড়ির দোকানী, অঞ্জুদের পরিচিত। অঞ্জুকে সে সমীহও করতো। কিন্তু এখন দেখা যায় তার অন্য রূপ। তাকে বাস থেকে নামতে দেখে অঞ্জু সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সালাম দিয়ে তাদের বাড়ীর খবর জানতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বিহারীর অগ্ন্যুৎপাত। একেবারে মা–বাপ তুলে। সেসবের ভেতর অঞ্জুর জন্যে জ্ঞাতব্য, তাদের বাড়ীতে দুজন লোককে জবাই করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

খবরটা বাবাকে জানানো দরকার। অঞ্জু মীরপুর যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করে বি.এন.আর. অফিসের দিকে ছুট দেয়। কিন্তু তিনি সেখানে নেই।

তাহলে হয়তো আরামবাগ গেছেন।

না, অঞ্জুর সে–ধারণাও ভুল।

তাহলে কোথায় গেলেন তালেব সাহেব?

এবার শুরু হয় অঞ্জু আর মনসুরের ছোটাছুটি। সম্ভাব্য সকল জায়গায়। সেদিন কারফিউ শিথিল করা হয়েছিলো বিকেল চারটে অবধি। সেই সময় তক দুজনে হন্যের মতো খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু তালেব সাহেব কোথাও নেই।

এরপর স্বাভাবিক কারণেই বাসায় কান্নাকাটি শুরু হয়। বেগম তালেব এই কয় দিনের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পাগলামি করেছেন, কিন্তু কান্নাকাটি কখনো করেননি। আজ তাঁকেও দেখা যায় কাঁদতে। সবাই ধরে নেয়, তালেব সাহেব বেঁচে নেই।

কিন্তু বাইরে বেঁচে নেই বলে–বা হারিয়ে গেলেই–আমাদের মন থেকেও কি তিনি হারিয়ে যাবেন? মুখে আমরা যা–ই বলি না কেন, বাস্তবে কিন্তু তিনি তা–ই গেছেন। তাঁকে শ্রদ্ধাভরে এবং স্থায়ী পন্থায় স্মরণ করে গত বিশ বছরে কেবল একটি প্রতিষ্ঠান, মীরপুরের শহীদ আবু তালেব হাই ইস্কুল। তাঁর সম্পর্কে কোনো উল্লেখযোগ্য লেখা আমি কোথাও দেখিনি। বাংলা একাডেমীর 'স্মৃতি ঃ ১৯৭১'–এর তৃতীয় খণ্ডে তাঁর বিষয়ে একটি লেখা আছে। তার প্রায় সবটুকুই আবু তালেব জুড়ে রয়েছেন হাস্যরসিক রূপে। হ্যাঁ, আমরাও জানি,

ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি ছিলেন অতি বিশিষ্ট এক হাস্যরসিক পুরুষ। খন্দকার আবু তালেবের হাসি-কৌতুক সর্বদাই হয়েছে উপস্থিত বুদ্ধিতে লালিত। যদিও সাধারণভাবে একটি সার্বক্ষণিক কৌতুকবোধও তাঁর ছিলো। জীবনে তিনি যতো হাসির কথা বলেছেন, যতো হাসির কাণ্ড করেছেন, সেসব লিখে ফেললে অন্ততঃ একশো পৃষ্ঠার একখানি চমৎকার হাসির বই হয়ে যেতো।

একদিন পল্টনের মোড়ে তাঁর সাথে দেখা। তিনি বাসের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর গন্তব্য 'ইত্তেফাক' অফিস। কিন্তু যতো বাস আসে, তাদের সবারই গন্তব্য সদরঘাট। তাঁর আর 'ইত্তেফাক' যাওয়া হয় না। এক সময় দেখি, একখানি বাস এসে থামলে তিনি তার কণ্ডাক্টরকে বলছেন, ভাই, চলো না, টিকাটুলি চলো। ভাড়া বেশী দেব।

আবু তালেবের পেশা ছিলো সাংবাদিকতা। সাংবাদিক জীবনের প্রথম দিকে তিনি কিছু দিন দৈনিক 'আজাদ'-এ কাজ করেন। তখন মওলানা আকরাম খান জীবিত। হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর কাগজে 'শ্রী' লেখা চলবে না। তার জায়গায় লিখতে হবে 'জনাব'। আজকের সিলেট তখন শ্রীহট্ট নামে পরিচিত। একদিন বার্তা বিভাগের টেবিলে আবু তালেব এই শ্রীহট্টের বদলে লিখলেন জনাবহট্ট। অনতিকাল পরই মওলানা সাহেবের কামরায় তাঁর ডাক পড়ে। এবং কৈফিয়ত তলব হয়, এটা তুমি কি করেছো? তালেব সাহেবও তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, কেন, আপনারই তো নির্দেশ, 'শ্রী'-র বদলে 'জনাব' লিখতে হবে।

আবু তালেব রসিকতা করতেন নিজেকে নিয়েও। যা অনেক বড়ো হাস্যরসিকও পারেন না। তিনি নিজের শরীরটার তুলনা করতেন কুমড়োর সাথে। তাঁর সামনের দাঁতগুলো ছিলো উঁচু। নাকটা চাপা। মাথায় বিরাট টাক। বন্ধুমহলে এসব নিয়ে তাঁর নানারকম অদ্ভুত রসিকতা শোনা গেছে। প্রয়াত অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর সাথে নিজের তুলনা করে বলতেন, আমাদের মধ্যে তফাৎ সামান্যই। তুলসী চক্রবর্তী মাথায় উঁচু, আর, আমি দাঁতে।

কিন্তু এই-ই তো তাঁর সবটুকু পরিচয় নয়। আসল আবু তালেব এর থেকে ভিন্ন পুরুষ। সে-সত্তায় তিনি সংগ্রামী, রাজনীতিতে দলনিরপেক্ষ হয়েও বড়ো মাপের দেশপ্রেমী এবং অতি মাত্রায় বন্ধুবৎসল।

বন্ধুবাৎসল্যে জীবনের ঝুঁকি নিতেও যে তিনি দ্বিধা করতেন না, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি হেড মাস্টার কাইয়ুম সাহেবের ব্যাপারে।

'ষাটের দশকের গোড়ার দিকে (১৯৬২) তিনি একবার সাংবাদিক

ইউনিয়নের সভাপতি হন। তখন তিনি সারাক্ষণ গায়ে উকিলের শামলা চড়িয়ে রাখতেন। কেন? না, এই জন্যে। সরকার বা পত্রিকামালিক কোনো সাংবাদিকের সাথে অন্যায় আচরণ করেছেন, এমন সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি আদালতে ছুটে যাবেন, ওই সাংবাদিকের পক্ষ নিয়ে লড়তে।

বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত রাজনৈতিক দলিল ছয় দফা প্রণীত হয়েছিলো ইংরেজীতে। এর বাংলা তরজমা করেন খন্দকার আবু তালেব। তখন একজন তাঁকে বলেন, এর জন্যে টাকা পাচ্ছো তো? তালেব সাহেব জবাব দেন, এটা দেশের কাজ। এর জন্যে টাকা নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি নির্ভীকভাবে তাঁর বাসায় বিপন্ন প্রতিবেশী হিন্দুদের আশ্রয় দিয়েছেন।

সাতক্ষীরা জেলার সাতানি গ্রামের এক অখ্যাত দরিদ্র পরিবারের প্রথম সন্তান ছিলেন আবু তালেব। পিতা খন্দকার আবদুর রউফ, মাতা বেগম রোকেয়া খাতুন। তাঁদের মোট এগারোটি সন্তান। গিয়ে থুয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলো অবশ্যি মাত্র চারজন।

মোটামুটি হিসেবে ছোটো এই পরিবারের বড়ো ছেলে হলেও তাঁকে লেখাপড়ার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে দারুণ। বাবা চাননি, তিনি লেখাপড়া শিখুন। বার বার চাপ দিয়েছেন, ছেলে পড়াশোনা ছেড়ে সংসারের কাজে আর্থিক সাহায্য করুক। কিন্তু মায়ের উৎসাহ পড়াশোনায়। সেই উৎসাহ আর নিজের আগ্রহকে সম্বল করে আবু তালেব পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। জায়গীরবাড়ীতে থেকে, তাদের নানা রকম ফাইফরমাস খেটে আর ছেলেমেয়েকে পড়িয়ে।

ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি চলে যান কলকাতায়। সেখানে ক্যাম্বেল হাসপাতালে দিনের বেলায় কেরানীর চাকরি নেন। আর, রাত্তিরে রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে পড়াশোনা করেন। মাসান্তে মাইনের প্রায় সবটুকুই তুলে দিয়েছেন মায়ের হাতে।

ভারতবিভাগের পর শুরু হয় তাঁর সাংবাদিক জীবন, ঢাকায়। প্রথমে দৈনিক 'আজাদ'–এ। তারপর কখনো 'ইনসাফ'–এ, কখনো 'পাকিস্তান অবজারভার'–এ। অল্পকালের জন্যে। পরে বছর পাঁচেক 'সংবাদ'–এ। এরপর কিছু দিনের বেকার জীবন। শেষে, প্রথমে 'ইত্তেহাদ'–এ, তারপর 'ইত্তেফাক'–এ। সব পত্রিকাতেই তিনি ছিলেন সাব–এডিটর। শুধু 'ইত্তেফাক'–এ চীফ রিপোর্টার, ১৯৬৬ সাল তক। দৈনিক 'আওয়াজ'–এর অন্যতম আকর্ষণ 'কাগজের মানুষ' কলামটির তিনিই ছিলেন লেখক।

ইতিমধ্যে তিনি এম.এ. পাশ করেছেন, আইনে ডিগ্রী নিয়েছেন। কিন্তু সাংবাদিকতা ছেড়ে কোথাও যাননি। শুধু একবার, হঠাৎ 'ইত্তেফাক' বন্ধ হয়ে গেলে, ওকালতি করেন কিছু দিনের জন্যে। সাংবাদিকতার অনিশ্চিত জীবনে তাঁর এক মহৎ কীর্তি, তিনি কেবল নিজের শিক্ষার দিকেই মন দেননি, একমাত্র বোন এবং একটি ভাইয়ের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাও তাঁরই হাতে হয়েছে। এমন সংগ্রামের মধ্যে জীবনে নিজের জন্যে খুব বেশী কিছু করা সম্ভব ছিলো না। 'ষাটের দশকের শেষ দিকে তৈরী ছোট্টো একখানি একতলা বাড়ী এবং একখানি ছোটো গাড়ী,- নিজের এবং পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এই-ই তাঁর অর্জন।

এই অর্জনও তিনি বেশী দিন ভোগ করতে পারেননি। ২৯ মার্চ তাঁকে হারিয়ে যেতে হল। অপ্রকৃতিস্থ স্ত্রী আর তিনটি নাবালক ছেলেমেয়েকে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়ে।

চঞ্চল-অঞ্জুর সংগ্রাম

হ্যাঁ, খন্দকার আবু তালেবের মৃত্যু তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জীবনে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তাহীনতাও। ছেলে চঞ্চল আর অঞ্জু এসব বুঝতে পারে ২৯ মার্চেই।

সেদিনের ব্যর্থ খোঁজাখুঁজির পর কারো আর মনের জোর টিকে থাকবার কথা নয়। রাত নামতেই বড়ো ছেলে চঞ্চল ভয়ানক ঘাবড়ে যায়। রাত্তিরে কারফিউয়ের মধ্যে আবার যখন গোলাগুলির শব্দ কানে আসে, তখন সে আরো নার্ভাস হয়ে পড়ে। আশ্রয়দাতা গিয়াস সাহেবকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, চাচা, এখানে থাকলে আমরা কেউ বাঁচবো না। আপনি ঢাকার বাইরে কোথাও চলুন।

এইচ.এস.সি.–র ছাত্র চঞ্চল তখন প্রতিটি গুলির শব্দে চমকে উঠছে। তার মা কেঁদেই চলেছেন। এসব সইতে না পেরে শেষ পর্যন্ত গিয়াস সাহের সিদ্ধান্ত নেন, কারফিউয়ের মধ্যে তো বেরুনো সম্ভব নয়, রাত পোহালেই সবাই বেরিয়ে পড়বেন। রিকশা করে প্রথমে তারাবো হয়ে পুবাইলের দিকে। তারপর যাবেন কালীগঞ্জ থানার বেউড়া গ্রামে, তাঁর শ্যালকের বাড়ীতে। যদিও সে–বাড়ীতে তিনি আগে কখনো যাননি।

কিন্তু গিয়াস সাহেবের সমস্যাটি আসল সমস্যা নয়। সেটি দেখা দেয় বলতে গেলে তাঁরা পথে নামতেই। পথের দু'পাশে নানা জায়গায় আগুন। সেসব পেরিয়ে বাসাবো তক যাওয়ার পর রিকশা আর এক ইঞ্চিও নড়তে রাজী নয়।

গিয়াসউদ্দীন সাহেবের শরণার্থী বাহিনীতে তখন সতেরোজন মানুষ। নারী–পুরুষ, ছোটো–বড়ো মিলিয়ে। এতোগুলি মানুষের জন্যে আর কোনো বাহন মেলে না। বাধ্য হয়ে সবাই হাঁটতে শুরু করে। লক্ষ্য তারাবো ঘাট। সেখানে পুবাইল তক যাওয়ার জন্যে একখানা নৌকো ঠিক করা হয়। ভাড়া দেড়শো টাকা।

তাঁদের রাত কাটে মাঝির বাড়ীতে। সেও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মানুষের জন্যে মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখবার। দলে তালেব সাহেব, তাঁর বোন এবং গিয়াসউদ্দীন সাহেব–এই তিনজনের পরিবারের মানুষ। মাঝির বাড়ীর লোকজন তাঁদের তিন ভাগ করে এক ভাগ রাখে তাদের ঘরে, এক ভাগ উঠোনে, এক ভাগ নৌকোয়। এবং সকালে পান্তা না খাইয়ে কাউকে ছাড়ে না।

দলটি বেউড়ায় গিয়াসউদ্দীন সাহেবের শ্যালকের বাড়ী গিয়ে পৌছয় ৩১ মার্চ।

সেখানে তাঁরা ছিলেন ৩ জুলাই তক।

ইতিমধ্যে বেগম আবু তালেব একেবারেই উন্মাদ হয়ে গেছেন। তালেব সাহেব বেঁচে নেই, একথা বিশ্বাস করেন না। হাতে চুড়ি পরে থাকেন। (পরে, স্বাভাবিক অবস্থায়, মৃত্যুসংবাদটি বিশ্বাস করতেন, হাতে চুড়িও রাখতেন না।) চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। বৃষ্টি নামলে মনের সুখে ভিজবেন, এই সাধ নিয়ে বৃষ্টির জন্যে সারা রাত জেগে কাটান। মাঝে মাঝে দা নিয়ে ছেলেমেয়েদের তাড়া করেন, তাদের সবাইকে কেটে ফেলবেন। বেশী বাড়াবাড়ি দেখলে চঞ্চল বাধ্য হয়ে তাঁকে মেরে ধরে থামিয়ে রাখে। অপ্রকৃতিস্থ বেগম তালেব কখনো কখনো মলমূত্রের মধ্যে শুয়ে থাকেন। একদিন ডেটল খেয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় এমনি

নোংরার ভেতর শুয়ে ছিলেন। চঞ্চল আর অঞ্জু তাঁকে টেনে তুলে ডাক্তারের সাহায্যে কোনো মতে প্রাণে বাঁচায়।

তখন থেকেই তাঁর শরীর ভাঙতে থাকে। তাঁকে ঘরে আটকে রাখাও আর সম্ভব হচ্ছিলো না। এরই মধ্যে তিনি প্রায় রাতেই না খেয়ে রোজা রাখতে আরম্ভ করেন।

বেগম আবু তালেব আজও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি।

বেউড়ায় ছেলেমানুষ চঞ্চল–অঞ্জু শুধু মাকে নিয়েই বিপদে পড়েনি। তাদের বিপদ দেখা দিয়েছিলো অন্য এক দিকেও। রান্না হত এক সাথে সতেরোজনের। কিন্তু ভাত–রুটি একেবারে মাপা। খাবারের মানও নীচু। চঞ্চল–অঞ্জুকে সব দেখেও চুপ করে থাকতে হয়। পরে ব্যাপারটি তারা আরো ভালোভাবে বুঝেছে। একে তারা তখন আছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। তার ওপর, তাদের ফুফু বা গিয়াস সাহেব–কারো হাতেই বেশী টাকাপয়সা নেই। দুজনেই সঙ্গত কারণেই বেশ হিসেব করে খরচপত্র চালাতে বাধ্য হচ্ছিলেন।

এই দুই বিপদের মধ্যে বেউড়ায় বেশী দিন থাকা চঞ্চলদের পক্ষে সম্ভব হয় না। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে ফুফুকে নিয়ে তারা ফিরে আসে ঢাকায়। ওঠে ১১ কুঞ্জবাবু লেন, রোকনপুরে, ফুফুদের নিজস্ব বাসায়। তারপর একদিন মা আর একমাত্র বোন দীপুকে নিয়ে চঞ্চল চলে যায় মামার বাড়ী, সাতক্ষীরার লাবসা গ্রামে।

মামার বাড়ীতে মা–বোনকে নিয়ে চঞ্চলের দিন কোনো রকমে কাটে। আর, ঢাকায় অঞ্জুর শুরু হয় জীবনসংগ্রাম। নবম শ্রেণীর ছাত্র অঞ্জুর সেও এক দারুণ অভিজ্ঞতা। কিছু দিন সে ফুফুর বাসায় থাকে। তারপর সিরাজুদ্দীন হোসেনের নির্দেশে গিয়ে ওঠে তাঁর বাসায়, চামেলীবাগে।

সিরাজ সাহেবের আর্থিক অবস্থাও তখন তেমন ভালো নয়। তবু তিনি মাঝে মাঝে অঞ্জুদের আর্থিক সাহায্য করেন। পরে অঞ্জু আর তা নিতে রাজী হয়নি। সে বরং নিজের আয়ের ব্যবস্থা নিজেই করে। সে ধরে চায়ের ব্যবসা। কখনো সিলেট, কখনো ঢাকার চকবাজার থেকে পাইকারী দামে চা কিনে ফেরি করে দোকানে দোকানে দিয়ে আসে। এতে কিছু কিছু আয়ও হয়।

অঞ্জুকে এই কাজে সিরাজুদ্দীন হোসেন সাহায্য করেছেন নানাভাবে। তিনি টেলিফোনে প্রেস ক্লাব, 'ইত্তেফাক' অফিসসহ বেশ কয়েক জায়গায় তার জন্যে সুপারিশ জানান। এক পর্যায়ে তো অঞ্জুর ব্যবসা পরিচালনার ভার তিনিই নিয়ে নেন। কখনো ফোনে, কখনো মৌখিকভাবে গ্রাহকদের অনুরোধ জানিয়ে। তাঁর

এবং অঞ্জুর চেষ্টায় যে সামান্য আয় হয়, তা তখন চঞ্চল, দীপু আর তাদের মাকে বাঁচার উৎসাহ যোগায়।

কিছু কাল পর, শবেবরাতের দিন কয়েক আগে, একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে।

অঞ্জু তখন গুলিস্তানে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখে, বি.আর.টি.সি.–র একখানা বাসে ড্রাইভারের সীটে বসে রয়েছে নিজাম। তাদের গাড়ীর প্রাক্তন ড্রাইভার।

লোকটি বিহারী। তবু আগেকার সম্পর্কের কারণে অঞ্জু তার দিকে এগিয়ে যায়। বাসে উঠে পড়ে। নিজাম সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে। তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করে। তারপর, তার গাড়ী যাবে নারায়ণগঞ্জ, অঞ্জুকেও সেখানে নিয়ে যায়। পেট ভরে ভালো–মন্দ খাওয়ায়।

এই সময় অঞ্জু তাদের মীরপুরের বাড়ীর অবস্থা জানতে চায়।

নিজাম তখন প্রস্তাব দেয়, তোমার ফুফুমাকে নিয়ে শবেবরাতের দিন মীরপুরে চলো। আমার সঙ্গে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না।

অঞ্জু ফুফুমাকে কথাটা জানায়। তিনি বলেন, নিজামকে একবার আমার কাছে নিয়ে আয়।

পরদিনই নিজাম–অঞ্জুর নিজাম চাচা–ফুফুমার সঙ্গে দেখা করে। তাঁর সাথে কথাবার্তার পর ঠিক হয়, শবেবরাতের দিন, ৫ অক্টোবর, তাঁরা মীরপুর যাবেন।

মীরপুরে তাঁরা নিজামের বাসাতেই ওঠেন। বাসাটা অঞ্জুদের বাসা থেকে মাত্র শ'দেড়েক ফুট দূরে। অঞ্জু এক সময় সেখানে চলে যায়। গিয়ে দেখে, রংপুরের এক বিহারী সাত–আটজন সদস্যের এক পরিবার নিয়ে সেখানে বাস করছে। ২৫ মার্চ বাড়ী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ায় পুড়ে সমস্ত প্লাস্টার উঠে গেছে।

অঞ্জু যখন যায়, বিহারীটি তখন মাঝখানের ঘরের মেঝে খুঁড়ছে। সেখানে তাঁত বসানো হচ্ছে। ব্যাপারটা অঞ্জুর ভালো লাগবার কথা নয়। সে তাই বলে, এই বাড়ীটা যদি তোমাদের হত, তাহলে কি এরকম কাজ করতে পারতে?

লোকটি তার কথা শুনে ক্ষেপে যায়। পারলে তখনই তার ওপর হামলা করে।

অঞ্জু এবার চুপসে যায়। কোনো রকমে বাড়ী থেকে বেরিয়ে নিজামের বাসায় গিয়ে ওঠে। পথে সে দেখতে পায়, বর্তমান শহীদ আবু তালেব ইস্কুলের

বাড়ীটার সামনে তিন–চারশো লোকের ভীড়। তাদের সবাই বিহারী। তারা নাকি অঞ্জুকে দেখতে এসেছে।

সে লোকগুলির সাথে কথা বলতে চায়। কিন্তু নিজাম বাধা দেয়। বলে, তুমি ভেতরে যাও।

অঞ্জু ভেতরে যেতেই নিজামও ঘরে ঢোকে। সে অঞ্জু আর তার ফুফুর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলো, একেবারে মুরগী জবাই করে। খাওয়ার সময়ও হয়েছে। বেলা তখন দুপুর। কিন্তু তার সব আয়োজন ভেস্তে যায়। সে অঞ্জুর ফুফুকে বলে, আপা, খাওয়ার দরকার নেই। এখনই বেরিয়ে পড়ুন। আপনাদের মেরে ফেলবার পরিকল্পনা হচ্ছে। দেরী করলে রক্ষে থাকবে না।

না, অঞ্জুরা আর দেরী করেনি। তখখুনি বেরিয়ে পড়ে, ১০ নং–এর বাসস্ট্যান্ডের দিকে। নিজাম সেখানে তাদের একটা ডবল ডেকারে তুলে দেয়। নিজেও তাদের সঙ্গে থাকে। ফিরে যায় অঞ্জুদের গুলিস্তানে পৌঁছিয়ে দিয়ে।

তারপর নিজামের আর দেখা নেই। অঞ্জু তার খবর নেয়ার জন্যে গুলিস্তান গিয়েছিলো। কিন্তু তার দেখা মেলেনি। একে ওকে জিজ্ঞেস করতে করতে শুধু শুনেছে, সে অসুস্থ।

আসল খবর মেলে দশ–বারো দিন পর। যখন নিজামের সাথে দেখা হয়। অঞ্জুদের মীরপুরে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে সে সেখানকার বিহারীদের বিষনজরে পড়ে। তার রীতিমতো 'বিচার' হয়। তাতে 'বিচারকরা' নিজামকে দন্ড দেয়, এক হাজার টাকা জরিমানা এবং দশ ঘা বেত। সেই সঙ্গে কড়া হুঁশিয়ারি, সে যদি ফের কোনো বাঙালীকে মীরপুরে নিয়ে যায়, তাহলে সে পাবে চরম সাজা–মৃত্যুদণ্ড।

নিজাম আরো জানায়, দশ ঘা বেত খাওয়ার ফলে সে দশ দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। এবং বলে, অঞ্জু তার সাথে আর দেখা না করলেই ভালো হয়, দরকার বুঝলে সে নিজেই দেখা করবে।

অঞ্জু আবার মীরপুরের বাড়ীতে গিয়েছিলো ১৯৭২–এর এপ্রিলে।

তখন বাড়ীখানার দিকে তাকানো যায় না। বিহারীরা তাঁত বসানোর জন্যে ঘরগুলোর মেঝেয় বিরাট বিরাট গর্ত খুঁড়েছিলো। তারা চলে যাওয়ার পর গর্তগুলোয় মস্তো মস্তো গাছ গজিয়ে গেছে। ২৫ মার্চ আগুন লাগানোর ফলে দেয়ালগুলো কালো হয়ে আছে।

বাড়ীটায় অঞ্জুদের স্থায়ী বসবাস আবার শুরু হয় সেপ্টেম্বরের দিকে। যখন তারা মাকে সেখানে নিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে–এবং তারপরও–অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা গেছে তাদের ওপর দিয়ে। সবই ’একাত্তরের জের, বাবা খন্দকার আবু তালেবের নিখোঁজ হওয়ার ফল। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিলো না। তবু দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাঁদের কখনো সঙ্কটে পড়তে হয়নি। এই পরিবারের বড়ো ছেলে খন্দকার আবুল হাসান ওরফে চঞ্চল স্বাধীনতার পর পড়াশোনা ছেড়ে দৈনিক 'গণকন্ঠ'–এ মাত্র একশো টাকা মাইনের একটি চাকরি নেয়, কেবল এক বেলা এক মুঠো খেয়ে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে থাকার তাগিদে। তার অসুস্থ মা কখনো দিন কাটান বাপের বাড়ীতে গলগ্রহ হয়ে, কখনো শ্বশুরের কাছে। তাঁর অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে–তালেব সাহেবের এক কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবদুল মান্নান সাহেবের উদ্যোগে চিকিৎসার ফলে। পরিবারটিকে একটু সাহায্য করেছিলেন বঙ্গবন্ধুও, সাময়িকভাবে মাথা গোঁজবার একটা জায়গার ব্যবস্থা করে।

কিছু দিন পর মীজানুর রহমান চৌধুরীর চেষ্টায় চঞ্চল 'বাংলাদেশ অবজারভার'–এ একটি চাকরি পায়। তাকে কিছুটা ভারমুক্ত করবার চেষ্টায় অঞ্জু আবার ফেরিওয়ালা হয়। অঞ্জু আশ্রয় নেয় তাদের থেকেও দুর্দশাগ্রস্ত সেজো চাচা খন্দকার আবুল খবিরের বাসায়। দারুণ অর্থকষ্ট আর অন্নকষ্টের মধ্যে সেখান থেকে সে ১৯৭৩ সালে এস.এস.সি. পাশ করে।

ক্রমে সংকট অনেকটা কাটে। বাড়ীটা মেরামত করা হয়। কিন্তু চঞ্চল–অঞ্জু বৈঠকখানার দরজার চৌকাঠ আর জানলার ফ্রেমের পোড়া কাঠ বদলায়নি। ওগুলো তারা রেখে দিয়েছে ২৫ মার্চের সন্ত্রাসী হামলার সাক্ষী হিসেবে। যে–হামলার সময় বাড়ীখানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

সাক্ষী অবশ্যি আরো আছে, ওই জড় সাক্ষী দুটি ছাড়াও। সে–সাক্ষীরা জীবন্ত। যাঁরা ফিরে এসেছিলেন যমের মুখ থেকে, অলৌকিকভাবে।

যমের মুখ থেকে ফেরা

যমের মুখ থেকে ফেরা সেই দুইজনের একজন তালেব সাহেবের নিকটতম প্রতিবেশী (আলহাজ্জ) আবদুল হান্নানের শ্যালক আতিয়ার রহমান। বর্তমানে ঢাকা পৌরসভার মীরপুর শাখার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। আর একজন তাজুল। আগে ছিলেন হান্নান সাহেবের কন্ট্রাক্টরির কাজে শ্রমিক। এখন রিকশা মেকার। ২৫ মার্চ দিনগত রাতে তাঁরা দুজনেই ছিলেন হান্নান সাহেবের বাড়ীতে।

অবশ্যি, আরো কিছু লোকজনের সাথে। দোতলায় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আতিয়ার রহমানের ফুফাতো বোনের ছেলে মোহাম্মদ শাহজাহান। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানার ভট্টাচার্যকান্দি গ্রামের মানুষ। আরো ছিলেন মুকসুদপুর থানারই বামনডাঙা গ্রামের শেখ আসফ আলীর ছেলে শেখ আবদুর রশীদ। একতলায় আশ্রয় নেয় অসহায়, আশ্রয়হীন গোছের কিছু মহিলা।

২৫ মার্চ দিনের বেলাতেই আশপাশের সব বাঙালী বাড়ী খালি হয়ে যায়। লোকজন বলতে ছিলো কেবল হান্নান সাহেবের বাড়ীতে। তাজুল ছাড়া বাকী তিনজনই তাঁর আত্মীয়। মহিলাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁরাই। সেদিনের থমথমে অবস্থা দেখে।

কিন্তু পরিস্থিতি যেমনি হোক, প্রথম দিকে তাঁদের কোনো বিপদ ঘটেনি। সদর ফটক আর সিঁড়ির দরজায় তালা মারা। আতিয়ার রহমানের হাতে একটা বন্দুকও ছিলো। এবং তাঁরা জানতেন না, ওই রাতে পাকিস্তানী হায়েনারা বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাঁরা তাই নিজেদের মোটামুটি হিসেবে নিরাপদই ভেবেছেন।

সেই ভাবনা শেষ রাতের দিকে ভুল হয়ে যায়। যখন তাঁরা দেখেন, এক দল মারমুখো বিহারী বাড়ীটা ঘিরে ফেলেছে। তাদের মুখে নানারকম জঙ্গী হুঙ্কার, হাতে মানুষ মারবার হাতিয়ার।

আতিয়ার রহমানেরা এই দৃশ্য দেখে প্রথম দিকে ভয় পেয়েছিলেন, স্বাভাবিক কারণেই। কিন্তু প্রাণের মায়া বড়ো মায়া। সে-মায়ায় কেঁচোও কামড় দিতে আসে। আর, আতিয়ার রহমানের তো সঙ্গে রয়েছে বন্দুক। তিনি বন্দুক হাতে তুলে নিলেন-এবং একে একে ছয়বার গুলি চালালেন।

সেই গুলিতে বিহারীদের কারো কিছু হল কিনা, তিনি জানেন না। জানার অবশ্যি কথাও নয়। কেননা, তিনি চালিয়েছিলেন ফাঁকা গুলী। তবে, এক সময়

দেখেন, বাড়ীর সামনে থেকে জঙ্গী ভীড়টা সরে গেছে। তাঁরা এবার একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

কিন্তু স্বস্তিটুকু ছিলো ক্ষীণায়ু। সে-রাত্তিরের ঘটনার কথা বলতে গেলে আতিয়ার রহমান এখনো কেমন যেন হয়ে যান। প্রায় আপন মনেই সেকথা শোনাতে শোনাতে এক সময় আমাকে একেবারে সাদামাটা ভাষায় জানান, কিছুক্ষণ পরই দেখি, বিহারীগুলো ফিরে এসেছে। কিন্তু এবার আর শুধু তারাই নয়। তাদের সঙ্গে আছে একখানি মিলিটারী জীপ। হয়তো বিহারীগুলোই ডেকে এনেছে।

বাড়ীর সামনে এসে তারা গাড়ীতে বসা অফিসারটিকে বলে, এটা আওয়ামী লীগের এক নেতার বাড়ী। এখান থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে।

এবার অফিসারের স্পষ্ট হুকুম, সব বংগালীকো খতম করো।

আতিয়ার রহমানেরা তখন কসাইয়ের খোঁয়াড়ে-ভরা ছাগল-ভেড়া। কেবল জবাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

রাত তখন ভোর হয়ে গেছে। সকাল ছ'টা-সাড়ে ছ'টা। আতিয়ার রহমান এক সময় দেখেন, তাঁদের চারজনের মধ্যে বাড়ীতে আছেন তিনি একা। বাকী তিনজন পশ্চিম পাশে তালেব সাহেবের বাসায়। পাশাপাশি বাড়ী দুটি এমন যে, হান্নান সাহেবের বাড়ীর সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গা থেকে লাফ দিতে পারলে ওবাড়ীর গ্যারেজের ছাদে পড়া যায়। আতিয়ার রহমানের সঙ্গীরা নিশ্চয়ই ওই পথ ধরেছেন।

তারপর কখন কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়, তিনি কিছুই টের পান না। শুধু বোঝেন, হানাদারেরা যে কোনো সময় দোতলায় চলে আসতে পারে। হয়তো এতোক্ষণে গেট ভেঙে বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে। পাশের বাড়ীতে তো অবশ্যই। ওখান থেকে দুটি গলার অন্তিম চিৎকার শোনা যায়। শাহজাহান আর শেখ আবদুর রশীদের।

আতিয়ার রহমানের আর সাহস হয় না বাড়ীতে থাকার। তিনি বন্দুক ফেলে দিয়ে ছাদ থেকে বাড়ীর পেছন দিকে লাফ মারেন। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দক্ষিণ দিকে দৌড়। ছুটতে ছুটতে ১০ নং গোল চক্কর ছাড়িয়ে গিয়ে ওঠেন সেনপাড়া-পর্বতায়। আশ্রয় নেন ঝোপের ভেতর। ওদিকটা তখন নির্জন।

ঝোপঝাড়ে তাঁর কাটে পুরো দুটি দিন। একেবারে নির্জলা উপোসে। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি করে বসেন এক দুঃসাহসী কাজ। একদিন তিনি

ই.পি.আর.-এর একখানা গাড়ী দেখতে পান। তার বাঙালী অফিসারকে সব বলে অনুরোধ জানান, আমাকে একবার তালেব সাহেবের বাড়ীতে নিয়ে চলুন। আমি আমার ভাগনের লাশটা এনে দাফনের ব্যবস্থা করতে চাই।

ঃ বেশ তো, চলুন। আমার সাথে গেলে ভয়ের কিছু নেই।

ঃ আপনি সেখানে গিয়ে কি দেখলেন?—কিছু দিন আগে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ঃ কিছু না। তালেব সাহেবের বাড়ী একদম খালি ছিলো। আর, হান্নান সাহেবের বাড়ী থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকার জিনিষ লুট হয়ে যায়।

ঃ তাহলে লাশ পাননি?

ঃ লাশ ওরা তালেব সাহেবের রান্নাঘরে রেখে পুড়িয়ে ফেলেছিলো। শাহজাহান আর আবদুর রশীদ—দুজনেরই।

ঃ আচ্ছা, আপনি কি জানেন, ২৯ মার্চ তালেব সাহেব মীরপুর গিয়ে মারা পড়েছিলেন?

ঃ আমি তো তখন মীরপুরে ছিলাম না। আমার তাই জানার কথা নয়। তবে, শুনেছি, তিনি গিয়েছিলেন।

এসব খবর আতিয়ার রহমান ঘটনার দুই-একদিনের মধ্যে পাননি। সেনপাড়া-পর্বতার ঝোপ-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তিনি কল্যাণপুর হয়ে প্রথমে আসেন ঢাকায়। তারপর পায়ে হেঁটে চলে যান গোপালগঞ্জে গ্রামের বাড়ীতে। স্বাধীনতার পর যখন ঢাকায় ফেরেন, তখন আবার তাজুলের সাথে দেখা হয়, নাটকীয়ভাবে। আতিয়ার রহমান সেই সময়ই শোনেন শাহজাহান আর আবদুর রশীদের করুণ কাহিনী।

এবং তাজুলের অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার কাহিনীও।

২৬ মার্চ ভোরে হান্নান সাহেবের বাড়ী থেকে পালিয়ে তাজুল গিয়ে ওঠেন তালেব সাহেবের রান্নাঘরে। সেই রান্নাঘরে ছিলো পানির একটি ট্যাঙ্ক, ঢাকনাওয়ালা। জান বাঁচানোর তাগিদে তাজুলের মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। এমনিতে রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকলে বিহারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। তিনি তাই ঢাকনা তুলে ট্যাঙ্কের ভেতর ঢুকে পড়েন। এবং আবার ঢাকনা লাগিয়ে সেইখানেই বসে থাকেন। যতোক্ষণ বিহারীদের নারকীয় কীর্তিকলাপ চলে।

তারপর, তারা একটু সরতেই, তিনি বেরিয়ে আসেন ট্যাঙ্ক থেকে। বাড়ী তখনও জ্বলছে। কিন্তু তারই ভেতর কোনো ক্রমে একটু পথ করে নিয়ে তিনি

ছুট দেন দক্ষিণ দিকে, যেমন দিয়েছিলেন আতিয়ার রহমান। এবং আতিয়ার রহমানের মতোই তিনিও হাঁটা পথে প্রথমে আসেন ঢাকায়, তারপর যান গ্রামের বাড়ীতে।

বিহারীদের বিজয় অভিযান

কিন্তু আতিয়ার রহমান আর তাজুল সেনপাড়া-পর্বতায় কেন আশ্রয় পাননি? ওটা তো ছিলো বাঙালীদের গ্রাম।

তা বটে। কিন্তু গ্রামে যদি বাঙালীই না থাকে, তাহলে আশ্রয় দেবে কে?

স্বাধীনতার আগে সেনপাড়া-পর্বতা ছিলো একেবারেই গণ্ডগ্রাম। এখানে সেখানে খানা-ডোবা, কোথাও কোথাও বাঁশঝাড়, ঝোপ-জঙ্গল। এই সবের মধ্যে ছড়ানো দুই-চারখানা কাঁচা, গরীব বাড়ী। মালিকদের সবাই তাদের ভাষায় 'গেরস্ত'। অর্থাৎ স্থানীয় লোক। জমিজমা রুঠা। আয়-উপার্জন তার থেকে বিশেষ কিছু হয় না। অন্য দিকে চলছে নগরায়ণ, ঢাকার আশপাশের গ্রামগুলিতে জমি বেচাকেনার হিড়িক। সেনপাড়া-পর্বতার আদি বাসিন্দাদের প্রায় সব জমিই বিক্রি হয়ে গেছে। অথচ নতুন মালিকেরা তখনও ঘরবাড়ী করেননি। সেনপাড়া-পর্বতা তাই প্রায় ফাঁকা। বাসিন্দাদের বলতে গেলে হাতে গুনে শেষ করা যায়। ২৫ মার্চের পর সেই মানুষগুলোও উধাও। বিহারীদের বিজয় অভিযানের খবর পেয়ে। তাহলে আর আতিয়ার রহমানদের আশ্রয় দেবে কে?

কিন্তু বিহারীদের বিজয় অভিযান! সেটি কি?

২৫ মার্চ দিনগত রাতে-এবং ২৬ মার্চ-মীরপুর উপশহরের বাঙালী নিধনের পর বিহারীরা বেরিয়ে পড়েছিলো আশপাশের গ্রামগুলোর দিকে। সেসব জায়গার বাঙালী নিধনের জন্যে অবশ্যই। কিন্তু তাদের আরো একটি লক্ষ্য ছিলো। বাংলাদেশের বিহারীদের অনেক দিনের লালিত একটি গোপন সাধ পূরণ।

তারা দেশটিকে জয় করে নেবে।

আমি তাদের এই গোপন সাধটির কথা জেনে ফেলেছিলাম 'পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে, আকস্মিকভাবে।

সে আমার এক তেতো অভিজ্ঞতা।

১৯৫৩ সাল। পূজোর ছুটিতে চলেছি উত্তর বাংলার হিলির দিকে। ট্রেনে দারুণ ভীড়। আর, আমার কামরায় সেই ভীড়ের প্রায় সবাই উত্তর বাংলার বিহারী। তাদের ভেতর আমার বসবার জায়গা পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু আমার মুখে ছিলো তাদেরই ভাষা। 'সাতচল্লিশের পর এদেশে অনেকেই উর্দূ শিখেছেন রাজনৈতিক কারণে। বৃটিশ আমলে যাঁরা শিখেছিলেন, তাঁদের প্রয়োজনটি ছিলো ধর্মীয় বা শিক্ষাগত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আমি ব্যতিক্রমী দলের ছাত্র। কিন্তু শিক্ষাঙ্গণের বাইরে, শিক্ষক নিজেই নিজের। অর্থাৎ আমি উর্দূ শিখেছিলাম ভাষা শেখার বাতিকে। তাই, উর্দূ ভাষার উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, শব্দপ্রয়োগ সযতনে আয়ত্ত করেছি। আমার মুখের ইচ্ছাকৃতভাবে বলা উর্দূ শুনে সহযাত্রীরা অচিরকাল পরই ধরে নেয়, আমি তাদেরই জগতের। তার ফল, আমার বসবার জায়গা লাভ। এবং তারপর তাদের অন্তরঙ্গ বাক্যাবলী শ্রবণ। সেই বাক্যাবলীর একাংশ ঃ আমরা ওপার (অর্থাৎ যমুনা নদীর পশ্চিম দিকের এলাকা) তো জিতে নিয়েছিই, এপারটাও নেব। এটা বিহারীদের কুমতলব।

সেনপাড়া-পর্বতায় অভিযান চালিয়ে তাদের কতোটা জিত হয়েছিলো, জানিনে। কিন্তু কিছু রক্তপাত, অগ্নি সংযোগ আর লুটতরাজ অবশ্যই ঘটে। আতিয়ার রহমানের সেসব জানার কথা নয়। তার সুযোগ বা সাহসও তাঁর ছিলো না। ঝোপ-ঝাড়ে আশ্রয় নিয়ে নিজের জান বাঁচানোই তখন তাঁর কাছে বড়ো কথা। অফিসের কাজের ব্যস্ততার ভেতর তিনি আমাকে গুছিয়ে কিছু বলতেও পারেননি।

এলাকাটির দুর্দশার খবর আমি জানতে পাই অনেক পরে। তবে, একটুখানি আভাস মেলে-সম্ভবতঃ 'একাত্তরের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে। জামালউদ্দীন আর আরশাদ নামে সেখানকার দুজন বাসিন্দার মুখে।

তখন বেশ রাত। বোধ হয় দশটার কাছাকাছি। হঠাৎ আমার গ্রীণ রোডের বাসায় এসে হাজির ওই মানুষ দুটি। কথাবার্তায় জানা গেল, তারা রীতিমতো দুর্গত। ২৫ মার্চের পর তাদের গ্রাম ছেড়ে পালাতে হয়। তারপর নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পরিবার-পরিজন নিয়ে এখানে সেখানে ঘোরা। আমার বাসায় যখন

আসে, তখনকার আশ্রয় রায়ের বাজার। জামালউদ্দিন কথায় কথায় জানালো, সেদিন তার পরিবারের কারো এক দানা খাবারও জোটেনি।

কথাটা শুনে খারাপ লাগলো। দুটি মানুষই আগে থেকে পরিচিত। ১৯৬৪ সালে আমি কয়েকজন বন্ধুর সাথে মিলে তাদের কাছ থেকে জমি কিনি। একজন ছাড়া বাকী সবাই পাঁচ কাঠা করে। আমার দলে ছিলেন কবি আহসান হাবীব, কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, সাহিত্যিক–সাংবাদিক সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান, ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি এবং 'ইত্তেফাক'–এর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার এম. এ. ওয়াদুদ, প্রবন্ধকার এবং প্রাদেশিক তথ্য বিভাগের ইনফরমেশন অফিসার রহীমউদ্দীন সিদ্দিকী আর সাহিত্যিক–শিক্ষাবিদ (স্বাধীনতার পরে সোহ্‌রাওয়ার্দী কলেজের ভাইস–প্রিন্সিপ্যাল) মীর আবুল হোসেন। আমি তাঁদের দলে টানি–সমমনা কিছু মানুষ এক সাথে বাস করবো বলে। জমি কেনার সুবাদে জামালউদ্দীনের সাথে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। সে তখন একাধিকবার আমার বাসায় আসে। মানুষটিকে তখন ভালোও লেগেছিলো। তার দুর্দশার কথা শুনে তাই স্বাভাবিকভাবেই তাকে কিছু সাহায্য করবার কথা মনে আসে। কিন্তু আমার পকেটের অবস্থা তখন ভালো নয়। তাকে তাই সামান্য কটি টাকা দিয়ে বিদায় করতে হয়েছিলো।

তাকে নিয়ে পরে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়, তার উল্লেখ এখানে অবান্তর। তবু না বলে পারছিনে। সে আমাকে বিপদকালের সাহায্যের উপযুক্ত প্রতিদানই দিয়েছিলো। স্বাধীনতার পর সে আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের প্লটগুলি থেকে বেআইনীভাবে চার শতাংশ জমি বার করে অন্যের কাছে বিক্রি করে ফেলে। তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হই আমি। 'বিরাশী সালে বাড়ী করতে গিয়ে দেখি, আমার জমি প্রায় তিনশো বর্গফুট কম। জামালউদ্দীনকে একথা জানালে সে উত্তর দেয়, আপনারা জমি ভাগাভাগি করে নেয়ার সময় কম বেশী হয়ে গেছে। তবে, আমাকে দশ হাজার টাকা দিলে আপনার জমি উদ্ধার করে দিতে পারি।

আমরা কিন্তু কেনার সময় প্রত্যেকেই ঠিক মাপ মতো জমি পেয়েছিলাম। তাছাড়া, তার কাছ থেকে জমি নিয়ে ভাগাভাগি করিনি। এ–জিনিষ ধান–চালও নয় যে, থোকে কেনার পর ভাগাভাগির সময় ভাগে কম–বেশী হবে।

জামালউদ্দীনের নামে মামলা করা যেতো। কিন্তু কতো দিনে তার ফয়সালা হবে, কেউ জানে না। যতো দিন মামলা না মেটে, আমার বাড়ী তৈরি বন্ধ রাখা ছাড়া উপায় নেই। আমার পক্ষে মারামরি লাঠালাঠি করে জমি উদ্ধার করাও

সম্ভব নয়। আমাকে তাই শেষ পর্যন্ত চুপ মেরে থাকতে হয়।

আমার এতো কথা বলবার উদ্দেশ্য পাঠকদের শুধু একটি অনুরোধ জানানো। তাঁরা যখন জমি কিনবেন, দলিলে যেন চার সীমানার মাপ লিখে নেন। এ-সংসারে বিহারী ড্রাইভার নিজাম যেমন আছে, তেমনি বাঙালী জমিন বিক্রেতা জামালউদ্দীনও আছে।

কিন্তু-ধান ভানতে শিবের গীত আর নয়। বলছিলাম ২৫ মার্চের পরেকার সেনপাড়া-পর্বতার কথা। সেই কথায় ফিরে যাই।

তখনকার সেনপাড়া-পর্বতার একটা মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন ফিলিপসের চাকুরে ওয়ালিউর রহমান খন্দকার। তিনি এবং তাঁর বড়ো ভাই তখন বাস করতেন পাশাপাশি দুটি অস্থায়ী গোছের বাড়ীতে। কাছেই ছিলো অমনি আরো দুটি বাড়ী। একটি তাঁদের এক 'তুতো ভাইয়ের, অন্যটি সম্পর্কে তাঁদের মামা সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমানের। আশপাশে, কাছে দূরে ছড়ানো ছিটানো কিছু স্থানীয় অধিবাসীর বাড়ী। বিহারীদের বিজয় অভিযানের সময় তাঁদের সবাইকেই ঘরবাড়ী ছেড়ে পালাতে হয়েছিলো। এবং ফিরে এসে কেউই কোনো বাড়ী আগের হালে দেখতে পাননি।

২৫ মার্চ অফিস সেরে ওয়ালিউর রহমান গিয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী, ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। রাত্তিরে শুরু হয় হানাদার বাহিনীর অভিযান। সেই সঙ্গে লাগাতার কারফিউ। ওয়ালিউর রহমানের মনের অবস্থা যে তখন কেমন দাঁড়ায়, সহজেই অনুমেয়। একটি রাত, একটি দিন, তারপর আর একটি রাত-তিনি কাটালেন ছটফট করে। ঘোর অনিশ্চয়তার ভেতর, পরিবার-পরিজনের জন্যে দুঃসহ দুশ্চিন্তা নিয়ে।

২৭ মার্চ বেতারে হঠাৎ শোনা যায় একটি ঘোষণা। সকাল ছ'টা থেকে দুপুর বারোটা অবধি কারফিউ থাকবে না। ওয়ালিউর রহমান আর অপেক্ষা করেননি, সেই মুহূর্তেই ছুট দিয়েছেন সেনপাড়া-পর্বতার দিকে। গাড়ী-ঘোড়া তো নেই। বাহন তাই কেবল নিজের দুখানি পা।

কিন্তু-সেই বাহনে বাড়ী এসে তিনি কি দেখেন? যাদের জন্যে ছুটে আসা, তারা কোথায়? শুধু বাড়ী কেন, গোটা তল্লাটই যেন খাঁ খাঁ করছে। বাড়ীটা আগুনের এঁটো। ঘরের জিনিষপত্র-নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক কষ্টের এটা-ওটা,-কিছুই নেই। পোষা কুকুরটা আঙিনায় মরে পড়ে আছে। রাস্তার ওপাশে, বাম দিকে, রেদওয়ানুর রহমানের বাড়ীটা ভাঙা এবং পোড়ানো।

সব দেখে ওয়ালিউর রহমান আঙিনার ছোট্টো আমগাছটির নীচে এসে

দাঁড়ান। চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি ঝরে। দুর্বৃত্তদের অসীম দয়া, বাড়ীর মুরগীগুলো তারা নিয়ে যায়নি। অবলা জীবগুলো তাঁর পায়ের কাছে এসে ক্ষিধের জ্বালায় চি চিঁ করতে থাকে। তাঁর কিছুই করবার নেই। শুধু অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে তাদের দেখেন।

তারপর আবার ছুট। দিশেহারার মতো। গ্রামের এখানে সেখানে উঁকি দেন। যদি পরিবার-পরিজনের কারো সাক্ষাৎ মেলে।

কিন্তু না, কোথাও কেউ নেই।

তবে, হঠাৎ সাক্ষাৎ মেলে এক যমদূতের। তার হাতে মস্তো একখানি ছোরা। সে হন হন করে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। স্বাভাবিক কারণেই ওয়ালিউর রহমান ধরে নেন, লোকটি বিহারী। এবং তাঁকে এক্ষুণি –

কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু শুভ 'অঘটন'-ও ঘটে। লোকটি তাঁর কাছে এগিয়ে এসে পরিষ্কার স্থানীয় বাংলায় বলে, আপনি বাঙালী?

হতবুদ্ধিপ্রায় ওয়ালিউর রহমান জবাব দেন, হ্যাঁ।

ঃ তাহলে এখানে কেন? শীগগীর পালান। নইলে বিহারীদের হাতে মারা পড়বেন। জানেন, আমি ছাড়া আর কোনো বাঙালী বোধ হয় এখানে নেই। আমিও পালানোর চেষ্টা করছি। যদি কোনো বিহারীর সামনে পড়ি, অন্ততঃ এক কোপ দিয়ে মরবো। সেই জন্যেই ছোরা নিয়ে ঘোরা।

ওয়ালিউর রহমানকে এবার আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে হয়।

ছুটতে ছুটতে তিনি গিয়ে ওঠেন বনানীতে এক আত্মীয়ের বাড়ী।

সে-ভদ্রলোক সেনাবাহিনীর অফিসার। তাঁদের অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছে, কিন্তু অফিসে যেতে হয়। দুজনেই তাই ভাবেন, তাঁর কি এ-বাসায় থাকা নিরাপদ?

সুতরাং তিনি আবার পথে নামেন। এবং অনেক দুর্ভোগের পর টাঙ্গাইলে গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে পৌছন।

এখন তিনি নিরাপদ। হানাদার বাহিনী এদিকে হানা দেয়নি। কিন্তু নিরাপদ হয়েও তিনি দুশ্চিন্তায় ভোগেন। পরিবার-পরিজনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

তা-সেনপাড়া-পর্বতায় তাদের কি হল? সেকথা বলেছেন তাঁর ছোটো ভাই নাজরুল খন্দকার।

২৫ মার্চের কালো রাতে তাঁরা-বড়ো ভাই, বোন, ভাবী এবং ভাইয়ের ছেলেমেয়ে আর নাজরুল বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যান দক্ষিণ দিকে, ইব্রাহীমপুরে।

আগেই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো, মীরপুর উপশহরের বিহারীরা সেনপাড়া-পর্বতা আক্রমণ করবে। আতঙ্কে কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা চললেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ছোটোরা বড়োদের হাত ধরে।

খানিক দূর যাওয়ার পর কিছু লোক তাঁদের একটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান দেয়। সেটি একটি মাটির ঘর। প্রচুর গাছগাছালি আর বাঁশবাগানে ঘেরা। বাড়ীর মালিক খুব গরীব, দিনমজুর।

নাজরুলদের পরিবারের সবচেয়ে ছোটো সদস্য তাঁর বড়ো ভাইয়ের ছেলে সানি। বয়েস মোটে দু'বছর। বাড়ীটাতে উঠেই সে ক্ষিধেয় কান্না জুড়ে দেয়। বাড়ীর মালিকদের তখনও খাওয়া হয়নি। মাটির হাঁড়ি ভর্তি ভাত। সানির মা ছেলের জন্যে কিছু ভাত চাইলেন। কিন্তু বাড়ীর কর্ত্রী ভাত দিতে রাজী নন। তাঁর অজুহাত, তাঁদেরই খাওয়া হয়নি। এ-অবস্থায় সানির জন্যে ভাত দেবেন কেমন করে?

সানির মা আর কিছু বলেননি। ক্ষিধের জ্বালায় ছেলে তখনও কাঁদছে। মনের দুঃখে তিনিও কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর পরিবারের কারোই সে-রাত্তিরে খাওয়া হয় না। সেই অবস্থায়ই এক সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপর-রাত তখন বারোটার কাছাকাছি, হঠাৎ বাড়ীর লোকজনের ঘুম ভেঙে যায়। চারদিক থেকে মানুষের চীৎকার আর কোলাহল শুনে। ঘুম থেকে জেগে নাজরুল দেখেন, ভাই-ভাবী, বোন এবং ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করছে। বাড়ীর চতুর্দিকে আগুন। নাজরুল তখনও ছেলেমানুষ। রাতের বেলায় যে দূরের আগুনও খুব কাছে মনে হয়, সেটা তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি তাই ভাবেন, ঘরের পাশেই আগুন লেগেছে। আর, সেই আগুনে সবাই পুড়ে মরবেন। তাঁর এই আতঙ্ক বাড়িয়ে দেয় আগ্নেয়াস্ত্রের মুহূর্মুহুঃ গর্জন। পরিবারের অন্যদের সাথে নাজরুলও কাঁদতে থাকেন।

রাতটা তাঁদের এই হালেই কাটে।

পরদিন, ২৬ মার্চ, খুব ভোরে তাঁরা নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যান। এবং দেখেন, কি আশ্চর্য, বিপদের আশঙ্কায় তাঁরা যে-বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলেন, সেইখানেই আশ্রয় নিয়েছে এক অপরিচিত পরিবার! অর্থাৎ আগের রাতে কোনো বাঙালীই নিজের বাড়ীকে নিরাপদ ভাবতে পারেনি। পালানোর সময় নাজরুলদের বাড়ীটাকে খালি দেখে নিরাপদ মনে করে সেইখানেই ঢুকে পড়েছে পরিবারটি।

সেদিন পাড়ার তরুণদের মনে যেন আগুন ধরে যায়। তারা হকি স্টিক, রামদা, দা, কুড়ুল ইত্যাদি নিয়ে একজোট হয়। এক দিকে ইয়াহিয়ার

বিশ্বাসঘাতকতা। অন্য দিকে, গুজব ছড়িয়ে পড়ে, বিহারীরা পাড়া আক্রমণ করতে পারে। তাই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এরকম সতর্কতা।

দুপুরের আগে বিহারীদের সাথে বাঙালীদের একটা রক্তারক্তির ঘটনা ঘটে যায়। কিন্তু কিশোর নাজরুল তার কোনো বিবরণ সংগ্রহ করতে পারেননি।

এরপর—আবার পথ। সেই পথ অজানা। কিন্তু লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। তাঁরা যাবেন টাঙ্গাইলে গ্রামের বাড়ীতে। সঙ্গী কয়েকজন প্রতিবেশী। তাঁদের ভেতর রইলেন সাহিত্যিক—সাংবাদিক সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমানও, তাঁর পরিবার নিয়ে। নাজরুলদের মনে মেজো ভাই ওয়ালিউর রহমানের জন্যে এক রাশ উদ্বেগ। তাঁর কোনো খবর তাঁরা তখনও পাননি। এদিকে, ভয়ও কিছু কম ছিলো না। বিহারীদের চোখ এড়িয়ে মীরপুর থেকে বার হওয়া তখন এক দুরূহ ব্যাপার। রাস্তাঘাটে কতো অসহায় নিরস্ত্র বাঙালী যে তাদের হাতে প্রাণ দিয়েছে, তার কোনো হিসেব নেই।

নাজরুলদের অবশ্যি ভাগ্যি ভালো, পথে তাঁদের কোনো বিপদ হয়নি। তবে, কষ্ট গেছে অনেক। সেই সঙ্গে মানুষের মহত্ত্বের কিছু পরিচয়ও তাঁরা পেয়েছিলেন।

তাঁরা যখন ঢাকা ছেড়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে অজানা পথে এগুচ্ছেন, তখন দেখেছেন, গ্রাম্য বউ—ঝিরা ঘোমটা টেনে আঁচলের আড়ালে গুড়—মুড়ি, চিড়ে—দই নিয়ে শরণার্থীদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। পরম আদরে দেওয়া সেই সব জিনিষ খেয়ে নাজরুলেরা যে তৃপ্তি পেয়েছিলেন, তার কথা আজও ভোলেননি।

একবার তাঁরা গরুর গাড়ীতে মাটির সানকিতে গাড়োয়ানের দেওয়া ভাত খেয়েছিলেন খুব মজা করে। সেই ভাত গাড়োয়ান তাঁদের খাওয়ান নিজে না খেয়ে থেকে। এই কথাই কি ভুলে যাওয়ার মতো?

এমনি সব আনন্দ—বেদনার ভেতর দিয়েই তাঁরা দেশের বাড়ীতে গিয়ে পৌছন।

কিছু দিন পরই অবশ্যি বড়োদের ঢাকায় ফিরতে হয়, জীবিকার টানে। তবে, তাঁরা নিজেদের বাড়ীতে ওঠেননি। থেকেছেন নিরাপদ কোনো জায়গায়। যেখানে অন্ততঃ বিহারীদের হামলার কোনো ভয় ছিলো না। সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান কিছু দিন কাটান কলাবাগানে, গ্রীণ রোড স্টাফ কোয়ার্টার্সের পেছনে একটি ভাড়া বাড়ীতে। তারপর অন্যত্র।

ওয়ালিউর রহমান, সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান—এবং সেনপাড়া—পর্বতার

অন্যরাও—তাঁদের বাড়ীতে ফেরেন স্বাধীনতার কিছু পরে। ওদিকে বিহারীদের দাপট থেমে গেলো। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদাররা আত্মসমর্পণ করলেও মীরপুরের বিহারীরা বেশ কিছু দিন মাথা নোয়ায়নি। ওয়ালিউর রহমানদের তাই আত্মপুনর্বাসনে সময় লেগেছিলো।

জনপ্রিয়তা বর্ম নয়

কিন্তু কোনো কোনো হতভাগ্যের আদৌ কোনো সময় লাগেনি, তাঁদের আত্মপুনর্বাসনের প্রয়োজনও হয়নি। তাঁরা চিরতরে হারিয়ে গেছেন। সর্বকালে সর্বদেশে মৃতের প্রাপ্য যে সৎকার, 'একাত্তরের আরো বহু হতভাগ্যের মতো তাও তাঁরা পাননি। মৃত্যুকালে আপনজনের উপস্থিতি পাওয়া তো দূরের কথা।

যেমন ডাঃ বি. আহমদ। এবং তাঁর কারণে বেগম বি. আহমদও।

বর্তমান নিলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার সুন্দরখাতা গ্রামের সন্তান ডাঃ বি. আহমদ। পড়াশোনার শেষে চাকরি নিয়েছিলেন প্রাদেশিক সরকারের পশুপালন বিভাগে। 'একাত্তরে ছিলেন পশুপালন দফতরের পরিচালক। লোকে তাঁকে জানতো ভেটারিনারী স্পেশালিস্ট হিসেবে, তাঁর পেশাগত কাজের কারণে। তবে, তিনি তাঁর কাজের এলাকা পশুজগতের বাইরেও প্রসারিত করে নিয়েছিলেন। মানুষ-রোগীও দেখতেন অবসর সময়ে। ঠিক সাধারণ এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের মতো। সে-ব্যাপারে তাঁর জাতবিচার ছিলো না, বাঙালী-বিহারী সব রোগীকেই সমান চোখে দেখেছেন।

তাঁর কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় আরো এক দিকে। সেটি সমাজসেবার। চাকরিজীবনের এক পর্যায়ে সেনপাড়া-পর্বতায় একটা ছোটো বাড়ী করেছিলেন। এলাকার মূল সড়কের পাশেই। থাকতেনও সেইখানে। স্বাভাবিক কারণেই এলাকাটির ওপর একটা মায়া পড়ে গিয়েছিলো। যেমন এলাকাবাসী অন্যদেরও

পড়ে। তবে, তাঁর মায়া একটু অন্য ধরনের। সেনপাড়া–পর্বতা সড়ক তখন গলির মতো। ভারী গাড়ী চলাচলের ফলে বুকটা প্রায়ই ভেঙে খানা–খন্দে ভরে যেতো। ডাঃ বি. আহমদের তা কখনোই ভালো লাগেনি। এলাকাবাসীর হয়ে ছোটাছুটি করে তিনি রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা করেছেন।

তাছাড়া, মানুষ ছিলেন মিশুক। যদিও এলাকায় 'বহিরাগত', সবার সঙ্গেই মিশেছেন এমনভাবে, যেন এইটিই তাঁর পৈতৃক বাসভূমি।

এসবের ফল জনপ্রিয়তা।

ডাঃ বি. আহমদ জানতেন না, এমন জনপ্রিয়তা রক্ষাকবচ হয় না। অন্ততঃ সর্বদা। তিনি ভুল হিসেবে এক আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর কোনো শত্রু নেই। তাই, ২৫ মার্চের পর পাড়ার বাঙালীরা যখন তাঁর কাছে এসে বলে, ডাক্তার সাহেব, চলুন, কোনো নিরাপদ জায়গায় চলে যাই, তিনি বাড়ী ছেড়ে নড়তে রাজী হননি। জবাব দেন, আমি তো বিপদে আপদে বিহারীদেরও চিকিৎসা করেছি। তারা কেন আমাকে মারবে?

তাঁর কাছে একটি বন্দুক ছিলো। সেটাও বোধ হয় তাঁর আত্মবিশ্বাসের একটি কারণ।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তাঁর নাতিদের কাছে শুনেছি, ২৭ মার্চ অবধি তিনি এবং বেগম বি. আহমদ 'নিরাপদে'–ই থেকেছেন। বাড়ীর গেট বন্ধ রেখে। কিন্তু পরদিন বিহারীদের বিজয় অভিযানের মুখে সেই গেট অবারিত হয়ে যায়। তারা তখন সেনপাড়া–পর্বতার প্রতিটি বাড়ীতে ঢুকে বাঙালীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজতে খুঁজতে – এক সময় তারা ডাঃ বি. আহমদের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে।

সেনপাড়া–পর্বতার তখনকার নির্জনতায় তারপর কি ঘটেছিলো, কেউ জানে না। শুধু অনুমান করা চলে, তিনি বিহারীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। হয়তো বন্দুকও হাতে নিয়েছিলেন। উত্তরে তারা তাঁদের দুজনকেই নির্মমভাবে হত্যা করে রেখে যায়। বাড়ীর কি হয়, তা তো না বললেও চলে।

ডাঃ বি. আহমদের কথা প্রসঙ্গে আরো একটি মর্মান্তিক ঘটনার কথা এসে পড়ে। তাঁর জামাই ছিলেন শিক্ষক। থাকতেন নারায়ণগঞ্জে। মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাকিস্তানীরা তাঁকে সেইখানে হত্যা করে।

তাঁর কন্যা বিধবা হওয়ার পর পুরোণো ঢাকায় ছিলেন, দায়রা শরীফের দিকে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ অবধি। তারপর এক সময় চলে আসেন সেনপাড়া–পর্বতায়, বাবার বাড়ীটিতে। এখনো ছেলেদের নিয়ে সেইখানেই

থাকেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংস্কার ছাড়া ছোট্টো একতলা বাড়ীটার কোনো উন্নতি সাধন তিনি করতে পারেননি।

ডাঃ বি. আহমদের মতোই ভুল হিসেবের আত্মবিশ্বাসের শিকার হয়েছিলেন আরো একজন। চট্টগ্রামের অনিল চক্রবর্তী। 'একাত্তরের মাঝামাঝি সময়ে।

ততো দিনে হানাদার বাহিনী আর তাদের দোসরদের নারকীয় লীলাক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের সর্বত্র। বিশেষ করে, মুক্তিবাহিনী সংগঠিত হওয়ায় এবং তাদের পালটা হামলা বৃদ্ধি পাওয়ায়। বাঙালী নিধনের প্রাথমিক সাফল্যে হানাদাররা তখন অতি মাত্রায় উৎসাহিত এবং তাদের দোসররা অনুপ্রাণিত। একবার খবর পেলাম, হার্ডিঞ্জ ব্রীজের ওপর দিয়ে ট্রেণ যাওয়ার সময় বিহারীরা তাদের বাঙালী সহযাত্রীদের হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়। হার্ডিঞ্জ ব্রীজের অনতিদূরেই ঈশ্বরদী শহর। বিহারীদের এক বিরাট ঘাঁটি। সেখান থেকে আসে এক গা-শিউরানো খবর। বিহারীরা এক বাঙালীকে ধরে লম্বা বাঁশের ওপর শুইয়ে বেঁধে ফেলে। তারপর তাকে পায়ের দিক থেকে ক্রমে ক্রমে ঢুকিয়ে দেয় রেল ইঞ্জিনের বয়লারের ভেতর। তখন –

না, হতভাগ্য বাঙালীটির তখনকার যন্ত্রণাকর দশার কথা কল্পনা করবার সাধ্যও আমার নেই।

অনিল চক্রবর্তীর ঘটনাটি, যতো দূর মনে পড়ে, এমনি কোনো সময়ের। আমি অবশ্যি শুনেছিলাম স্বাধীনতার পরে। সম্ভবতঃ মে মাসের দিকে ঢাকা থেকে একবার তাঁর খবর নিই। আমার এক প্রতিবেশীর কোনো চট্টগ্রামী পরিচিতজনের মাধ্যমে, ফোনে। তখন শুনেছিলাম, অনিল চক্রবর্তী ভালোই আছেন। তাঁর ট্র্যাজেডীটি ঘটে বোধ হয় এর অল্প কাল পরই।

তিনি রেলওয়ের কেন্দ্রীয় এ্যাকাউন্টস অফিসে চাকরি করতেন। চট্টগ্রামে এসেছিলেন কলকাতার রেলওয়ে এ্যাকাউন্টস অফিস থেকে, ভারতবিভাগের সময় পাকিস্তানের পক্ষে চূড়ান্ত 'অপশন' দিয়ে। দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। তবু পাকিস্তানে আসেন জন্মভূমির টানে। যখন বাংলাদেশ অঞ্চলের হিন্দুরা দেশ ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়। তিনি ময়মনসিংহ এলাকার সন্তান। শ্বশুরবাড়ী কেন্দুয়ার ওদিকে। ভারতবিভাগের সময় বয়েসে তরুণ, অনিল চক্রবর্তী ভেবেছিলেন, বাকী জীবন এই দেশেই কাটাবেন। তাঁর অবশ্যি মোহভঙ্গ ঘটে অল্প কাল পরই। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে। কিন্তু তখন আর সময় নেই। তবু দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাননি, পরিবেশের

সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে এইখানেই থেকে গেছেন। এদেশের অনেক হিন্দুই যেমন মাঝে মাঝে 'মনের দেশ' পশ্চিম বাংলা ঘুরে আসেন, তাও তিনি করেননি। যদিও তাঁর ভাইবোনেরা ওই দেশেই ছিলো। তিনি শুধু স্থির করেন, অবসর নেয়ার পর ওদিকে চলে যাবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁকে চিরকালের মতো এই দেশেই থাকতে হয়।

তাঁর সাথে আমার পরিচয় 'আটচল্লিশে। যখন আমিও চূড়ান্ত 'অপশন' দিয়ে চট্টগ্রামে আসি। দুজনেরই পোস্টিং একই দফতরে, একই শাখায়। পরিচয়ের একটি কারণ তাই সহকর্মিতা অবশ্যই। কিন্তু সেটি সাধারণ। কারণ আরো একটি ছিলো। যেটি গুরুতর। চট্টগ্রামে এসে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করি, আমি যেন ডাঙায় তোলা মাছ। আমার আশপাশে এমন কেউ নেই, যাঁর সাথে কথা বলে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষিধে একটুও মেটাতে পারি। তিনি যে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমার এই নিঃসঙ্গতাবোধ দূর করেছিলেন—এবং একাই,—তা নয়। কিন্তু বরফ গলানোর সূচনায় তিনিই হন প্রধান সহায়ক।

আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়—'উনপঞ্চাশের সেপ্টেম্বরে আমি চট্টগ্রাম থেকে চলে আসবার পর। দুজনের সম্বোধন ক্রমে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে আসে। তাঁর ছেলেমেয়েরাও আমাকে 'তুমি' বলে, যেমন বলে আপন কাকাকে। বড়ো মেয়ে সীমা হয় আমার মা জননী। এ-পর্যায়ে অনিল চক্রবর্তী আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন। আমি বছরে অন্ততঃ দুই-একবার চট্টগ্রামে বেড়াতে গেছি, উঠেছি তাঁরই কাঁচা বাসায়। তাঁরাও আসতেন ঢাকায়, আমার কাছে। নীলা বৌদি পূজারী ব্রাহ্মণের মেয়ে। তবু আমাকে গ্রহণ করেছেন আপন দেবরের মতো করে। আমি মাঝে মাঝে আমার কাছে দুর্লভ কিছু খাবারের জন্যে আবদার জানাই। তিনি সেই আবদার সয়েছেন কষ্ট করে হলেও।

এই পর্যায়েই আমি অনিল চক্রবর্তীর প্রকৃত পরিচয় পাই। হিন্দুত্বে আস্থা রেখেও তিনি মনের দিক থেকে উদার। একটু ঠোঁটকাটা যদিও, সবার সাথে মেশেন অবাধে। বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রের পড়াশোনা ব্যাপক, জ্ঞান গভীর। সংস্কৃতিকর্মীদের সাথে সম্পর্ক অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের। রেলওয়েতে কর্মরত স্থানীয় সঙ্গীতশিল্পীরা তো তাঁর এক ডাকে জড়ো হন যেখানে সেখানে। ওয়াজিউল্লাহ্ ইনস্টিটিউটে নাটক মঞ্চায়নে আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দারুণ উৎসাহ, যদিও সক্রিয় অংশ নেন না কোনোটিতেই। ক্রিকেটের নামে পাগল। এক কালে ফুটবল খেলতেন। পরে চট্টগ্রামে রেলওয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল ম্যাচে রেফারিগিরি করেছেন। বাসায় সঙ্গীত এবং আবৃত্তির চর্চা ছিলো ভালো

রকমের। সব মিলিয়ে রেলকর্মী মহলে—এবং অন্যত্রও—তিনি দারুণ জনপ্রিয়।

সেই অনিল চক্রবর্তী 'একাত্তরের ২৫ মার্চের পর এক সঙ্কটে পড়লেন, আরো অনেকের মতো। বিশেষ করে, হিন্দু বলে। কালো রাতটির প্রায় পর পরই আগে থেকেই জাতীয়-চেতনায়-টগবগে চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হয়। শহরে স্বাধীনতাকামী মানুষের বিরাট সমাবেশ ঘটে। এবং অচিরেই চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এরই মধ্যে ইয়াহিয়া সরকারের হুকুম আসে, সরকারী চাকুরেরা মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের কথা ভুলে অফিস-কাচারিতে যোগ দাও। এ-অবস্থায় চাকুরেরা দ্বিধায় পড়েন, অফিসে যাওয়া কি ঠিক হবে? অনিল চক্রবর্তী সেই দ্বিধান্বিতদের একজন।

তখন অনেকেই দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করেছেন। যাঁদের গ্রামের বাড়ী চট্টগ্রামের কাছাকাছি, তাঁরা বাড়ী চলে যান। কিন্তু অনিল চক্রবর্তী কি করবেন? তাঁর তো বলতে গেলে যাওয়ার জায়গা নেই। যে কারণেই হোক, অনেকেই অফিসে যোগ দেন, কিন্তু তিনি পারেন না। বসে থাকেন ঘরেই।

তারপর পাকিস্তানীদের আবার হুকুম হয়, বছরের মাঝামাঝি একদিন,—যারা এখনো অফিসে যোগ দেয়নি, একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে—২৫মে—তাদের অবশ্য-অবশ্য যোগ দিতে হবে। অন্যথায় চাকরি খতম।

এবার অনিল চক্রবর্তী মন স্থির করে ফেলেন। তিনি অফিসে যাবেন। বাসায় তো বটেই, বাইরেও শুভার্থীরা বারণ করেন। কিন্তু তিনি বলেন, যেতে দোষ কি? আমাকে তো সবাই চেনে। আমার কিছু হবে না।

তিনি অফিসে যান। এবং তাঁর ভুলটা বুঝতে পারেন অচিরেই। কিন্তু তখন আর তা শোধরাবার উপায় নেই। অফিসের সামনেই ছিলো এক পান-বিড়ির দোকান। তার মালিক এক বিহারী। তাঁকে ভালো করেই চেনে। সে অফিস এলাকায় মোতায়েন সৈন্যদের ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়, তিনি হিন্দু। ফল, তাঁকে লক্ষ্য করে মোক্ষম গুলি। অনিল চক্রবর্তী রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়েন।

বাসায় খবরটা যথাসময়েই এসেছিলো। এবং ঠিকভাবেই। কিন্তু ছেলেমেয়েরা সেটা একটু সম্পাদনা করে মাকে জানায়। তাঁর হাতে শাঁখা নেই, সিঁথি সাদা, পরনে থান, মাছ-মাংস খাওয়া বারণ, - এসব তারা ভাবতেও পারে না। প্রচণ্ড শোকের মধ্যেও তাই আসল কথা চেপে গিয়ে মাকে জানায়, বাবা নিখোঁজ হয়েছেন।

এই সম্পাদিত খবরও নীলা চক্রবর্তীর জন্যে শেল স্বরূপ। তবু তিনি

নিজেকে সান্ত্বনা দেন, চক্রবর্তী বাবু মারা তো যাননি। তাহলে একদিন না একদিন ফিরে আসবেন।

এরপর নীলা চক্রবর্তী আর চারটি ছেলেমেয়ের ফেরারী আসামীর মতো দুঃসহ জীবন যাপন। তার বর্ণনা দিতে গেলে পৃথক্ একখানা পুঁথি হয়ে যাবে।

আমি এসব খবর পাই স্বাধীনতার পর।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরবার পর নীলা বৌদি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, পাকিস্তানে হয়তো আরো বাঙালী আটক আছে। তাদের মধ্যে চক্রবর্তী বাবুও থাকতে পারেন। আপনি একটু খবর নেবেন?

জ্ঞানপাপী আমি জানিয়েছিলাম, নেব।

বছর পাঁচেক হল নীলা বৌদি গত হয়েছেন। আমার সেই মিথ্যে আশ্বাসে আর ছেলেমেয়েদের সম্পাদিত খবরে বিশ্বাসসহ সিঁথি-ভরা সিঁদুর নিয়ে।

সিঁদুর যাদের মুছে গেল

কিন্তু নীলা বৌদির ব্যাপারটি তো অস্বাভাবিক। একেবারেই খাপছাড়া। আর, সেটা সম্ভব হয়েছিলো মায়ের জন্যে ছেলেমেয়েদের অসীম মমতা আর ভালোবাসার কারণে এবং তিনি স্বামীর মৃত্যু বা মৃতদেহ দেখেননি বলে। 'একাত্তরে তো অনিল চক্রবর্তীর মতো কতো নির্দোষ হিন্দুকে প্রাণ দিতে হয়েছে! তাঁদের স্ত্রীদের বেলায় কি ঘটে? যেটি স্বাভাবিক, তা-ই।

যেমন যশোরের সুভদ্রাবালা সাহার বেলায়। শত শত অনুরূপ ঘটনার মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে যাঁর একটু কথা আমাদের জানিয়েছিলেন রুকুনউদ্দৌলাহ্, ৩০ মে, ১৯৮৯-এর 'সংবাদ'-এ।

'একাত্তরে এদেশের অধিকাংশ হিন্দুই দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন বাঙালী মাত্রেই হানাদারদের দু'চোখের বিষ। হিন্দুরা তো

'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। তাঁদের তাই দেশ ছেড়ে পালানো ছাড়া গতি ছিলো না। যাঁরা থেকে গেছেন, তাঁরা প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরেছেন। তাঁদের কেউ কেউ দেশের ভেতরেই একটু নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছিলেন।

সুভদ্রার স্বামী কৃষ্ণচন্দ্র সাহা এই দলের একজন।

মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, হিন্দু–মুসলমান অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কৃষ্ণচন্দ্র তখনও যশোর শহরের লোন অফিস পাড়ার বাসা থেকে নড়েননি। অতি গরীব মানুষ। ঠিকানাবদলে জীবিকা অর্জনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, হয়তো এই ভয়ে। তিনি যে জীবিকার প্রয়োজনেই বারো বছর আগে যশোরে এসেছিলেন। পাশের জেলা ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার শ্রীকৃষ্টদি গ্রাম থেকে। এদিকে, বয়েস পঞ্চাশের ওপর। এ–বয়েসে অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়াতে কয়জনের মন চায়? তাই প্রাণভয় আর স্ত্রী সুভদ্রা এবং একমাত্র সন্তান নারুগোপালকে সঙ্গী করে প্রৌঢ় কৃষ্ণচন্দ্র শহরেই পড়ে থাকেন।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মোকাবেলায় হানাদারবাহিনী আর তাদের এদেশী দোসর রাজাকারদের দাপট যখন বেড়ে যায়, তখন আর কৃষ্ণচন্দ্র শহরে থাকতে সাহস পান না। প্রাণভয় বড়ো হয়ে ওঠে। ভাবেন, এখান থেকে সরে যেতে পারলে একটু নিরাপদ থাকা যাবে।

সেই হিসেব করে তিনি একদিন গ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর হাত ধরে থাকে বউ আর ছেলে।

কিন্তু নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছনো আর হয় না। পথেই তাঁরা পড়ে যান সাক্ষাৎ যম হানাদারদের সুমুখে। তারা সুভদ্রাকে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। তারপর তাঁর চোখের সামনেই শুরু হয় স্বামীর ওপর নির্যাতন। রুকুনউদ্দৌলাহ্‌র ভাষায় যা 'অমানুষিক'। এবং সেই নির্যাতনে কৃষ্ণচন্দ্র সাহা এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

তাঁর জ্ঞান আর ফেরেনি। তার সাথে হারিয়ে গেছে সুভদ্রার সিঁথির সিঁদুর।

সুভদ্রা এখনো বেঁচে আছেন। ছেলে, তার বউ আর নাতি–নাতনী নিয়ে তাঁর কয়েকজনের সংসার। এই ছোট্টো সংসারে কোনো টানাটানি থাকার কথা নয়। কিন্তু বত্রিশ বছর আগে যে টানাটানির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তাঁরা শ্রীকৃষ্টদি থেকে যশোরে এসেছিলেন, তা আজও তাঁদের পিছু ছাড়েনি। বরং তার জ্বালা আরো বেড়েছে। স্বামী মুক্তিযুদ্ধকালের শহীদ। সে–কারণে কিছু সরকারী সাহায্য তাঁর প্রাপ্য ছিলো। কিন্তু যে কারণেই হোক, তা তিনি পাননি। শিক্ষাগত

পুঁজি না থাকায় ছেলে কার্যতঃ দিনমজুর,—দৈনিক মজুরিতে বাসের হেলপার। সুভদ্রার বয়েস এখন সত্তরের ওপর। তা সত্ত্বেও তাঁকে মেহনত করতে হয়। সংসারের টানাটানি কিছুটা মেটানোর তাগিদে। তিনি গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বানিয়ে বিক্রি করেন। এতো কান্ডের পরও তাঁদের সংসারে উনুনে হাঁড়ি চড়ে আক্ষরিক অর্থেই দিনে মাত্র একবার।

সংসারের জন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে নেত্রকোনা শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরের গ্রাম কালিয়াটির বাসিন্দা হেম সেনের স্ত্রী সাধনাময়ী সেন আর তাঁদের ছেলে ডাঃ মিহিরকুমার সেনের স্ত্রী শিবানী সেনকেও। যদিও তাঁদের সাংসারিক অবস্থা সুভদ্রা সাহার মতো ছিলো না, বরং ছিলো যথেষ্ট সচ্ছল।

সাধনাময়ীদের করুণ কাহিনী আমি শুনেছি আমার প্রতিবেশিনী কল্পনা গুপ্তর কাছে। তাঁরা তাঁর বড়ো দাদার শ্বশুরপরিবারের মানুষ।

এই পরিবারের সদস্য হেম সেনরা ছিলেন চার ভাই। পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে দু'ভাই আগেই ভারতে চলে যান। দেশ ছাড়তেন হেম সেনও। কিন্তু বাধা আসে মন থেকে। বড়ো দাদা অখিল সেন বৃদ্ধ, বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান। তবু ছোটো ভাইয়ের ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখেই দিন কাটান। হেম সেন তাঁকে একা ফেলে রেখে চলে গেলে তাঁর দশা দাঁড়াবে কেমন? দাদার প্রতি মমতায় তিনি দেশ ছাড়বার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেন।

অখিল সেন, হেম সেন এক সম্ভ্রান্ত বনেদী পরিবারের সন্তান। কালিয়াটিতে পৈতৃক ভদ্রাসন। সেখানকার দালানকোঠা, জমিজমা, পুকুর ইত্যাদি সাক্ষ্য দেয়, তাঁরা প্রাক্তন জমিদার। এদিকে, পেশায় দুই ভাই–ই আইনজীবী। পশার ভালো। থাকেন তাঁরা নেত্রকোনা শহরের মোক্তারপাড়ায়, টিনের ছাদওয়ালা কিন্তু পাকা দেয়ালের এক বিরাট বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ীতে। হেম সেনের বড়ো ছেলে মিহির ডাক্তার। নেত্রকোনার মদন থানায় চাকরি করেন। স্ত্রী এবং চারটি শিশুসন্তান নিয়ে তিনি সেইখানেই থাকেন।

'একাত্তরের এপ্রিল মাস। হানাদার বাহিনী নেত্রকোনার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের সহচর দেশের শত্রু রাজাকারের দল। হানাদাররা বাঙালীদের ধরে, মারে। রাজাকাররা চালায় লুটতরাজ। অনেক দিন থেকেই তাদের লোভী চোখ ছিলো সেন পরিবারের ধনসম্পদের ওপর। তাঁদের যদি দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া—কিংবা দুনিয়া থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলা—যায়, তাহলে ওই সম্পদ আসবে তাদেরই দখলে। কিন্তু সেসবের কথা থাক, আপাততঃ বড়ো প্রয়োজন প্রাণের নিরাপত্তার। অখিল সেন, হেম সেন তাই শহরের বাড়ী ছেড়ে

চলে যান কালিয়াটিতে। মগরা নদীর ওপারে। সেখানকার পরিস্থিতি একটু ভালো।

মাস দুয়েকের মতো তাঁরা কালিয়াটিতেই ছিলেন, নানারকম ভাবনাচিন্তা নিয়ে। জুন মাসের শেষ দিকে তাঁদের মনে হয়, শহরের বাড়ীটার একটু খবর নেয়া দরকার। সেখানে অনেক জিনিষ পড়ে আছে। সেগুলোর এখন কি হাল, কে জানে?

ইতিমধ্যে ডাঃ মিহির সেনও সপরিবারে কালিয়াটির বাড়ীতে এসে উঠেছেন। ঠিক হয়, নেত্রকোনা শহরের বাড়ীর অবস্থা জানতে তিনিই যাবেন। তবে, একা নয়। তাঁর দুই শ্যালক—শঙ্কর এবং সিদ্ধার্থ—সঙ্গে থাকবেন।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনজনে সকালে শহরে গিয়ে বিকেলেই গ্রামের দিকে রওয়ানা হন। শহরের বাসার পুরাতন ভৃত্য বৃদ্ধ রামুকে নিয়ে। এর মধ্যে তেমন কিছুই ঘটেনি। কিন্তু শহর থেকে বেরিয়ে খানিক দূর এগুতেই যেন অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়। তাঁরা জানতেন না, সেই দিনই হানাদারদের গাড়ী প্রথম নদী পেরিয়ে শহরে ঢুকেছিলো। তিনজনে ওই গাড়ীর সামনে পড়ে যান।

তারপর,—ঘটনার আকস্মিকতায় আতঙ্কিত এবং হতবুদ্ধি, তিনজনেই দৌড় দেন। পালানোর চেষ্টা করলে হানাদারদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে,—এ–হিসেব না করে। এর ফল যা হওয়ার, তা–ই হয়। তাঁদের পালাতে দেখেই হানাদাররা রাইফেল উঁচিয়ে হুকুম ঝাড়ে, হল্ট।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা থেমে যান। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলে দাঁড়ান। হানাদাররা তখন গাড়ী থামিয়ে তাঁদের উঠিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

ক্যাম্পে গিয়ে ডাঃ মিহির সেন দেখতে পান, প্রতিবেশী এবং পরিচিত অনেকেই সেখানে আছে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে একটি লোক। সে রীতিমতো বিশিষ্ট ব্যক্তি। এবং জনপ্রিয় আর লোকহিতৈষী। সবাই তাকে 'হক চাচা' বলে ডাকে। তাকে দেখে মিহির আশ্বস্ত বোধ করেন। সে নিশ্চয়ই তাঁদের ছাড়িয়ে নেবে।

রাতটা তাঁদের মিলিটারী ক্যাম্পেই কাটে। এর মধ্যে হানাদারদের সাথে হিতৈষী চাচার কি কথাবার্তা হয়, তাঁরা জানেন না। কিন্তু সকালবেলা দেখেন, কয়েকজন বন্দুকধারী তাঁদের চারজনকে ঘিরে ধরেছে। কোথায় জানি নিয়ে যাবে।

কিন্তু মিহির যেতে আপত্তি জানান। তাঁর ভয়, লোকগুলো হয়তো তাঁদের মেরে ফেলবে। তিনি বিশিষ্ট লোকটিকে বলেন, চাচা, ওরা আমাদের কোথায়

নিয়ে যেতে চায়? আপনি তো জানেন, আমার কোনো দোষ নেই। আমাদের কথাটা ওদের একটু বুঝিয়ে বলুন না!

কাকে কি বলা? মিহিরদের ধরিয়ে দিয়েছিলো তো আসলে সে-ই। তাঁদের সম্পত্তি বাগানোর জন্যে।

চাচা উত্তর দেয়, না, না, তোর কোনো ভয় নেই। কিছু করবে না। ওদের সাথে চলে যা।

ডাঃ মিহির সেন হানাদারদের সাথে যেতে আর আপত্তি করেননি।

বন্দুকধারীরা তাঁদের চারজনকে নিয়ে গিয়ে মগরা নদীর পুলের ওপর দাঁড় করায়। কাছেই মাঠে খোঁটায় বাঁধা গরু চরছিলো। হানাদারদের একজন গিয়ে গরু ছেড়ে দিয়ে দড়ি নিয়ে আসে। সেই দড়িতে চারজনকে জড়িয়ে বেঁধে ফেলে। তারপর তাঁদের লক্ষ্য করে চালায় গুলি। তাতে ঝাঁজরা-হয়ে-যাওয়া, রক্তাক্ত দেহগুলি নদীতে গড়িয়ে পড়ে। তবু হানাদারদের বন্দুক থামে না।

তখন বিকেল তিনটে-চারটে।

এই ঘটনার কথা অন্য কারো জানার উপায় ছিলো না। তবু লোকে জেনে ফেলে। শঙ্করের মুখে। তাঁদের যখন দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়, তিনি প্রাণ বাঁচানোর জন্যে একটু চেষ্টা করেন। গায়ে কয়েকটি মোচড় মেরে। তাতে বাঁধন একটু আলগা হয়ে যায়। আর, গুলির মুহূর্তখানেক আগেই তিনি নদীতে গিয়ে পড়েন। সেখানে ডুব দিয়ে খানিকটা দূরেও সরে যান। এতে তিনি প্রাণে রক্ষা পান। বন্দুকধারীরা যখন নদীতেও গুলি চালায়, তাঁর শুধু পায়ে গুলি লাগে।

হানাদাররা চলে গেলে তিনি নদী থেকে উঠে আসেন। সাবধানে, অতি কষ্টে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তীরের অদূরে একটি বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে একটু সুস্থ হয়ে আবার আসেন নদীর ধারে। দেখেন, তাঁর সঙ্গী প্রিয়জনদের সবাই এক দড়িতে বাঁধা অবস্থায় নদীতে ভাসছেন।

আশপাশের লোকজনের সাহায্যে তিনি কালিয়াটির বাড়ীতে ফিরে আসেন। যেখানে তাঁদের অপেক্ষায় মিহিরের বাবা, জ্যাঠা, মা এবং স্ত্রী তাঁর অবোধ শিশুদের নিয়ে গভীর উৎকণ্ঠায় প্রহর গুনছিলেন। শঙ্করের মুখে নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনে সবার পাঁজর ভেঙে যায়। বৃদ্ধ বাবা-জ্যাঠা বার বার আর্তনাদ করে বলতে থাকেন, আমরাই ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি। কেন ওদের পাঠিয়েছিলাম শহরে?

মিহির-সিদ্ধার্থ-রামু ট্র্যাজেডির কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। তখনও অনেক বাকী।

এই তিনজনের অপমৃত্যুর পর অখিল সেন, হেম সেনের আর এদেশে থাকার কথা নয়। কিন্তু তাঁরা গ্রামেই পড়ে থাকেন। পুত্রহারা সাধনাময়ী আর স্বামীহারা শিবানীর হাহাকার এবং মিহিরের দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ের কান্নাকে নিত্যসহচর করে। সেই সঙ্গে বাচ্চা কটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক অসহায়তাবোধ নিয়ে। তাদের মধ্যে যে সবার বড়ো, তার বয়েসও তখন মাত্র বছর পাঁচেক।

বছরের প্রায় শেষ দিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া বাঙালীদের উদ্দেশে 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করেন। এটা যে বাঙালী নিধনের নতুন সুযোগ সৃষ্টির একটি কৌশল মাত্র, অখিল সেন–হেম সেন তা বোঝেন না। তাঁরা তাই ভাবেন, শহর হয়তো এখন নিরাপদ। এবং তারপর,–তখন আগস্টের শেষ দিক,–বাড়ীর সবাই শহরের বাসায় এসে ওঠেন।

বিরাট বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ীটার তখন দীন দশা। ঘরদোর একেবারে বিধ্বস্ত। জিনিষপত্র বলতে কিছুই নেই, সব লুট হয়ে গেছে।

তবু অখিল সেন, হেম সেন সেইখানেই থেকে যান।

সেখানে একে একে দিন সাতেক কাটে।

তারপর এক রাতে দরজায় প্রবল কড়া নাড়া। রাত তখন বারোটার মতো। কড়ার শব্দে বাড়ীর লোকজনের ঘুম ভেঙে যায়। অখিল সেন আর হেম সেন উঠে গিয়ে দরজা খোলেন। এবং দেখেন, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন হানাদার আর রাজাকার।

তাঁদের দেখে অবাঞ্ছিত আগন্তুকরা হেম সেনকে বলে, আপনাকে একবার ক্যাম্পে যেতে হবে।

অখিল সেন বুঝলেন, ছোটো ভাই ক্যাম্পে গেলে আর ফিরবে না। তিনি তাই বলেন, তাহলে আমিও ওর সঙ্গে যাই।

দুর্বৃত্তরা প্রথমে তাঁর কথায় রাজী হয় না। তারপর কিন্তু বলে, ঠিক আছে। চলুন আপনিও।

এবার তারা মেয়েদের বাইরে ঠেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। শুরু করে লুটপাট। বাড়ীতে টাকাপয়সা, গয়নাগাটি যা ছিলো, তার কিছুই বাদ রাখে না।

লুটপাটের পর তারা অখিল সেন আর হেম সেনকে নিয়ে চলে যায়। বাড়ীতে পড়ে থাকেন শুধু দুই অসহায় মহিলা, হেম সেনের বৃদ্ধা স্ত্রী সাধনাময়ী আর তাঁর সদ্যবিধবা পুত্রবধূ শিবানী। সঙ্গে তাঁদের থেকেও অসহায় চারটি শিশু।

আবার কান্নার রোল।

ভোরে পাড়ার হিতৈষীরা আসেন। তাঁদের ভেতর কেউ কেউ ছিলেন সত্যিই

অকপট শুভাকাংক্ষী। তাঁরা সাধনাময়ীর হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলেন, আজই এই বউসহ বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। নইলে এর ইজ্জত থাকবে না।

শ্বাশুড়ী–বউ চারটি শিশুর হাত ধরে এক কাপড়ে দেশান্তরে পাড়ি দিলেন।

অখিল সেন আর হেম সেনের ব্যাপারটা প্রতিবেশীরা স্বচক্ষেই দেখেছিলেন। অবশ্যি, দূর থেকে। হানাদাররা তাঁদের দু'ভাইকেও মগরা নদীর সেই পুলের ওপর দাঁড় করিয়ে গুলি করে। সেখানে অখিল সেন খুনীদের অনুরোধ জানান, তাঁকেই যেন আগে মারা হয়। তিনি পরম স্নেহভাজন অনুজের মৃত্যু নিজের চোখে দেখতে চাননি। দুর্বৃত্তরা কি ভেবে তাঁর অনুরোধটি রক্ষা করে। তবে, গুলি চালানোর আগে তাঁর চোখ আর হাত বেঁধে নিয়ে।

তাঁদের দু'ভাইয়ের লাশও মগরা নদীর জলে ভেসে যায়।

বাংলো বাড়ীতে সেনদের ট্র্যাজেডি তখনও শেষ হয়নি।

সাধনাময়ী আর শিবানী প্রতিবেশীদের কথায় ভারতে চলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে বেশী দিন থাকেননি। ডাঃ মিহির সেনের একমাত্র অনুজকে সঙ্গে নিয়ে নেত্রকোনায় ফিরে আসেন। যেন ট্র্যাজেডির শেষ অঙ্ক পূর্ণ করতে। তাঁরা ফেরবার অল্প কাল পরই একদিন দেখা যায়, মিহির সেনের ভাইটির লাশ রাস্তায় পড়ে আছে।

এদিকে, সেই যে তাঁর শ্যালক শঙ্করের পায়ে গুলি লেগেছিলো, তার ঘা আর শুকোয়নি। ক্রমে সেখানে ইনফেকশন হয়। তিনি সময়মতো চিকিৎসার সুযোগ পাননি। ফলে, বাংলো বাড়ীর শেষ অপঘাতের মাস ছয়েক পর তিনিও চিরবিদায় নেন। এবং তার কিছু কাল পর তাঁকে অনুসরণ করে হাড় জুড়োন সাধনাময়ী। তবে, সাধনাময়ী আর অপঘাতে যাননি। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছিলো।

এখন টিকে আছেন শুধু বিয়ের সাত বছরের মাথায় বিধবা হওয়া শিবানী সেন। আর আছে তাঁর সেদিনের শিশুরা। চরম কষ্টের ভেতর দিয়ে ইস্কুল–কলেজ পার হয়ে তারা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে।

তাদের এই সাফল্যের মূলে আছে মা শিবানীর সংগ্রাম। তিনি কোনো সরকারী সাহায্য পাননি। তাঁর পুঁজি ছিলো ধৈর্য, ত্যাগ আর কঠোর পরিশ্রম। প্রথমে সেলাইয়ের কাজ করেছেন তিনি। তারপর টিউশনি। শেষে হয়েছেন পরিবার পরিকল্পনার সহকারী কর্মী। ঘরভাড়া বাবদও কিছু টাকা এসেছে। তবু কোনো কোনো দিন এক বেলার বেশী খাবার জোটেনি। তা সত্ত্বেও দেশ ছাড়বার কথা আর ভাবেননি তিনি।

তাঁর ছেলেমেয়েরা এখন নিজেদের পড়াশোনার খরচ নিজেরাই যোগাড় করে।

দুঃখ শুধু এই যে, একটি মেয়ে প্রথম বিভাগে এইচ.এস.সি. পাশ করেও ডাক্তারি পড়বার সুযোগ পায়নি।

আর, রহস্যের বিষয়, পাড়ার বৃদ্ধ হিতৈষীরা মেয়েটিকে দেখে বলেন, তোরা এতো বড়ো হয়ে গেছিস? এখানে তো আর থাকতে পারবিনে। ঘরবাড়ী বিক্রি করে দিয়ে ভারতে চলে যা।

কিন্তু শিবানী সেন অটল। যেখানে তাঁর সব গেছে, সে-দেশ ছেড়ে তিনি আর নড়বেন না।

সংগ্রাম ভিন্নতর

শিবানী সেনের মতো সংগ্রাম করেছিলেন আরো কতোজন! স্বামী-সংসার, সহায়-সম্পত্তি হারিয়ে তাঁদের দিনের পর দিন যে দুঃসহ কষ্ট আর যন্ত্রণার ভেতর পরবর্তী জীবন কাটাতে হয়েছে, তা কোনো বিবরণ দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। অস্তিত্ব রক্ষার সেই সংগ্রাম কারো জীবন বিধ্বস্ত করে ফেলে, কাউকে কোনো রকমে টিকিয়ে রাখে। ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের অগ্নিঝরা স্পৃহাও জাগিয়ে তোলে। এবং সক্রিয়তায় লালিত সে-স্পৃহা শেষ পর্যন্ত ফলবতীও হয়।

এই ব্যতিক্রমী সংগ্রামীদের মধ্যে থেকে যাঁর কথা এখানে মনে পড়ছে, তিনি অবশ্যি 'সিঁদুরকপালে' নন। জাতে মুসলমান। কিন্তু বিপদের প্রথম পর্যায়ে সিঁদুরমোছাদের থেকে তাঁর কোনো পার্থক্য ছিলো না। তারপর অবশ্যি, তিনি ভাগ্যবতী, তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবার মতো সাহসী লোকের কোনো অভাব হয়নি।

তিনি করুণা বেগম। পৈতৃক নিবাস বরিশালের মুলাদি উপজেলার পাতাচর গ্রামে। বাবার নাম শাহ্ আলী আহমদ খোন্দকার।

তাঁর কাহিনী বলবার আগে একটি হত্যালীলার দৃশ্য কল্পনা করা যাক। একটুখানি কৈফিয়ত সহকারে। কল্পনা করবার কথা বলছি যদিও, হত্যালীলা বা মূল দৃশ্যটি কিন্তু কাল্পনিক নয়।

দৃশ্যটির স্থান জয়ন্তী নদীর তীর। কাল মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকের কোনো এক দিন। পাত্র এক দিকে দুজন তরুণ। অন্য দিকে, তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, রাজাকার নামধেয় কয়েকজন বন্দুকধারী পশু। তরুণ দুটির মুখ বিবর্ণ, পশুগুলির মুখ ঝলমলে।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই পক্ষের মাত্র কয়েকটি মিনিট কাটে। তারপর নরপশুদের বন্দুকগুলি তরুণ দুজনের দিকে তাক করা হয়। পশুগুলির সর্দারের নির্দেশে। এবং পরক্ষণেই কয়েকটি গুড়্ুম গুড়্ুম শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ দুটির রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এবার প্রশ্ন ওঠে ঃ তরুণ দুটির অপরাধ কি? রাজাকারের হাতে মৃত্যুই প্রশ্নটির জবাব দেয়। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, সক্রিয় কর্মী। যদিও ঠিক মুক্তিযোদ্ধা নন।

এই দুই শহীদ তরুণের একজন শহীদুল হাসান ওরফে চুন্নু। করুণা বেগমের স্বামী। পেশায় শিক্ষক। চাকরি করতেন একটি প্রাইমারী ইস্কুলে। রাজনীতিসচেতন মানুষ। এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন সক্রিয় কর্মীও ছিলেন অল্প বয়েস থেকেই। সেই সুবাদে কাজীরচর আওয়ামী লীগের সম্পাদক হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেননি। কিন্তু যুদ্ধের জন্যে ট্রেনিং নিয়েছেন এবং অনেক তরুণকে রিক্রুট করে ট্রেনিংয়ের জন্যে ভারতে পাঠিয়েছেন। রাজাকারদের কাছে এই সবই তো যথেষ্ট 'অপরাধ'। এবং করুণা বেগমের সংগ্রামের এক বড়ো কারণ। যদিও তা কিছুটা পরোক্ষ।

প্রত্যক্ষ কারণ অবশ্যি শহীদুল হাসানের মৃত্যু। আবুল খায়েরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (১৯৭২ সালের ১৪ জুন দৈনিক 'পূর্বদেশ'-এ প্রকাশিত) এটি এবং পূর্বোক্ত কারণটিকে এক সাথে মিলিয়ে করুণা বেগম বলেছিলেন, স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেয়া এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্যেই তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন।

শহীদুল হাসানের সাথে তাঁর বিয়ে হয় যুদ্ধের বছর পাঁচ-ছয় আগে। যখন

তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্রী। এবং তাঁর বয়েস পনেরো–ষোলো। বিয়ের কিছু কাল পরই তাঁর কোলে আসে একটি ছেলে। সেই ছেলের বয়েস যখন মোটে তিন বছর, তখনই তাঁর–না, সিঁথির সিঁদুর নয়,–মনের সিঁদুর মুছে গেল।

এই আঘাতে প্রথম দিকে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন অবশ্যই। কিন্তু সে কেবল দুই–এক সপ্তাহের জন্যে। এবং এরই মধ্যে তাঁর ভেতর জেগে ওঠে অগ্নিশিখা। তিনি স্থির করেন, মুক্তিবাহিনীতে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় তার জন্যে উদ্যোগ–আয়োজন। শহীদুল হাসানের মৃত্যুর এক মাস পরই তরুণী বিধবা করুণা বেগমকে দেখা যায় এক গেরিলা বাহিনীতে। সেটি মুলাদি উপজেলার মুক্তিযোদ্ধার দল। তাতে সদস্য অনেক। শুধু মহিলাই জনাপঞ্চাশেক। ট্রেনিং নেয়ার পর করুণা বেগম হন তাঁদের কমাণ্ডার।

এসব যেন ঘটে যায় অবলীলায়। করুণা বেগম যুদ্ধও চালাতে থাকেন স্বাভাবিকভাবে, তাঁর পুরুষ সহযোদ্ধাদের মতোই। অসুবিধা ছিলো শুধু একটি। হাজার হলেও তিনি মা। এবং তাঁর সন্তানটি শিশু। মায়ের সাহচর্য, আদর–স্নেহ তখন যার সর্বক্ষণের প্রয়োজন। করুণা বেগম এই সমস্যার মোটামুটি একটা সমাধান করে ফেলেন। ছেলে মান্নাকে রেখে দেন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের কাছে একটি বাড়ীতে। তাতে সুবিধা হয় এই যে, যুদ্ধের কাজকর্ম থেকে যখনই একটু ফুরসত পান কিংবা অন্যভাবে সুযোগ মেলে, তিনি তার দেখাশোনা করতে পারেন।

এই সবের এবং তাঁর মুক্তিযোদ্ধা জীবনের বিবরণ এরপর উপরি–উক্ত সাক্ষাৎকার থেকেই দিই।

মুক্তিবাহিনীতে গিয়ে করুণা বেগম ট্রেনিং নেন নানা বিষয়ে। সেসবের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই প্রধান অস্ত্রচালনা। গ্রেনেড মারা এবং রাইফেল আর স্টেনগান চালানো। সেই সঙ্গে যুদ্ধকালে ব্যবহার্য নানাবিধ বিস্ফোরক সম্পর্কে ট্রেনিং।

করুণা বেগম অপারেশনে গেছেন বহু জায়গায়। কসবা, কাসিমাবাদ, বাটাজোড়, নন্দীবাজার, টরকি ইত্যাদিতে। সবই বরিশাল জেলার ভেতর। তিনি গেরিলা। তার ওপর, নারী। তাই, সব সময়ই অপারেশনে গেছেন ছদ্মবেশে। কখনো ভিখারিনী সেজে, কখনো বা গ্রাম্য বধূর রূপে। যখন যাতে সুবিধা হয়। যদিও গেরিলা, তিনি সব সময় কেবল চোরাগোপ্তা আঘাত হেনেই সরে আসতে পারেননি। অনেক জায়গায়ই অপারেশনে বেরিয়ে তাঁকে ছোটোখাটো যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। তিনি অবশ্যি তাতে কোথাও হার মানেননি।

তবে, একবার তাঁকে জখম হতে হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ তখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। করুণা বেগমদের বাহিনী–কুতুব বাহিনীর একটি দল গেছে মাহিলারা নামে একটি জায়গায় অপারেশনে। দলে দশটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে। কমাণ্ডার করুণা বেগম। তাঁদের কাজ হানাদারদের ক্যাম্পের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের খতম করা।

পরিকল্পনা মাফিক আগে ক্যাম্পটি ঘিরে ফেলা হয়। তারপর আসল অপারেশন। সেটা শুরু করেন করুণা বেগম নিজে। পর পর পাঁচটি গ্রেনেড মেরে। সেই আচমকা হামলায় হানাদাররা দিশেহারা। তারা শুরু করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে। দেখতে দেখতে বেধে যায় যুদ্ধ।

মাহিলারার এই হানাদার ঘাঁটি আক্রমণের একটি বিশেষ কারণ ছিলো। হানাদাররা এখান থেকে আশপাশের গ্রামগুলির ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালাতো। তার ফলে গ্রামের লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তাদের জানমালের কোনো নিরাপত্তা ছিলো না। এদিকে, ঘাঁটিটি জনবল–অস্ত্রবলে প্রায় দুর্ভেদ্য। মুক্তিবাহিনী সহজে তার কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। করুণা বেগমেরা শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়েই তার ওপর হামলা চালান।

সেদিন হানাদারদের সাথে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ চলেছিলো প্রায় চার ঘন্টা। তাতে হানাদার পক্ষে হতাহত হয় নাকি দশজন। আর, মুক্তিবাহিনীর একজন আহত। তিনি দলনেত্রী করুণা বেগম। তাঁর ডান পায়ে গুলি লাগে।

এর আগে তিনি যেসব অপারেশনে গিয়েছিলেন, সেগুলির সব কটি থেকেই অক্ষত দেহে ফিরে আসেন। এবং তাঁদের অপারেশনগুলি সফলও হয়।

একবার তাঁরা যান কাসিমাবাদে একটি পুলের পাশে, হানাদারদের বাঙ্কারে অপারেশন করতে। করুণা বেগমের পরনে যথারীতি ছদ্মবেশ। সেদিন বেশবাসে তিনি একজন ভিখারিনী। সেখানেও অপারেশনের সূচনা করেন তিনিই, পেছন থেকে বাঙ্কারে গ্রেনেড মেরে। সেই গ্রেনেড হামলা ছিলো মোক্ষম। তাতে বাঙ্কারটির দারুণ ক্ষতি হয়। করুণা বেগম তাঁর কাজ সেরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। তারপর হামলার জন্যে এগিয়ে আসে তাঁদের মুক্তিদল। হিসেব পাওয়া যায়, তাদের হামলায় দশজন হানাদার আর রাজাকার মারা পড়ে।

করুণা বেগম একটি ছোট্টো কিন্তু দুঃসাহসিক অপারেশন করেন বরিশাল শহরে, মেডিক্যাল কলেজের সামনে। সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো একটি মিলিটারি ভ্যান। তার আরোহী বেশ কিছু হানাদার। করুণা বেগম বিরাট ঝুঁকি নিয়ে সেই চলন্ত ভ্যানে গ্রেনেড মারেন। তাতে কোনো হানাদার মরেনি, কিন্তু জখম

হয়েছিলো কয়েকজন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে করুণা বেগম তাঁদের কুতুব বাহিনীর সহযোদ্ধাদের সাথেই থাকতেন। সেখানে মহিলা বলে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। বরং সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে পেয়েছেন বোনের আদর এবং সম্মান।

তবে, মাহিলারা অপারেশনের পর তিনি একটু বিপদে পড়েন। পায়ের জখমটির কারণে।

চিকিৎসার জন্যে তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় মুলাদি হাসপাতালে। তিনি মুক্তিযোদ্ধা, - হাসপাতালে তাঁর এই পরিচয় দেওয়া সম্ভব ছিলো না। তাই কর্তৃপক্ষকে বলা হয়, তিনি একজন সাধারণ গৃহবধূ। তারপরও তাঁর চিকিৎসা চলে যতো দূর সম্ভব সাবধানে এবং গোপনতা রক্ষা করে। যাতে তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ না পায়। ছেলে মান্না এই সময় থেকে থাকে তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে।

তাঁর যথাযথ চিকিৎসা অবশ্যি মুলাদির ছোট্রো হাসপাতালে সম্ভব ছিলো না। হানাদারদের আত্মসমর্পণের পর তাঁকে তাই নিয়ে যাওয়া হয় বরিশালের সদর হাসপাতালে। সেখানে তিনি ছিলেন চার মাস। কিন্তু তাতেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। শেষে তাঁকে নিয়ে আসা হয় ঢাকার সামরিক হাসপাতালে। এখানেও তাঁর চিকিৎসা চলে দীর্ঘ দিন।

সামরিক হাসপাতালে থাকাকালে একদিন জেনারেল ওসমানী আসেন তাঁকে দেখতে। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী তখন তাঁকে সামরিক কায়দায় স্যালুট দিয়ে সম্মান জানান এবং 'মা' বলে সম্বোধন করেন।

করুণা বেগমের মনের জোর ছিলো দারুণ। সামরিক হাসপাতালে আসবার মাসখানেক পরও,–তখনও তাঁর পায়ের ঘা সারেনি,–তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন, সুস্থ হয়ে ওঠার পর আবার ঘর বাঁধবেন।

ধসকে–যাওয়া একজন

কিন্তু করুণা বেগমের মতো মনের জোর কয়জনের থাকে? শোককে যাঁরা পরিণত করতে পারেন শক্তিতে, নতুন জীবন গড়বার স্বপ্নসাধে, তাঁরা তো ব্যতিক্রম। শিবানী সেনের সংগ্রামও সবার দ্বারা সম্ভব হয় না। আর, সুভদ্রা সাহা তো স্বামী হারানোর দুর্ঘটনাকে নিয়তির মতো স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছেন।

এইটুকুও কি সবাই পারে?

ছোট্টো এই প্রশ্নটির জবাব যদি কেউ খুঁজতে চান, তাহলে তাঁকে অনুরোধ করবো পশ্চিম মধ্য–বাংলাদেশের একটি গ্রামে যেতে। নাম তার সাহাপুর। অবস্থান পাকশী শহরের দক্ষিণ দিকে, রেললাইনের এপারে। সেই গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়ান বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েসের এক মহিলা। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

উত্তর অবশ্যি তিনি নিজের মুখে দেবেন না। কেননা, কারো সাথে কথা বলবার সময় তাঁর নেই। তিনি সারাক্ষণ ব্যস্ত তাঁর নিজের কথা নিয়ে। যেগুলি সর্বতোভাবেই অসংলগ্ন, সুতরাং দুর্বোধ। মাঝে মাঝে তিনি গলা ছেড়ে গানও গেয়ে ওঠেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, সেই গানও ঠিক শোনার মতো নয়।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলে আরো দুই–একটি কথা জানা যাবে। যেমন, তাঁর নাওয়াখাওয়ার কোনো গরজ নেই। কেউ যদি দয়া করে ডেকে এক মুঠো খাবার দেন, খান। নইলে নিশ্চিন্ত মনে নির্জলা উপোস। তাঁর কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানাও নেই। দিন বলুন, রাত বলুন, তাঁর পথেই কাটে। যদিও ওই গ্রামেই এক সময় ছিলো, এখনো আছে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা।

পাঠকরা এতোক্ষণে নিশ্চয়ই আমার প্রশ্নটির উত্তর পেয়ে গেছেন। শানে নজুলসহ না হলেও চুম্বকে। এবং তাঁদের বুঝতে তো বাকী নেই–ই যে, মহিলাটি পাগল। হ্যাঁ, সাহাপুর এবং তার আশপাশের গ্রামগুলির সবাই তাঁকে জানে রাজু পাগলী বলে।

'এখন' বলছি এ–কারণে যে, এ–পরিচয় তাঁর বরাবরকার নয়। 'একাত্তরের জুলাই মাসের গোড়ার দিক পর্যন্তও তিনি রাজু পাগলী ছিলেন না, ছিলেন রাজিয়া খাতুন ওরফে রাজু। সাহাপুরের নিকটবর্তী গ্রাম দিয়াড় বাঘইলের

নবিরউদ্দীন মোল্লার সুন্দরী আদরিণী কন্যা এবং সাহাপুরের এক ভদ্র বর্ধিষ্ণু পরিবারের কর্তা মোহাম্মদ ফয়েজ সর্দারের কল্যাণী স্ত্রী, একটি মেয়ে এবং দুটি ছেলের পরম স্নেহময়ী মা।

এবার ওপরের প্রশ্নটির একটি সম্পূরক প্রশ্ন ঃ এমন রাজিয়া খাতুন রাজু পাগলী হলেন কেন বা কেমন করে?

ফয়েজ সর্দার আর রাজিয়া খাতুন ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ। গ্রামের আর দশজনের মতো সহজ সরল। তেমন কোনো ঝামেলা না থাকায় পরিবারটি মোটামুটি হিসেবে সুখীও। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, তাঁদের ছিলো এক ধরনের শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন।

২৫ মার্চের পর এই পরিবারে নতুন হাওয়া লাগে, যেমন লেগেছিলো সারা বাংলাদেশে। ফয়েজ সর্দার তাতে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাঁর সেই চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায় প্রতিরোধ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে। স্ত্রী রাজিয়া খাতুনকেও তা স্পর্শ করে।

তারপর একদিন –

বাংলাদেশ তখন মুক্তিযোদ্ধায় ভরে গেছে। সাহাপুরে তাদের একটি বড়ো দল। তারা থাকে গোপন ঘাঁটিতে। খায়দায় ছোটো ছোটো উপদলে ভাগ হয়ে এর ওর বাড়ীতে, পালা করে। ফয়েজ সর্দারের কাছে অনুরোধ আসে, তিনি যেন কয়েকটি ছেলেকে রাত্তিরে খাওয়াবার ভার নেন। তাতে তিনি এক কথায় রাজী। আর, রাজিয়া খাতুন,–যিনি ফয়েজ সর্দারের ঘরে এসেছিলেন চৌদ্দো বছর বয়েসে কিশোরী বধূ হয়ে, এখন পতিব্রতা গৃহিণী,–স্বামীর কথাকেই মেনে নেন নিজের কথা বলে। বরং দেখা যায়, তাঁর উৎসাহই যেন বেশী।

সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় ছেলেদের খাওয়ানো। তখন আষাঢ় মাস। বৃষ্টি–বাদলার সময়। তারই মধ্যে ভিজে–কিংবা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে–ছেলেরা আসে। রাজিয়া খাতুন আপন হাতে রাঁধা ভালো–মন্দ খাবার পরম স্নেহে তাদের পাতে তুলে দেন। যেন নিজের সন্তান বা ভাইদের খাওয়াচ্ছেন।

কিন্তু এমনটি বেশী দিন চলে না।

দেশে তখন শুধু মুক্তিযোদ্ধাই নয়, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কিছু জ্যান্ত প্রতিশব্দও দেখা দিয়েছে। রাজাকার আর আল–বদর। সাহাপুরে তারা ছিলো কাপুরুষ। সংখ্যায়ও বেশী নয়। তারা তাই ফয়েজ সর্দার বা মুক্তিবাহিনীর ছেলেগুলিকে সামনাসামনি কিছু বলবার সাহস পায় না। তবে, আসল পথ তো

তাদের জন্যে সব সময়ই খোলা ছিলো। তারা গোপনে হানাদারদের ক্যাম্পে খবর দেয়। এবং তাদের ফয়েজ সর্দারের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আসে। যখন সেখানে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, ছেলেরা তখন খেতে এসেছিলো। হঠাৎ বাড়ীর সামনে হানাদারদের হাঁকডাক শুনে তারা হকচকিয়ে যায়। বাড়ীর লোকজন তো হতবুদ্ধি। কিন্তু এই আকস্মিক বিপদের সময়ও রাজিয়া খাতুন মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই নিজেকে সামলে নেন। এবং তখন তাঁর প্রথম চিন্তা হয়, মুক্তিবাহিনীর ছেলেগুলিকে কিভাবে বাঁচানো যায়। সমস্যাটির তিনি বলতে গেলে এক মুহূর্তেই সমাধান করে ফেলেন। ছেলেগুলিকে বাড়ীর পেছন দিকের পথ দেখিয়ে দিয়ে বলেন, তোমরা বেরিয়ে যাও। সাবধান, একটু শব্দও যেন না হয়।

ছেলে কটি নিরাপদেই সরে পড়ে।

আর, তারা বেরিয়ে যেতে না যেতেই হানাদাররা ভেতরে ঢোকে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করে নানারকম প্রশ্ন, ডাকাতের মতো তল্লাশি আর তাণ্ডব। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে তাদের আসা, তা ব্যর্থ।

আক্রোশবশে তারা এবার গৃহকর্ত্রী রাজিয়া খাতুনকে পাকড়াও করে। তাঁকে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের গোড়ায় তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

সেই ক্যাম্পে তাঁর ওপর চলে অত্যাচার। একজন সুন্দরী তরুণী মহিলার ওপর যতো রকমে সম্ভব। ধর্ষণ থেকে শুরু করে অন্য সর্ববিধ শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন। দিনের পর দিন। সেসব অবশ্যি শুধু শাস্তি নয়। নরপশুগুলির অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিলো। তাঁর কাছ থেকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেগুলির নাম-ঠিকানা, কাজকর্মের খবর ইত্যাদি জেনে নেয়া।

কিন্তু রাজিয়া খাতুনও মরিয়া। নারীর সবচেয়ে বড়ো সম্পদ যে ইজ্জত, তা তো গেছেই। এখন প্রাণ গেলেই বা কি? তিনি কিছুতেই মুখ খোলেন না।

এইভাবে সপ্তাহ দুয়েক কাটে। হানাদাররা ভেবে পায় না, তাঁকে নিয়ে এর পর আর কি করা যায়। বোধ হয় বিরক্ত হয়েই তাঁকে এবার ছিবড়ের মতো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এদিকে, তিনি ক্যাম্পে থাকাকালে বাইরে আরো অনেক ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে। হানাদাররা তাঁর স্বামীকে গুলি করে মেরে ফেলে। বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়। গ্রামের আরো অনেক লোকের ভাগ্যে জোটে এমনি অত্যাচার। পশুরা নিরীহ গোবেচারা মানুষকে ধরে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি চালায়।

রাজিয়া খাতুন কিন্তু এসবের কিছুই জানতে পাননি। ক্যাম্প থেকে যখন

তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞানের কণা মাত্রও তখন অবশিষ্ট নেই। তিনি বদ্ধ পাগল,—রাজু পাগলী।

রাজিয়ার কিশোর বন্ধু

রাজিয়া খাতুন জানতে পাননি আরো অনেক কিছুই। বিশেষ করে, তাঁকে উদ্ধারের একটি চেষ্টার কথা। তিনি যখন ধরা পড়েন, তার পর পরই তো তাঁদের গ্রামে শুরু হয় পশুসেনাদের তাণ্ডবলীলা। সেই পরিস্থিতিতে আশপাশের কারো পক্ষে তাঁকে উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে আসা সম্ভব ছিলো না। তবু, একটু দেরীতে যদিও, সেই চেষ্টা অন্ততঃ একজন করে। এবং তাতে তাকে হানাদার যমদের খপ্পরেও পড়তে হয়।

সে দিয়াড় বাঘইল গ্রামের মোহাম্মদ জয়নাল প্রামাণিকের পাঁচ সন্তানের (দুই ছেলে, তিন মেয়ে) একজন। আজ তার বয়েস পঁয়ত্রিশ। যুদ্ধকালের সেই ঘটনাটির সময় সে ছিলো ষোলো বছরের কিশোর।

অতি সাধারণ চাষী ঘরের ছেলে আবু হেনা লেখাপড়া শেখেনি। তার বয়েসী ছেলেদের যা কাজ, তারও সময় কেটেছে তা-ই করে। একটু সুযোগ বা অবসর পেলেই সে পাড়ার ছেলেদের সাথে ডাংগুলি খেলতে লেগে যেতো। কিংবা অন্য কোনো খেলায়। কিন্তু বাড়ীর একটি নিয়মিত কাজের ভারও তার ওপর ছিলো। সে গরু চরাতো। তাদের নিজেদের কয়েকটি গরু ছিলো। একটু চঞ্চল যদিও, বলিষ্ঠ দেহ এবং সরল মনের অধিকারী, আবু হেনা সংসারের অন্যান্য কাজও কিছু কিছু করতো।

এমন ছেলের কোনো রাজনৈতিক চেতনা থাকার কথা নয়। কিন্তু ’একাত্তরের প্রবল দেশপ্রেম সকল সৎ বাঙালীকে কোনো না কোনো ভাবে স্পর্শ করে। আবু হেনাও সেই স্পর্শ এড়িয়ে যেতে পারেনি। নিজের এবং

আশপাশের গ্রামগুলির মুক্তিযোদ্ধাদের অনেককেই সে চিনতো। ক্রমে তাদের কাজকর্মের সহায়কও হয়ে পড়ে। কার্যতঃ গুপ্তচর হিসেবে। মুক্তিযোদ্ধাদের কাজে লাগতে পারে, এমন টুকরো বা খুচরো খবর সে প্রায়ই যোগাড় করে দিতো।

ঘটনার দিন আবু হেনা বেরিয়েছিলো গরু চরাতে। সেদিন সারাক্ষণ টিপ টিপ করে আষাঢ়ের বৃষ্টি ঝরছে। সে ছাতা মাথায় দিয়ে গরুগুলোকে নিয়ে প্রথমে যায় রেললাইনের পাশে। তারপর আস্তে আস্তে রেললাইন পার হয়ে পাকশী পেপার মিলের পেছনের দিকে। সেখানে অনেক বড়ো বড়ো ঘাস।

আবু হেনা যখন সেখানে গরু চরাতে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ তার কাছে আসে তার এক বন্ধু। খবর দেয়, রেললাইনের ওপাশে অর্থাৎ দিয়াড় বাঘইল গ্রামে কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য এসেছে। কিছু রাজাকারসহ। তারা মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। খাওয়ার জন্যে একটি খাসিও।

হানাদারদের ধরে-নিয়ে-আসা মেয়েছেলে ছিলো অবশ্যি শুধু একজন। রাজিয়া খাতুন। আবু হেনা বা তার বন্ধুর তা জানা থাকার কথা নয়। তার দরকারও ছিলো না। মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, শুধু এই খবরই আবু হেনার জন্যে যথেষ্ট। সে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটিতে খবরটা দিয়ে আসা দরকার।

কিন্তু এমনি ঘটনাক্রম, ঠিক এই সময়ই রেললাইনের ওপর একজন হানাদারকে দেখা যায়। তার হাতের দড়িতে বাঁধা একটি ছাগল। আবু হেনার বুঝতে বাকী থাকে না, তার বন্ধু এই লোকটি আর তার দলবলের কথাই বলছিলো। কিন্তু সে আর কিছুই করবার সময় পায় না।

হানাদারটি আবু হেনাকে দেখে হাত ইশারায় ডাক দেয়। আবু হেনা বুঝতে পারে, লোকটির মতলব খারাপ। তবু সে ভয় পায় না, লোকটির কাছে এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হানাদারটি তাকে প্রশ্ন করে, তুমি কে?

তার ভাষা ছিলো উর্দু। সে-ভাষার সাথে আবু হেনার পরিচয় নেই। পাকশী-ঈশ্বরদীর বিহারীদের মুখে শোনা দুই-একটি উর্দূ শব্দ অবশ্যি সে বুঝতো। কিন্তু সেই সব শব্দও এখন তার কোনো কাজে লাগে না। সে তাই চুপ করে থাকে।

হানাদারটি এরপর জানতে চায়, তুই কি মুক্তিফৌজের চর?

আবু হেনাকে এবারও চুপ করে থাকতে হয়। উত্তর দেওয়ার শব্দটব্দ তার

জানা নেই বলে।

হানাদারটি তখন রীতিমতো ক্ষেপে যায়। তার মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে, আবু হেনা মুক্তিবাহিনীর গুপ্তচর।

এই সময় আর একটি হানাদার সেখানে আসে। রেললাইন পার হয়ে। সে-লোকটি দেহে একেবারে দৈত্যের মতো। সেখানে এসে সেও আবু হেনাকে জেরা শুরু করে।। সেই সঙ্গে তার ঘাড়, কাঁধ, কনুই, হাঁটু ইত্যাদি টিপে টিপে দেখতে থাকে। সে মুক্তিযোদ্ধা, এই সন্দেহে। আবু হেনা বয়েসে কিশোর হলেও সাহসী। সে তাই এমনি পরীক্ষার সময়ও নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর একজন হানাদার তাকে প্রচণ্ড জোরে এক চড় মারে। সে এমনি চড় যে, আবু হেনার মতো স্বাস্থ্যবান ছেলেও দু'চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে।

চড়ের পর আবার শুরু হয় জেরা,–তুই কে, সত্যি করে বল্ ইত্যাদি।

এরপর দ্বিতীয় হানাদারটি প্রথমটিকে কি যেন বলে। আবু হেনা তার এক বর্ণও বুঝতে পারে না। শুধু দেখে, তার কথা শেষ হতেই সে আবু হেনার হাঁটুতে বুট-পরা পায়ের এক লাথি ঝাড়ে।

সেই আঘাতে সে মাটিতে পড়ে যায়। ব্যথায় কাৎরে ওঠে। হানাদার দুটি কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। তাকে একের পর এক লাথি মারতেই থাকে। শুধু হাঁটুতে নয়, শরীরের সব জায়গায়। তাতে আঘাতের জায়গাগুলো কেটে ছিঁড়ে যায়, জখম থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। পশুগুলোর তাতেও সাধ মেটে না। এক সময় একজন বন্দুক তুলে তার দিকে তাক করে, তাকে একদম শেষ করে ফেলবে বলে।

কিন্তু আবার ঘটে এক আকস্মিক ঘটনা। বন্দুকধারী ট্রিগারে টিপ দেওয়ার আগেই হার্ডিঞ্জ ব্রীজের দিক থেকে দৌড়ে আসে এক হানাদার। রীতিমতো হন্তদন্ত হয়ে। আগেকার হানাদার দুটি সঙ্গে সঙ্গে আবু হেনাকে ছেড়ে দিয়ে নবাগতকে স্যালুট করে। অর্থাৎ সে তাদের অফিসার।

নবাগত লোকটি এসেই আগেকার দুজনকে খুব দ্রুত কি যেন নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ শোনা মাত্র তারা আবু হেনা আর ছাগলটাকে ফেলে রেখে পাকশীর দিকে ছুটতে শুরু করে। একেবারে ঝড়ের বেগে। অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে, রেললাইনের ওপর দিয়ে। আবু হেনা তখন রেললাইনের ধারে পড়ে-থাকা পাথরের ওপর শুয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

এমনিভাবে পড়ে ছিলো সে অনেকক্ষণ। তারপর গ্রামের লোকজন খবর

পেয়ে তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। আবু হেনাকে যে মেয়েছেলে আর ছাগল ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর দেয়, সে বেশীক্ষণ থাকেনি। প্রথম হানাদারটি আসবার আগেই সরে পড়েছিলো।

আবু হেনার ভাগ্য ভালো, সবুট পায়ের বেড়ধক লাথি খাওয়া সত্ত্বেও তার হাত-পা ভাঙেনি। তবে, তাকে কয়েক দিন বিছানায় পড়ে থাকতে আর চিকিৎসা করাতে হয়েছিলো। তারপর থেকে সে সম্পূর্ণ সুস্থ।

চাষী ঘরের ছেলে আবু হেনা এখন আর চাষী নয়। পৈতৃক পেশা ছেড়ে সে ব্যবসা ধরেছিলো। নিজের চেষ্টা আর কর্মদক্ষতার গুণে এখন সফল ব্যবসায়ী। সে ধানচালের কারবার করে। মোটামুটি হিসেবে সুখীও বটে।

রাজিয়া খাতুনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার দিন সে যদি মুক্তিবাহিনীকে খবর দেওয়ার সুযোগ পেতো, তাহলে হয়তো তিনিও আজ সুখে থাকতে পারতেন। কিন্তু আবু হেনার সামনে হানাদারদের আকস্মিক আবির্ভাব ছিলো মূর্তিমান শনির মতো। তাঁর সব কিছুই তা বরবাদ করে দেয়।

জীবনের মহাদুর্যোগের সময় তিনি সব কিছু হারালেও তাঁর ছেলেমেয়েরা কোনো ক্রমে বেঁচে যায়। অনেক সংগ্রাম করে বড়োও হয়। এখন তারা সংসারীও। কিন্তু আর্থিক দিক থেকে দুঃস্থ। মায়ের চিকিৎসার জন্যে কিছুই করতে পারেনি। সরকার এবং জনসাধারণ তো বরাবরই ছিলো—এবং আজও রয়ে গেছে—নিষ্ক্রিয় দর্শক।

রাজিয়া খাতুনের এই দশার জন্যে যারা দায়ী, সেই রাজাকারদের কেউ কেউ এখনো খোশ তবিয়তে বেঁচে আছে। তাদের সগোত্র কিছু লোকও। তারা এখন তাঁকে এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখে হাসে। যেমন হেসেছিলো একাত্তরের জুলাইতে।

রাজাকারের রাজাগিরি

তা–রাজাকারদের তো হাসবারই কথা। 'একাত্তরে হানাদারদের হাতে তাদের যেভাবে জন্ম এবং দুধে ভাতে লালন, তাতে তারা নিজেদের এক–একজন রাজা বলেই ধরে নিয়েছে এবং সেই মতোই আচরণ করেছে। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে। সেখানে তারাই তখন শাসক, সকল কর্মের নীতিনির্ধারক এবং যাকে খুশি, তাকে দণ্ডদানের কর্তা।

তাদের জন্মের সূচনা ২৫ মার্চের পর হানাদারদের পক্ষে দালালিতে। সেখান থেকে তাদের সংগঠিত করবার কাজ কবে শুরু হয়, তারিখ দিয়ে বলা যাবে না। তবে, প্রমাণ মেলে, কাজটা মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শুরু থেকেই চলছিলো। তলে তলে তো বটেই, প্রকাশ্যেও। 'একাত্তরের মাঝমাঝি হানাদাররা প্রচুর পোষা কুকুর পেয়ে যায়। সম্ভবতঃ তখনই তারা জীবগুলোকে বিধিবদ্ধ লালনের আওতায় নিয়ে আসবার প্রয়োজন অনুভব করে। তাদের তখন বিশ্বাস, জীবগুলোর সহায়তায় এদেশে তাদের হানাদারি চিরস্থায়ী হবে। সেই বিশ্বাসের বশে তারা একটি ম্যানুয়াল তৈরি করে ফেলে। আমার একবার সরকারী কাজে হঠাৎ এই ম্যানুয়ালের পাণ্ডুলিপি দেখবার সুযোগ হয়। সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাসে। অতি দ্রুত হাতে তার পাতা ওলটানোর সময় যে কটি বিষয়ের ওপর আমার চোখ পড়ে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রাজাকারদের দেয় সুযোগ–সুবিধার কথা। রাজাকার ম্যানুয়ালের এই অধ্যায়টির কয়েকটি কথা ঃ তাদের সবাইকে অস্ত্রশস্ত্রে ট্রেণিং এবং অস্ত্র দেওয়া হবে, তারা নিয়মিতভাবে মাইনে এবং র‍্যাশন পাবে, তাদের মধ্যে কেউ পরীক্ষার্থী থাকলে সে পরীক্ষা না দিলেও তাকে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করতে হবে, যুদ্ধের পর তাদের পড়াশোনা তথা চাকরিবাকরির নিশ্চয়তা থাকবে ইত্যাদি।

এতো দুধ–ভাত পাওয়ার পরও কি কেউ নিজেকে রাজা না ভেবে পারে?

পারেনি যে, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সারা বাংলাদেশে। একজন মানুষ গোটা জীবন তাদের কাহিনী লেখায় কাটিয়ে দিলেও বোধ হয় শতাংশের একাংশও লেখা হবে না। আমার পক্ষে তো পর্যাপ্ত নমুনা দেওয়াও সম্ভব নয়। আমি তাই কথাপ্রসঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে তাদের শুধু দুই–একটি কীর্তির কথা বলবো, যেমন বলেছি দুর্ভাগিনী রাজিয়া খাতুনের কাহিনীতে।

তাঁর প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে তাঁর বাপের বাড়ীর গ্রাম দিয়াড় বাঘইলের এক

নিরীহ সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনার কথা। যিনি প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন হেড মাস্টার কাইয়ুম সাহেব আর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আতিয়ার রহমানের মতো প্রায় অলৌকিকভাবে।

এই মানুষটির নাম (হাজী) ওয়াহেদ আলী প্রামাণিক।

১৯৯০ সালে প্রয়াত, তিনি পেশায় ছিলেন রেলওয়ের চাকুরে। ইঞ্জিনের ড্রাইভার। তাঁর ঘটনাটি 'একাত্তরের এপ্রিল মাসের। ঘটনার দিন তাঁর ডিউটি ছিলো—ভেড়ামারা স্টেশন থেকে একখানি ইঞ্জিন নিয়ে আসা। পাকশীতে এসে ইঞ্জিন থামিয়ে তিনি নেমে পড়েন। বিশেষ দরকারে বাড়ী যাবেন বলে। তাঁর বাড়ী স্টেশনের কাছেই।

কিন্তু তিনি বাড়ীর দিকে রওনা হতেই স্থানীয় কয়েকজন রাজাকার এসে তাঁর পথ আটকায়। বলে, আমাদের কিছু মাল আর দুজন লোককে ঈশ্বরদীতে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

রাজাকারদের মালামাল বস্তায় ভরা ছিলো। বস্তার দিকে চেয়ে ওয়াহেদ আলীর মনে একটা সন্দেহ উঁকি দেয়। সেটা চেপে রেখে তিনি শান্ত গলায় বলেন, এখন তো আমার পক্ষে ঈশ্বরদী যাওয়া সম্ভব নয়। বাড়ীতে বিশেষ দরকার আছে।

ঃ না, তোমাকে যেতেই হবে।

ওয়াহেদ আলীর সন্দেহটা তখন পাকা হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন, রাজাকারদের বস্তায় আছে লুটের মাল এবং অবৈধ অস্ত্র। তবু বলেন, বস্তায় কি আছে?

ঃ তাতে তোমার কি দরকার?

ওয়াহেদ আলীর এবার সাফ জবাব, না বললে আমি ওসব নিয়ে যাবো না।

তাঁর কথা শুনে দুজন রাজাকার মারমুখো হয়ে ওঠে, যাবিনে? তাহলে আয়, দেখাচ্ছি মজা। কেমন করে যাওয়াতে হয়, দেখিয়ে দিই।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় প্রৌঢ় ওয়াহেদ আলীর ওপর সরাসরি শারীরিক হামলা। তাঁর প্রতিরোধের জবাব। কিল, চড়, লাথি, ঘুষি ইত্যাদি। তবু ওয়াহেদ আলী অনড়। তিনি কিছুতেই ইঞ্জিন নিয়ে ঈশ্বরদী যাবেন না।

সুতরাং প্রহার চলতেই থাকে। ফলে, এক সময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

একটু পরই একখানা মিলিটারী জীপ এসে দাঁড়ায় তাঁদের কাছে। তার

আরোহী হানাদাররা রাজাকারদের কাছে সব শুনে এবং ওয়াহেদ আলীর অবস্থা দেখে ভাবে, তিনি খতম হয়ে গেছেন। সুতরাং মালামাল নিয়ে বসে থাকা বৃথা। তারা বস্তা আর রাজাকারগুলিকে জীপে উঠিয়ে ঈশ্বরদী চলে যায়।

বেহুঁশ ওয়াহেদ আলী তারপর একাই পড়ে থাকেন। সাহস করে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষে না। শেষ পর্যন্ত, অনেকক্ষণ পর, রেলওয়ের একজন কুলি ভয়টয় ঝেড়ে ফেলে গুটিগুটি তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন। দেখেন, তাঁর প্রাণ তখনও বেরিয়ে যায়নি। সুতরাং তৎক্ষণাৎ শুরু করেন তার সাধ্যমতো সেবা-শুশ্রূষা।

সেই সেবা-শুশ্রূষায় আস্তে আস্তে ওয়াহেদ আলীর জ্ঞান ফেরে এবং ক্রমে তিনি একটু সুস্থ হয়ে ওঠেন।

তারপর তাঁকে বাড়ী পৌছিয়ে দেওয়া হয়।

হ্যাঁ, তিনি বাড়ী পৌছন! বেদম শারীরিক নির্যাতনের পরও প্রাণে রক্ষা পান বলে। এবং–তিনি ভাগ্যবান,–তারপরও বেঁচে ছিলেন বিশ বছর।

বাইয়ারার জ্যান্ত শহীদ

হ্যাঁ, ওয়াহেদ আলী প্রামাণিক সত্যিই ভাগ্যবান। নইলে কি রাজাকার নামক হিংস্র পশুদের কবলে পড়বার পরও, মৃত বলে পরিত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিশটি বছর বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতে পারেন?

কিন্তু তাঁর মতো ভাগ্যবান কয়জন মেলে? রাজাকারের হাতে পড়বার পরও বেঁচে থাকা কি সোজা কথা? তখনও যে টিকে থাকে, তার দশাটা কেমন হয়? সেটা জানে কেবল ভুক্তভোগী। বাঘে ছুঁলে যেমন আঠারো ঘা, তেমনি রাজাকারে ছুঁলেও আঠারো ঘা নিয়ে যাঁরা বেঁচে ছিলেন বা এখনো আছেন,–তাঁদের জীবন্মৃত ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

যেমন রাজ্জাক চৌধুরীকে।

আমি বলছি কুমিল্লা জেলার সাবেক লাকসাম—বর্তমান নাঙ্গলকোট উপজেলার ৭নং জোড্ডা ইউনিয়নের বাইয়ারা গ্রামের মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক চৌধুরীর কথা। তিনি আজ বিশ বছর পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছেন।

'একাত্তরে হানাদাররা তাঁর আয়ের মূল উৎসটি ধ্বংস করে দেয়, রাজাকাররা তাঁকে করে ফেলে পঙ্গু। তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর দুঃসহ যন্ত্রণার জীবন। নিজের চিকিৎসায় আর সাতটি মেয়ে এবং দুটি ছেলের সংসার টানতে গিয়ে প্রায় সর্বস্ব খুইয়ে এখন তিনি জীবনের প্রতিও বিতৃষ্ণ। ঘাড়ে এখনো চারটি ছেলেমেয়ের দায়। তার ওপর, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণের বোঝা।

১৯৯১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ ছিলো। তারপর কি এক রহস্যময় কারণে এই যোগাযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি আমার চিঠি পান না, আমি তাঁর চিঠি পাইনে। জানিনে, চুয়ান্ন বছরের অসহায় মানুষটির তখন কি হাল ছিলো।

গত ৩১ মার্চ এক চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন, 'বর্তমানে অনাহারে অর্ধাহারে আমার জীবন অতিবাহিত হইতেছে। পরিবারের প্রতিটি লোক আজ আমার পরম শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। আমি পরিবারের সকলের কাছে বোঝা স্বরূপ। কেউ আমাকে ভাল চোখে দেখছে না।...মাঝে মাঝে নিজেকে অক্ষম ভেবে এক দিকে চলে যেতে ইচ্ছে হয়।'

অথচ একদিন তাঁর কী না ছিলো, তিনি কী না ছিলেন! প্রথম বয়েসে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলেন এক সমৃদ্ধ ফার্মেসি। তখন তাঁর পকেটে সব সময় দুই–এক হাজার টাকা থাকতো। নিজের উদ্যোগে কিছুটা চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করে হাতুড়ে ডাক্তার হয়ে বহু গরীব–দুঃস্থ রোগীর সেবা করেছেন সুনামের সাথে। ছোটোবেলায় ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। তরুণ বয়েসে তাঁকে ধরে নাটকের নেশা। জীবনে মোট উনত্রিশটি নাটকে অংশ নিয়েছেন। সমাজসেবার নেশাও ছিলো তাঁর মজ্জাগত। তার কারণে ইউনিয়ন পরিষদ আর রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁর এলাকার হাই ইস্কুল আর প্রাইমারী ইস্কুলের সভাপতি আর সহ–সভাপতি, ইউনিয়ন মালটি পারপাস সমিতির সাধারণ সম্পাদক বা পরিচালক, ইউনিয়ন কৃষক সমবায় সমিতির সংগঠক তথা সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়ন নওজোয়ান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আর সভাপতিও।

তবে, তাঁকে সবচেয়ে সক্রিয় দেখা গেছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। তিনি তাঁদের

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা–সাধারণ সম্পাদক। থানা আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস–প্রেসিডেন্ট এবং জেলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পর তাঁকে দেখা যায় ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমিটির কমাণ্ডার এবং থানা আর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমিটির সদস্য রূপে।

সব মিলিয়ে এই সেদিন অবধি তিনি তাঁর এলাকায় পরিচিত ছিলেন টগবগে রক্তের মানুষ হিসেবে। বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক আর মুক্তিযোদ্ধা জীবনের কাজকর্মের কারণে। রাজ্জাক চৌধুরীর এই দুই জীবন মিলিতভাবে রীতিমতো এক নাটকের মতো। কিংবা বলা যায়, চাঞ্চল্যকর ঘটনায় ভরা এক উপন্যাস।

তিনি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন কৈশোরে। এতে ব্যয় করেছেন চুয়ান্ন বছরের জীবনের বিয়াল্লিশটি বছর। এই বিয়াল্লিশ বছরে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ নেন। ’বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তাঁর এলাকায় তাঁর ভূমিকা ছিলো বিশিষ্ট। ১৯৫৪ সালে, যখন তাঁর বয়েস মোটে ষোলো বছর, সাধারণ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের স্থানীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে তিনি রীতিমতো এক নেতা। তাঁর বাবা ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। তার ফল, তাঁকে হতে হয় ত্যাজ্যপুত্র! তার পরও আসে নানারকম চাপ। তবু তিনি তাঁর পথ ছাড়েননি। তাঁর সহকর্মীদের চেষ্টায় তাঁদের প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, কিশোর রাজ্জাক চৌধুরীর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন তাঁদের এলাকার প্রখ্যাত রাজনীতিক জনাব আবদুল আউয়াল এবং আলহাজ্ব জালাল আহমদ।

ছয় দফার আন্দোলন যখন শুরু হয়, তিনি তাতেও জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৮ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে তাঁর ইউনিয়নে তিনিই নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনের শেষ দিকের সংগ্রামে জোড্ডা ইউনিয়নের শ্রীহাস্য গ্রামে একজন ওসি এবং পাঁচজন পুলিশ তথা সেপাই মারা পড়ে।

এই সব আন্দোলন আর সংগ্রামের সময় রাজ্জাক চৌধুরী থেকেছেন প্রায় নেশাগ্রস্তের মতো। তখন তাঁর অধিকাংশ সময় কাটতো গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে রাজনৈতিক প্রচারের কাজ করে আর মীটিংয়ে মিছিলে অংশ নিয়ে। নাওয়াখাওয়ার কথা যথাসময়ে মনে পড়তো না, সংসার বা আত্মীয়–স্বজনের দিকে তাকানোর অবকাশ মিলতো না। তিনি জীবনের সার জেনেছেন কেবল রাজনীতি তথা রাজনৈতিক সংগ্রামকে।

তারপর এলো আর এক সংগ্রাম—মুক্তিযুদ্ধের ডাক।

একে নাচুনে বুড়ী, তায় ঢোলের বাড়ী। সারা জীবন স্বাধিকার আন্দোলনে শরীক, রাজ্জাক চৌধুরী কি আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন? ২৫ মার্চ পাকিস্তানী হানাদারদের দ্বারা এদেশে জাতি নির্যাতন শুরু হতেই তিনি চঞ্চল হয়ে পড়েন। সুযোগ খুঁজতে থাকেন মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার।

সেই সুযোগ আসে ২০ এপ্রিল। তিনি ভারতে চলে যান। এবং ২২ এপ্রিলেই শুরু হয় তাঁর ট্রেণিং। আগরতলার কাঁঠালিয়া–রাধানগর ক্যাম্পে। ওটা ২নং এফ. এফ. সেক্টরের অধীন। পনেরো দিনের ট্রেণিংয়ের পরই তিনি হন নিয়মিত যোদ্ধা। তাঁর সেক্টরে কমাণ্ডার ছিলেন মেজর হায়দার, গ্রুপ কমাণ্ডার এফ. এফ. মোহাম্মদ এসহাক মিয়া।

তাঁর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় অবশ্যি ভারতে যাওয়ার আগেই। ২৮ মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে তাঁদের একটি দলের প্রায় এক ঘন্টা যুদ্ধ হয়। কিন্তু তখন তাঁরা ভালোভাবে সংগঠিত নন। এ–কারণে তাঁরা শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হন।

মার্চের শেষ এবং এপ্রিলের প্রথম দিকে বহু বাঙালী সৈন্য ই.পি.আর., পুলিশ, আনসার এবং দেশপ্রেমিক অন্যান্য মানুষ পাকিস্তানীদের চলাচলের পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। সেসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলো পুল এবং কালভার্ট উড়িয়ে দেওয়া। রাজ্জাক চৌধুরী সে–সময় ওই প্রতিরোধকর্মীদের দলে চলে যান। নাথের পেটুয়া আর বিনয়ঘরের পুল উড়িয়ে দেওয়ার কাজে তাঁর একটি বড়ো ভূমিকা ছিলো।

২৪ জুন তাঁরা অপারেশনে যান বিনয়ঘর আর কাঁচি নামে একটি জায়গায়। তাঁদের কাজ ছিলো হানাদার বাহিনীর চলাচলের পথে মাইন পুঁতে আসা। তাদের মাইনের ঘায়ে হানাদারদের একখানা গাড়ী নষ্ট হয় আর ছয়জন হানাদার মারা যায়।

ইতিমধ্যে দুর্দম রাজনৈতিক কর্মী আর দুর্দান্ত স্বাধীনতাসংগ্রামী রাজ্জাক চৌধুরীকে ধরবার জন্যে হানাদার বাহিনী আর তাদের সহযোগীরা মরিয়া হয়ে ওঠে। এমনকি, একটি বিশেষ অপারেশনেরও ব্যবস্থা করে। সেটি হল বাইয়ারা বাজার অপারেশন। যার প্রথম লক্ষ্য রাজ্জাক চৌধুরী। এবং তারপর তাঁর ঘরবাড়ী আর ওষুধের দোকান। সেদিন অপারেশনে আসে হাসানপুর আর নাঙ্গলকোট ক্যাম্পের পুরুষ্টু এক দল পাকিস্তানী সৈন্য। কিছু রাজাকার সঙ্গে নিয়ে, সুবেদার আকবর হায়দারের নেতৃত্বে। রাজাকারদের সঙ্গে আনার উদ্দেশ্য, তারা রাজ্জাক

চৌধুরীকে সনাক্ত করবে। তাদের আয়োজনেও কোনো ত্রুটি ছিলো না। তাঁকে ধরবার জন্যে পরিকল্পনা মাফিক তারা প্রথমেই তাঁর বাড়ীসহ গোটা বাইয়ারা বাজার ঘিরে ফেলে। তারপর শুরু হয় তল্লাশি। সম্ভব অসম্ভব সকল জায়গায়। কিন্তু সব বৃথা। 'অপরাধী'–র সন্ধান কোথাও মেলে না। এমনকি, তাঁর বাড়ীর লোকজনও উধাও।

এই অভিনব অভিযানের ব্যর্থতার পর হানাদার আর তাদের দোসরদের সব আক্রোশের লক্ষ্য হয় তাঁর ওষুধের দোকান আর বাড়ী। দোকানের ঘরটির কথা বাদ যাক, তার ভেতরে তখন ছিলো প্রায় এক লাখ টাকার ওষুধ এবং আসবাবপত্র। হানাদাররা সব পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। তাঁর ওষুধের ব্যবসার জন্যে সংগৃহীত ড্রাগ এবং পয়জন লাইসেন্সটিসহ।

ওদিকে, তাঁর বাড়ীতে চলে বর্গীসুলভ লুটপাট। তাতে তাঁর সারা জীবনের স্থাবর–অস্থাবর সঞ্চয়–সোনাদানা, গয়নাগাটি, টাকাপয়সা, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য জিনিষ,–কিছুই বাদ যায় না। কিন্তু তাও যেন যথেষ্ট নয়। লুটেরার দল এরপর ঘরের ভেতর তিন ফুট গর্ত করে কাঁটা দিয়ে ভরে রাখে। যাতে রাজ্জাক চৌধুরী বা তাঁর পরিবারের কেউ ঘরে ঢুকতে না পারেন। সবশেষে তারা জারি করে একটা পরোয়ানা, স্থানীয় জনসাধারণের উদ্দেশে ঃ রাজ্জাক চৌধুরী আর তাঁর পরিবারের লোকজনকে ধরিয়ে দাও। তাদের হানাদার ক্যাম্পে পৌছিয়ে দিতে পারলে ইনাম যাওয়া যাবে।

এই ঘোষণায় অবশ্যি কোনো ফল হয়নি। এদিকে, রাজ্জাক চৌধুরী এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিলো আগে থেকেই। তাঁরা তাই শুধু বাড়ী নয়, নিজেদের এলাকা ছেড়েই সরে পড়েন।

রাজ্জাক চৌধুরী তখন ছিলেন নোয়াখালি জেলার সেনবাগ থানায় কোশারপাড় নামে একটি জায়গার আশ্রয় শিবিরে। তাঁদের মুক্তিদল সেখানে শ্রমিক নেতা রুহুল আমিন ভূঁইয়ার অধীন। ৫ জুলাই থেকে তাঁরা নানান জায়গায় হানাদারদের সাথে গেরিলা যুদ্ধ করে বেড়ান। এই সব অপারেশনের জায়গাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ছতারপাইয়া, সেনবাগ আর কানকৈরহাট।

তিনি শেষ বার অপারেশনে যান বিরামপুর নামে একটি জায়গায়। এর কাছেই বিপুলাশহরে ছিলো হানাদার তথা রাজাকারদের একটা বড়ো এবং শক্ত ঘাঁটি। একদিন, ১১ জুলাই, তাঁরা খবর পান, সেই ঘাঁটির পশুরা বিরামপুরের হিন্দুদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিচ্ছে আর জিনিষপত্র লুট করছে। খবর পেয়েই দলবলের সাথে তিনি ছুটলেন অকুস্থলের দিকে।

তারপরই ঘটে বিপত্তি। তাঁর জীবনের মর্মান্তিকতম ঘটনাটি। বিরামপুরে হানাদারদের মোকাবেলা করবার এক পর্যায়ে তাঁর সহযোদ্ধারা সরে পড়ে। রাজ্জাক চৌধুরী আত্মরক্ষার সুযোগটিও পান না। তাঁর একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে রাজাকাররা তাঁকে ধরে ফেলে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ওপর শুরু করে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন। যার ফলে তিনি অচিরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

রাজাকাররা তখন তাঁকে মৃত ভেবে নির্যাতনে ক্ষান্ত দিয়ে সরে যায়। যেমন গিয়েছিলো ড্রাইভার ওয়াহেদ আলী প্রামাণিকের নির্যাতনকারী রাজাকাররা, তাঁকে মৃত ভেবে। জ্বালাও পোড়াও, লুটতরাজের অভিযান কিছুক্ষণ পর থেমে যায়। তখন কয়েকজন গ্রামবাসী ঘুরতে ঘুরতে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ায়। তাঁর সঙ্গীরাও ফিরে আসে। তারপর দুই দলে মিলে তাঁকে নিয়ে যায় তাঁদের ক্যাম্পে। তখনও তিনি অচেতন।

তাঁর চিকিৎসা শুরু হয় ক্যাম্পেই। এবং তা চলে দীর্ঘ দিন। কিন্তু দুঃখের কথা, তাতে ফল মেলে সামান্যই। এতো দিনের চিকিৎসার পরও দেখা যায়, তাঁর দেহের কোমর থেকে নীচের অংশটা অসাড়। রাজাকারদের নির্যাতনে ওদিকটায় আর কিছু ছিলো না। পা দুখানা বলতে গেলে একেবারে চুরমার হয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি চিকিৎসার জন্যে ঢাকায় চলে আসেন। প্রথমে ভর্তি হন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, তারপর পি.জি.তে, শেষে সোহ্‌রাওয়ার্দীতে। সব জায়গায়ই চিকিৎসা করিয়েছেন নিজের খরচে, অনেক দিন। কিন্তু কোনো হাসপাতালেই কোনো ফল পাননি।

এরপর, ৫ অক্টোবর, চিকিৎসা এবং সাহায্যের জন্য তিনি আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ত্রাণ আর পুনর্বাসন মন্ত্রীর কাছে। তাতে সাড়া মেলে। বঙ্গবন্ধুর চেষ্টায় এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবদুল মান্নানের সাহায্যে তাঁকে পাঠানো হয় পঙ্গু হাসপাতালে, ডাঃ গাস্টের কাছে। সেখানেও চিকিৎসা চলে দীর্ঘ দিন। প্রায় আড়াই বছর। তখন পঙ্গু হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাঁর দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন, তাঁর অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্যে নানাভাবে চেষ্টাও করেছেন। তবে, সেসবে আন্তরিকতা কতোখানি ছিলো, তাঁরাই জানেন। রাজ্জাক চৌধুরী কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠেননি। তারপর, জাতির জীবনে যখন আর এক কালো রাত্রি নেমে আসে, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাত্রে যখন বঙ্গবন্ধু নিহত হন এবং দেশের রাজনীতিতে পট পরিবর্তন ঘটে, তখন রাজ্জাক চৌধুরীর চিকিৎসায়ও পরিবর্তন আসে। পঙ্গু হাসপাতালের ডাক্তাররা তাঁর দিকে আর

আগের মতো মনোযোগ দেননি।

রাজ্জাক চৌধুরীর পুঁজিপাটা তখনও কিছুটা ছিলো। প্রাণের দায়ে তিনি তাই আবার ব্যক্তিগত ব্যয়ে চিকিৎসার উদ্যোগ নেন। কিছু দিন পর পঙ্গু হাসপাতালের ডাক্তার তালুকদার সাহেব তাঁর একখানি পায়ে অপারেশন করেন। তাতে বহু টাকা লেগে যায়। তারপর অন্য পায়ে অপারেশন করাবার মতো আর্থিক ক্ষমতা তাঁর আর ছিলো না। বাধ্য হয়ে, অসীম ক্ষোভে আর হতাশায়, তিনি হাসপাতাল থেকে চলে আসেন। তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র সেইখানেই ফেলে রেখে।

কিন্তু ক্ষোভই বলুন আর হতাশাই বলুন, সেসব তো শেষ পর্যন্ত প্রাণের দায়কে ছাপিয়ে উঠতে পারে না। রাজ্জাক চৌধুরী তাই আবার সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাতে শুরু করেন। প্রথমে দ্বারস্থ হন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের। সাড়া মেলেনি। তখন একে একে লিখলেন জিয়াউর রহমান, এরশাদ, (তখন প্রধানমন্ত্রী) মীজানুর রহমান চৌধুরী এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীকে। সবাই নীরব। শেষ ভরসা ছিলো মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট। তারা অবশ্যি একটুখানি সাড়া দেয়। 'নব্বুইয়ের অক্টোবরে একটা ইনকোয়ারি করে। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। এ-বছর জানুয়ারি মাসে দুটি দৈনিক পত্রিকায় তাঁর জীবনকাহিনী এবং একখানি দৈনিক পত্রিকায় তাঁর অসহায়ত্বের কথা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেসব তো কেবল খবর, শুধু পড়বার জন্যে।

রাজ্জাক চৌধুরী সম্পর্কে কিন্তু এই সবই শেষ কথা নয়। তিনি জন্মেছিলেন জীবনের অমিত সম্ভাবনা নিয়ে। রাজাকাররা সেই সম্ভাবনাকে হত্যা করে তাঁকে দিয়েছে অশেষ যন্ত্রণা, অপরিসীম ক্ষোভ আর হতাশা। তবু তিনি একেবারে ফুরিয়ে যাননি : তাঁর সম্পর্কে পাওয়া শেষ খবর পর্যন্ত জানি, জীবন্মৃত হয়েও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন প্রায় আগের মতোই সক্রিয়। এমনটি সম্ভব বুঝি কেবল অমিততেজ পুরুষের পক্ষেই। এবং তাঁর পক্ষে, যাঁর ভেতর থাকে অনলস প্রাণশক্তি আর প্রবল প্রতিবাদী চেতনা।

সাইজ্যা মিয়া কোথায় গেলেন

কিন্তু কেবল রাজ্জাক চৌধুরীর প্রাণশক্তি আর প্রতিবাদী চেতনার কথা বলি কেন? ও–দুটি তো প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাঙালীরই অস্তিত্বের অংশ, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে অমোঘ অস্ত্র। পাকিস্তানী হানাদার, রাজাকার আর তাদের দালাল সহযোগীরা এই অস্ত্রকেই ভয় করতো সবচেয়ে বেশী। এর অধিকারীকে বাগে পেলে তারা তাই উল্লসিত হয়েছে, বর্বরতম উদ্যমে তার অস্তিত্বে যতি টেনে দিয়েছে। ওয়াহেদ আলী–রাজ্জাক চৌধুরীদের বেলায়ও তো তাদের লক্ষ্য ছিলো এই–ই। তারা তাঁদের মৃত ভেবে সরে যায়, এটা কেবল তাদের হিসেবের ব্যতিক্রমী ভুল, অতি সতর্কতার মধ্যেও লক্ষ্যভ্রষ্টতার সামান্য উদাহরণ। নইলে তো সাইজ্যা মিয়ার মতো প্রাণশক্তিমান, প্রতিবাদী চেতনার অধিকারী মানুষটিকে বাংলাদেশ হারাতো না।

সাইজ্যা মিয়া যখন রাজাকারদের কবলে পড়েন, তখন তিনি অবশ্যি রাজ্জাক চৌধুরীর মতো তরুণ ছিলেন না। এমনকি, ওয়াহেদ আলী প্রামাণিকের মতো প্রৌঢ়ও। ছিলেন সত্তর বছর বয়েসের বৃদ্ধ। কিন্তু দেশদ্রোহী পশুদের কে কখন বয়েসকে সম্মান দেখিয়েছে? বিশেষ করে, বৃদ্ধকালে দেশদ্রোহের বিরুদ্ধে অমোঘ অস্ত্রধারী সাইজ্যা মিয়ার মতো মানুষদের?

আমি বলছি বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার অধীন উত্তর হাসসার্দি ইউনিয়নের হাসনাবাদ গ্রামের সাইজ্যা মিয়ার কথা। ওটা তাঁর গ্রামে প্রচলিত জনপ্রিয় নাম। শহীদ সাইজ্যা মিয়ার পোশাকী নাম ছিলো সাদুল্লাহ্ মিয়া।

তাঁর শাহাদাৎ বরণের করুণ কাহিনী আমরা প্রথম জানতে পাই ২২ জানুয়ারি, ১৯৭২–এ অধুনালুপ্ত দৈনিক 'পূর্বদেশ'–এর একটি প্রতিবেদন থেকে। প্রতিবেদক ছিলেন পত্রিকাখানির ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি।

এই প্রতিবেদক সাইজ্যা মিয়ার বড়ো ছেলে মোহাম্মদউল্লাহ্‌র কথার উদ্বৃতি দিয়ে জানান, সাইজ্যা মিয়াকে পশুরা মেরেছিলো স্থিরমস্তিষ্কে, তিনি তাদের প্রতিপক্ষের লোক ছিলেন বলে। তিনি তাঁর এলাকার বহু শহীদের একজন। সাদুল্লাহ্ মিয়া ছিলেন তাঁদের ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁকে অনেক অনাচার দেখতে হয়েছে, সইতে

হয়েছে প্রিয়জনবিয়োগের ব্যথা। তবু তিনি যুদ্ধের সফল ভবিষ্যতে আস্থা হারাননি কখনো। মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যে তাঁর বিশ্বাস ছিলো দৃঢ়, যেমন বিশ্বাস ছিলো জালেমদের অনিবার্য ধ্বংসে। ছেলে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে কখনো অধৈর্য হয়ে পড়লে বলতেন, আর দেরী নেই, দেশ স্বাধীন হবেই। তোরা কটা দিন কষ্ট করে বেঁচে থাক।

তাঁর সেই দৃঢ় বিশ্বাসে লালিত, গভীর আকাংক্ষায় প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা তাঁর কথাকে সত্যি বলে প্রমাণিত করে একদিন আসেই। অত্যাচারীদের অনিবার্য পতনও ঘটে, সাময়িকভাবে হলেও। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয়, অগ্নিপুরুষ সাইজ্যা মিয়া কিছুই দেখে যেতে পারেননি।

সাইজ্যা মিয়া ছিলেন ধার্মিক পুরুষ। নিয়মিত নামাজ পড়তেন, মসজিদের জামাত কখনো বাদ দিতেন না, মাথায় টুপি রাখতেন সব সময়। কিন্তু অন্তরে ছিলেন কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ। সেই সঙ্গে ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতি অতি বিরূপ। মানুষকে জানতেন কেবল মানুষ বলে। তার সেবায় কোনো পরিস্থিতিতেই ভয় পাননি।

২৫ মার্চের পর তাঁর গ্রামের হিন্দুরা সহজে ঘর থেকে বেরুতো না। পাক্কা মুসলমান সাইজ্যা মিয়া নোয়াখালীর মতো গোঁড়া ধর্মবাদী এলাকায় (লক্ষ্মীপুর তখন নোয়াখালীর অন্তর্গত) সৎ প্রতিবেশীর মতন তাদের খোঁজখবর নিয়েছেন, তাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। কারো ভ্রূকুটির তোয়াক্কা করেননি। এমনও দেখা গেছে, তাদের কারো বাঁশের দরকার পড়েছে শুনলে তিনি টুপি মাথায় নিজের বাঁশঝাড়ে গিয়ে ঢুকেছেন এবং সেখান থেকে বাঁশ কেটে সেই প্রতিবেশী হিন্দুর বাড়ীতে দিয়ে এসেছেন। শুধু তা-ই নয়। স্বাধীনতার প্রসঙ্গে নিজের ছেলেকে যেমন আশ্বাস দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন বিপন্ন প্রতিবেশী হিন্দুদেরও। তাদের তিনি বলতেন, তোমরা একটু সবুর করো। দিন আসবে, যখন মানুষের বড়ো পরিচয় হবে,—সে মানুষ। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান নয়।

এমন মানুষকে দেশদ্রোহীরা সুনজরে দেখতে পারে না, দেখেওনি।

তাঁর ওপর তাদের বিষনজর পড়তে শুরু করে অবশ্যি অন্য এক উপলক্ষে। মসজিদে তাঁর কিছু প্রতিবাদী কথার সময়। স্বাধীনতা যুদ্ধের গোড়ার দিক থেকেই গোঁড়া ধর্মবাদীরা—বিশেষ করে, জামাতে ইসলামীর লোকেরা মসজিদে জামাতের সময় মুসল্লীদের সামনে পাকিস্তানের পক্ষে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের

বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে শুরু করে। সাইজ্যা মিয়ার এটা ভালো লাগেনি। গ্রামের মসজিদে এক জামাতে তাদের এমনি প্রচার চালাতে দেখে, তিনি জোর গলায় প্রতিবাদ জানান, আপনারা মসজিদে রাজনীতি আনবেন না। 'পূর্বদেশ'-এর প্রতিবেদকের ভাষায়, 'তাঁর এই প্রতিবাদ থেকে শুরু হয় তাদের মধ্যে অন্তর্জ্বালা।'

সাইজ্যা মিয়া এ-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তার জন্যে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা বা রাজনৈতিক বিশ্বাস ছেড়ে দেননি। আগেই বলেছি, তাঁকে প্রিয়জনবিয়োগের ব্যথা সইতে হয়েছে। ওই দেশদ্রোহীদের কারণে। তবু তিনি নিজের বিশ্বাসে মতামতে থেকেছেন অটল।

তাঁর এই চরিত্র অবশ্যি মুক্তিযুদ্ধের ফল নয়। বলতে গেলে একেবারে সহজাত। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে সামাজিক-সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক রক্ষা তথা মানুষকে কেবল মানুষ বলে ভাববার ব্যাপারে। তিনি যে মন নিয়ে নিজের ঝাড়ের বাঁশ নিজে হিন্দুর বাড়ীতে দিয়ে এসেছেন, সেটা এক দিনে গড়ে ওঠে না। তবে, রাজনীতি তাকে লালিত এবং শাণিত করেছিলো। অবশ্যই এক সচেতনতা সহযোগে এবং সংগ্রামী প্রবণতা সহকারে।

এই কারণেই তিনি ছেলে মোহাম্মদউল্লাহ্‌কে তাঁর মনের মতো করে গড়ে তোলেন। একবার মোহাম্মদউল্লাহ্ এক সংগ্রামী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে গ্রেফতার হন এবং তাঁর সাড়ে তিন বছরের জেল হয়। সাইজ্যা মিয়া তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ করেননি। বরং তাকে মেনে নিয়েছেন গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পুরস্কার বলে। আর, তাই জেলখানায় যখন মোহাম্মদউল্লাহ্‌র টাকাপয়সার দরকার পড়তো, তিনি এমনকি জমি বিক্রি করেও সেই দরকার মেটাতেন।

এমনি চরিত্রের সাইজ্যা মিয়ার প্রতিপক্ষ-বিশেষ করে, যারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারবারী, তারা-সব সময় তক্কে তক্কে থাকতো, কিভাবে তাঁকে ফাঁদে ফেলা যায়। কিন্তু তিনি ছিলেন এলাকার সকল সুস্থবুদ্ধি মানুষের কাছে শ্রদ্ধাভাজন। প্রতিপক্ষ তাই তাঁর কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদারদের পৃষ্ঠপোষকতা তাদের জন্যে বিরাট এবং নিরাপদ এক সুযোগ এনে দেয়। যখন তিনি সদলে এবং সপরিবারে মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সমর্থক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য করেন।

তারা সুযোগটির প্রথম 'সদ্ব্যবহার' করে তাঁর জামাতার ওপর হামলার মাধ্যমে। একদিন কতকগুলি রাজাকার জামাতার ওপর চড়াও হয়। তারপর চলে

নির্মম দৈহিক নির্যাতন, তাঁর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের সামনে। সেই নির্যাতনে তিনি শহীদ হন। নরপশুরা অবশ্যি তাতেও তৃপ্তি পায়নি। তাঁকে হত্যা করবার পর তাঁর ঘরবাড়ী ধ্বংস করে ফেলে, বাড়ীর সমস্ত জিনিষ লুট করে নিয়ে যায়। তাঁদের বাড়ী ছিলো রায়পুরে।

হত্যাকাণ্ডটি যখন ঘটে, তখন অকুস্থলে জামাতার সন্তানদের মধ্যে ছিলো পাঁচ বছরের একটি ছেলে। সেই বীভৎস দৃশ্য, মানুষের অমানুষিক আচরণ ছেলেটিকে যেন অপ্রকৃতিস্থ করে ফেলে। অকুস্থল থেকে সে আর বাড়ী ফেরেনি, সবার অলক্ষ্যে এক সময় নিখোঁজ হয়ে যায়।

সাইজ্যা মিয়া তখন চট্টগ্রামে। খবর পেয়েই তিনি ছুটলেন রায়পুরের দিকে। বাহ্যিক এবং প্রথম উদ্দেশ্য অবশ্যই নাতিকে খোঁজা। কিন্তু সেই প্রচণ্ড শোকের সময়ও তাঁর আর একটি উদ্দেশ্য ছিলো। তাঁর পরিচিত কিছু গেরিলার জন্যে চিড়ে-গুড় জাতীয় শুকনো খাবার এবং অন্যান্য জিনিষ নিয়ে আসা। গেরিলাগুলিকে এটা আগেই জানানো হয়েছিলো।

কিন্তু রায়পুর অবধি পৌছনো তাঁর হয় না। তিনি আসছিলেন বাসে। সেই বাস যখন চৌমুহনীতে আসে, রেল ক্রসিংয়ের কাছে, কয়েকজন লোক বাসখানা থামিয়ে ফেলে। ভেতরে উঠে তাঁকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের কাছাকাছি। সহযাত্রীরা এই অনাসৃষ্টি গোছের কাণ্ড দেখে প্রশ্ন করে, এমন অসময়ে বুড়ো মানুষটিকে কোথায় নিয়ে যাবে? তোমরা কে?

উত্তর মেলেনি।

সাইজ্যা মিয়া কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন, তারা কে এবং কেন তাঁকে নিয়ে টানাটানি করছে। তবু তিনি জানতে চান, তাঁকে কেন নামতে হবে? তাঁর অপরাধটা কি?

এবার উত্তর মেলে। এলোমেলো কিছু কথার পর রাজাকারগুলি বলে, আপনি পরের বাসে যাবেন। এখন আমাদের সঙ্গে আসুন।

সাইজ্যা মিয়া আর কথা না বাড়িয়ে নেমে পড়েন।

তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ। লোকের মনে প্রশ্ন, তিনি কোথায় গেলেন?

বাড়ীতে যখন খবর পৌছয়, সবাই বুঝতে পারে, তাঁর কি হয়েছে। রাজাকারদের জাল বহু দূর অবধি ছড়ানো ছিলো। তিনি সেই জালে ধরা পড়েছেন। এবং তারপর –

মর্মান্তিক ব্যাপার, সন্দেহ নেই। এবং এর চেয়েও মর্মান্তিক ব্যাপার, অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও তাঁর কবর তো দূরের কথা, লাশটিরও কোনো সন্ধান

মেলেনি। তিনি নিখোঁজ হয়ে গেছেন একেবারেই।

কিন্তু – তাঁর মতো মানুষ কি সত্যিই একেবারে নিখোঁজ হয়?

সাইজ্যা মিয়ার বড়ো সাধ ছিলো, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখবেন। সে তো অনেক বড়ো ব্যাপার। তাঁর একটি স্থানীয় সাধও ছিলো। মেয়েদের জন্যে তাঁর এলাকায় একটি ইস্কুল দেওয়ার। তার জন্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাও তিনি প্রায় শেষ করে ফেলেছিলেন। বাকী কাজের ভার নেন তাঁর ছেলে মোহাম্মদউল্লাহ্।

এরপরও কি তিনি আমাদের কাছে নিখোঁজ থাকবেন? রাজাকারদের পরিহাসকে মর্মার্থে সত্যি বলে প্রমাণিত করে?

পরিহাস নানাবিধ

রাজাকারদের পরিহাস? হ্যাঁ, তারাও পরিহাস জানতো বটে, – যেমন জানতো আল–বদর, আল–শামস, হানাদারদের অন্যবিধ দালাল এবং সহযোগী আর খোদ দালালরাও। তারাও তো ছিলো 'মানুষ'! আর, পরিহাস তো 'মানুষ'–ই করে। এমনকি, কেবল পরিহাসের খাতিরেও, নির্বিকার মুখে। কিন্তু নির্মম মনে। চৌমুহনীর বাসে সাইজ্যা মিয়ার সাথে রাজাকাররা এমনি পরিহাসই করেছিলো। তারা তো তাঁকে ধরতে আসে রায়পুর অবধি যেতে না দেওয়ার মতলবে। তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলবার কুলক্ষ্য নিয়ে। অথচ বলেছিলো, আপনি পরের বাসে যাবেন।

'একাত্তরে পরিহাসের এমন ঘটনা যে কতো ঘটেছিলো, তার হিসেব নেই। তার ধরনও ছিলো নানারকম।

ডাঃ মিহির সেনকে হানাদাররা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। একথা জেনেও ঠগবাজ দালাল হক চাচা তাঁদের 'অভয়' দিয়ে বলেছে, কোনো ভয় নেই। যা ওদের সাথে। ওরা তোদের কিছু বলবে না।

তাঁর ছেলেমেয়েরা নানা কষ্ট সত্ত্বেও বেঁচে আছে দেখে,তাদের সম্পত্তির লোভে দালাল সিদ্দিক মিয়া বলে, তোরা এতো বড়ো হয়ে গেছিস! এখানে তো আর থাকতে পারবিনে। ভারতে চলে যা।

সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেনকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। মানুষটি ছিলেন অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির। রাজাকারদের কুকীর্তির কথাও জানতেন অনেক। সেই মানুষ সিগারেট সঙ্গে নিতে চাইলেন। তিনি সিগারেট খেতেন ঘন ঘন। তাঁর ইচ্ছেটার উত্তরে শুনলেন, কোনো দরকার নেই। যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে অনেক সিগারেট পাবেন।

বহু বাঙালীকে রাজাকার বা হানাদাররা ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় বলেছে, একবার ক্যাম্পে যেতে হবে। ভয়ের কিছু নেই। একটু পরই ফিরে আসবেন।

কিন্তু—এসব তো পরিহাসের সাধারণ উদাহরণ। বহুজ্ঞাত এবং বহুশ্রুত। এর ব্যতিক্রম যে অনেক দেখা গেছে, তাও আমরা জানি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম আবার হত রীতিমতো বিচিত্র। ত্রাস সৃষ্টি তথা মানসিক নির্যাতনের কারণে।

ঘটনাটি 'একাত্তরের এপ্রিল মাসের। অকুস্থল সিলেট শহর।

এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবার। কর্তা প্রবীর চৌধুরী। সরকারী চাকুরে। কর্মস্থল সিলেটেই, জেলা প্রশাসকের আদালতে। তখনও হিন্দুদের স্রোতের মতো দেশত্যাগ শুরু হয়নি। প্রবীর চৌধুরী বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলে নিয়ে সাহসে ভর করে সিলেটেই রয়ে গেছেন। ২৫ মার্চের পর তেমন কোনো অসুবিধায়ও পড়েননি।

কিন্তু এটা মাত্র কয়েক দিনের কথা। এপ্রিলের দু'চার দিন যেতেই শহরের এখানে সেখানে হানাদারদের ঘাঁটি বসতে থাকে। আবির্ভাব ঘটে দালাল তথা রাজাকার নামের এক শ্রেণীর আজব হিংস্র জীবের। হানাদারদের সহযোগিতায় তারা যখন তখন এর ওর ঘরে হানা দেয়। দেশের মুক্তিকামী তরুণদের সন্ধানে। দোষী–নির্দোষ বিচার নেই। তরুণ কাউকে পেলেই ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তার ওপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন চালায়। তার কাছ থেকে তাদের ইচ্ছেমাফিক 'স্বীকারোক্তি' আদায়ের চেষ্টা করে, তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়, সে জীবনে কখনো 'জয় বাংলা' বলবে না। অন্যথা ঘটলে শাস্তি অনিবার্য। জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে।

প্রবীর চৌধুরী সব শোনেন। এবং ভয়ে ভয়ে থাকেন। প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে

যতো দূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেন।

এমনি পরিস্থিতিতে একদিন মাঝরাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দে বাড়ীর সবাই ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। কড়া নাড়ার অর্থটি কারোই বুঝতে বাকী থাকে না। গৃহকর্ত্রী মেয়ে দুটিকে নিয়ে ঝটপট নিরাপদ গোছের জায়গায় আত্মগোপন করেন। প্রবীর চৌধুরী কম্পিত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেন।

দরজা খোলা পেতেই কয়েকজন রাজাকার–দালাল এবং হানাদার ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাদের সবার হাতেই অস্ত্র। একজন হানাদার প্রশ্ন করে, ঘরমে মুক্তি জোয়ান হ্যায়?

প্রবীর বাবুর বুকটা কেঁপে ওঠে। তাঁর ঘরে আঠারো বছরের ছেলে আছে। তার প্রাণ রক্ষার তাগিদে তিনি জবাব্ দেন, না, না, এখানে তেমন কেউ নেই।

এই সময় একটি ছোট্টো দুর্ঘটনা ঘটে। প্রবীর বাবুর ছেলেটিও মা এবং বোনদের মতো গা ঢাকা দিয়েছিলো। হঠাৎ তার দুর্মতি হয়,- ছেলেমানুষী কৌতূহলে সে আড়াল থেকে মাথা বাড়িয়ে হানাদারদের দেখতে থাকে। ফলে তার ওপর তাদের চোখ পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের একজন খপ করে তার হাত ধরে ফেলে। বলে, চল্, ক্যাম্পে চল্।

ছেলের বিপদ দেখে মা সব কিছু ভুলে ছুটে এসে হানাদারদের সামনে দাঁড়ান। বলেন, ওর খুব কঠিন অসুখ। ও তাই কখনো কোথাও যায় না। সারাক্ষণ ঘরেই বসে থাকে। আপনারা ওকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবেন না।

তারপর চলে নানাভাবে কাকুতি মিনতি।

কেন জানি লোকগুলি তাঁর কথায় বিশ্বাস করে। ছেলেটিকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তারপরই তাদের নতুন প্রশ্ন, ঘরে মেয়ে আছে ?

প্রবীর চৌধুরীরা এবারও নঞর্থক জবাব দেন, না, আমাদের কোনো মেয়ে নেই।

হানাদাররা তাঁদের কথায় বিশ্বাস করে বোধ হয় এবারও। এবং তাই ঘরে তল্লাশি চালায় না। আর কোনো হাঙ্গামা–হুজ্জত না করে চলে যায়।

ছেলের বোকামির জন্যে যে বিপদ ঘটতে যাচ্ছিলো, প্রবীর চৌধুরীরা অল্পের জন্যে তার থেকে বেঁচে যান। এবং এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

কিন্তু ভয় তাঁদের একেবারে কাটে না। বরং পরদিনই আরো বেড়ে যায়। সেদিন দুর্ঘটনা ঘটে পাশের বাসায়। হানাদাররা সেখান থেকে একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদ়ধক মারধর করে।

ছেলেটি অবশ্যি ফিরে আসে। তিন দিন পর। প্রায় লাশ হয়ে। মারের ধাক্কা কাটাতে তার পুরো ছয়টি মাস সময় লাগে। এই ছয়টি মাস তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিলো।

পাশের বাড়ীর ঘটনাটির পর কয়েকটা দিন কাটে।

তারপর এক রাতে আবার দরজায় আঘাত। জেগে উঠে প্রবীর চৌধুরী ভাবলেন, আজ আর রক্ষা নেই। কিন্তু দরজা খুলে পড়েন এক পরিহাসের সামনে, মশারি দাও। আর, ঘরে খাবার কি আছে? ·

তাহলে ক্যাম্পে যাওয়া–টাওয়া নয়, এই ব্যাপার !

তবু প্রবীর চৌধুরীর ভয় কাটে না। হানাদারদের আসল মতলব কি, কে জানে? তাদের খুশী করবার জন্যে তিনি শুধু মশারি নয়, – চাদর, কম্বল ইত্যাদি জাতীয় যা কিছু ঘরে ছিলো, সব এনে দেন। সেই সঙ্গে খাবার হিসেবে পোষা ছাগলটি এবং দুটি হাঁস।

ক্রমে দেখা যায়, খাবারের আবদার শুধু প্রবীর চৌধুরীর বাড়ীতে নয়, পাড়ার সব বাড়ীতেই। তাঁরা বাড়ীতে পোষা মুরগী, পায়রা ইত্যাদি দিয়ে জানমাল রক্ষা করেন। খাবারের আবদারের সঙ্গে সঙ্গে তখন সারা পাড়ায় সন্ত্রাসী কারবার চলছে।

পরিহাস চরমে ওঠে এরই মধ্যে। হানাদাররা প্রায়ই এসে খোঁজখবর নেয়, কুশলাদি জানতে চায়। বলে, তুমলোগ বন্দু হ্যায়।

এই সময় হানাদাররা তাদের ক্যাম্প পাড়া থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় না, বরং তার ভয়াবহতা বাড়তে থাকে। তারা প্রতিদিনই দোষী–নির্দোষ নির্বিশেষে তরুণ ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়।

এইভাবে প্রায় তিন মাস কাটে।

প্রবীর চৌধুরী মানসিক যন্ত্রণা আর সইতে পারছিলেন না। তাই সর্বক্ষণ নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকেন। খুঁজতে খুঁজতে – জুলাই মাসের শেষ দিকে একদিন বাড়ীর সবাই এক কাপড়ে, একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় পথে বেরিয়ে পড়েন। গিয়ে ওঠেন পাড়া থেকে অনেক দূরে, শহরতলীর একটি বাড়ীতে, আত্মগোপন করার জন্যে।

তাঁরা সেখান থেকে ফিরে আসেন হানাদারদের আত্মসমর্পণের পর। তখন মানুষগুলি অপুষ্টিতে জীর্ণশীর্ণ, রোগজর্জর। বাড়ীর দশাও তেমনি। দরজা–জানলা ভাঙা। ভেতরে জিনিষপত্র বলতে কিছুই নেই। কাগজপত্র পর্যন্ত তছনছ।

জীবন যখন সুতোয় ঝোলে

প্রবীর চৌধুরী মানসিক নির্যাতন সইতে না পেরে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন। আত্মগোপন করে থেকে প্রাণে বাঁচেন। কিন্তু তাঁর সর্বস্ব যায়। তাঁর মতো মানসিক নির্যাতন সয়েছেন আরো বহুজন। এই দলের একজনের কথা জানি, যাঁকে খোয়াতে হয়নি কিছুই। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে মানসিক যন্ত্রণার সাথে জোটে সার্বক্ষণিক প্রাণভয়। মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস তাঁর জীবন যেন এক সরু সূতো থেকে ঝুলে ছিলো। যে-সূতো ছিঁড়ে যেতে পারতো যে কোনো সময় এবং তার ফলে যা ঘটতো, তা কোনো বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। একবার তো তিনি বেঁচে যান-নিয়তিবাদীরা যাকে বলে,-দৈবক্রমে। তাঁর নিজের ভাষায়, 'আয়ু থাকলে এমনই হয় বোধ হয়।'

তিনিও এক চৌধুরী। এবং প্রবীর চৌধুরীর মতো তাঁরও বাড়ী সিলেটে। তবে, যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ঢাকায়। সিলেটের কর্মস্থল ছেড়ে এসে। সেখানে থাকলেও তাঁকে পড়তে হত একই রকম বিপদে। হয়তো আরো বেশী করে। সেকথা বলেছেন তিনি নিজেই, 'একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে। তবে সংক্ষেপে, অন্যের কাছে শুনে। ঢাকায় তাঁর ঘটনাগুলির কথা বিস্তারিতভাবে লেখা।

আমি এখানে যা লিখছি, তার সবই তাঁর কথা। শুধু, আমার মতো করে সাজানো।

এই চৌধুরীর নাম ডাঃ শুভাগত চৌধুরী। অনেকের কাছেই পরিচিত তিনি। কেবল ডাক্তার হিসেবে নয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও। চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানান বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধ প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন পত্রিকায়। এই সব বিষয়ের বইও লিখেছেন তিনি বেশ কয়েকখানি। এখন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর কর্মস্থল ছিলো ঢাকা।

তাঁর ঘটনাবলীর সূচনাস্থল মিটফোর্ড হাসপাতাল, কাল ২৫ মার্চ দিনগত রাত্রি। তিনি বাবা আর ছোটো বোনকে নিয়ে হাসপাতালে ছিলেন মায়ের কাছে। মা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যকার (ড.) মঞ্জুশ্রী চৌধুরী সেখানে অপারেশনের রোগী। রাত্তিরে শুভাগতরা দেখেন, আকাশ জুড়ে আগুনের

লকলকে শিখা। কানে আসে শত শত মানুষের করুণ চীৎকার। খবর মেলে, পিলখানার দিকে পাকিস্তানী সৈন্যরা অভিযানে এসেছে। সেই অভিযানে সেখানকার সব কিছু জ্বলে পুড়ে খাক। শুভাগতরা দুশ্চিন্তায় বাঁচেন না। ছোটো ভাই অরূপরতন,—এখন সুপরিচিত ডেন্টিস্ট এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অরূপরতন চৌধুরী,—আজিমপুর কলোনির বাসায় একা রয়েছে। জায়গাটা পিলখানার কাছে।

দুশ্চিন্তার রাতও প্রাকৃতিক নিয়মে এক সময় ভোর হয়। শুভাগত তখন দুশ্চিন্তার ধাক্কা খেয়েই হাসপাতালের গেটের বাইরে এসে দাঁড়ান। চোখে পড়ে, রাস্তায় মানুষের স্রোত। একেবারে বন্যাধারার মতো। যদিও সারা শহরে তখন কারফিউ। কান্নায় আর বিলাপে যেন আকাশ অবধি বিষাদময়। সবাই ছুটছে জিঞ্জিরার দিকে। আশপাশে অনেক বাড়ীতে চোখ-ধাঁধানো আগুনের শিখা। দোকানপাটে লুটতরাজের উৎসব।

ডাঃ শুভাগত এই অভাবিত ব্যাপারে হতবাক। এ যেন প্রলয়ের এক চলমান ছবি। অরূপের জন্যে তাঁর দুশ্চিন্তা বাড়ে। তিনি অস্বস্তিতে মনে মনে ছটফট করেন। আর, কি আশ্চর্য, যেন ওই ছবিরই এক অংশ হয়ে একটু পরেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান অরূপরতন। আজিমপুর কলোনি থেকে মিটফোর্ড হাসপাতাল অবধি দীর্ঘ, বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে। বহু কষ্টে, পালিয়ে পালিয়ে। শুভাগত এবার একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন, স্বস্তিটা ছিলো নেহাৎই সাময়িক। মায়ের সার্থক অপারেশন সত্ত্বেও। চারদিকে দেখা যায় দেশত্যাগের হিড়িক। বাঙালী মাত্রেরই প্রাণ বিপন্ন। বিশেষ করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষগুলির। তারা হানাদার বাহিনীর নরমেধ যজ্ঞের অতি প্রিয় উপকরণ। এদিকে, অরূপরতন রাজনৈতিকভাবে দাগী। মার্চের অসহযোগ আন্দোলনে তিনি বড়ো বেশী জড়িয়ে পড়েন। আর কিছু না হোক, শুধু তাঁর কারণেই চৌধুরী পরিবারে বজ্রপাত ঘটতে পারে যে কোনো সময়।

তবু শুভাগতদের নড়বার উপায় নেই। দেশ ছেড়ে ওপারে যাওয়ার পথ দীর্ঘ এবং দুর্গম। বাহন বলতে গেলে কেবল চরণ। অথচ মা সবে অপারেশন টেবিল থেকে ফিরেছেন। তাঁকে নিয়ে ওপারে যাওয়া কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। তাঁরা তাই নিজেদের অনিশ্চয়তার হাতে সঁপে দিয়ে আজিমপুরের বাসাতেই থেকে যান। প্রবল দুশ্চিন্তাকে পরিবারের এক অবাঞ্ছিত, কিন্তু অপরিহার্য অতিথির

মতো সঙ্গী করে।

এই পরিস্থিতিতেও শুভাগতকে কর্মস্থলে যেতে হয়। জীবিকার দায়ে তো বটেই, প্রাণের দায়েও। ইতিমধ্যে তিনি–ইন্টার্নি ডাক্তার থাকতেই নতুন চাকরি পেয়েছেন। তাঁর কর্মস্থল তখন মহাখালীর স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন। সেখানে তখন উর্দুভাষীদের প্রতাপ প্রবল। তাদের চোখ সর্বক্ষণ তাঁর ওপর নিবদ্ধ থাকে। তিনি কখন্ কি করেন, কি বলেন, সবই যেন তারা লিখে রাখে। শুভাগত কাজের ভানে ল্যাবরেটরিতে অকাজে বসেন। নেশাগ্রস্তের মতো প্রসাধনের জিনিষ তৈরি করেন। কেউ কিছু শুধালে সাবধানে উত্তর এড়িয়ে যান। আর, মওকা পেলেই নিরাপদ সহকর্মীদের সাথে চাপা গলায় মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন।

শেষোক্ত এই কর্মটি অবশ্যি তাঁর এক পুরোণো রাজনৈতিক অভ্যেসের জের। তিনি মায়ের অসুখের খবর পেয়ে ২৫ মার্চের দিন কয়েক আগে ঢাকায় আসেন। সিলেটের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে। সেখানে থাকাকালে মার্চের অসহযোগ আন্দোলনে অকপটভাবে যোগ দেন আর সব দেশপ্রেমিক বাঙালীর মতো। সার্জারির অধ্যাপক ডাঃ শামসুদ্দীন আর তাঁর সহকারী ডাঃ শ্যামল লালার সাথে মিলে গোপন সভা করেছেন অনেক। সেসব সভায় তাঁদের আলোচনার বিষয় হত তখনকার রাজনীতির নানান বিষয়। এমনকি, মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনা এবং যুদ্ধকালে তাঁদের করণীয় কাজকর্ম নিয়েও। ডাঃ শামসুদ্দীন ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সেই সঙ্গে দূরদর্শী। মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে গোপনে একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক পর্যন্ত গড়ে তোলেন। তাঁর কাজকর্ম আর চিন্তাধারা ডাঃ শুভাগত চৌধুরীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

অতীব দুঃখের বিষয়, তাঁর সিলেটের ওই সব সাহসী সহকর্মী স্বাধীনতার রক্তলাল সূর্য দেখে যেতে পারেননি। হানাদার বাহিনী সিলেট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হামলা করেছিলো। সেই হামলায় যাঁরা জখম হয়েও প্রাণে বেঁচে যান, ডাঃ শামসুদ্দীন এবং ডাঃ শ্যামল লালা তাঁদের সেবার জন্যে স্বেচ্ছায় ডিউটি নেন। হানাদারদের এটা সহ্য হয়নি। তারা এসেছিলো মানুষ মারতে। সেই মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা যাঁরা করেন–কিংবা হামলার পরও যাঁরা অক্ষত দেহে থাকেন,–তাঁরা তো 'অপরাধী'। পশুরা তাই আবার হামলা চালায়। ডাঃ শামসুদ্দীন, ডাঃ লালা এবং আরো কয়েকজন 'অপরাধী'–কে লাইন করে দাঁড় করায়। তারপর ছোটে একের পর এক গুলি। তাতেও পশুগুলির তৃপ্তি হয়নি। তাঁরা গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়ার পর পশুগুলি শুরু করে তাঁদের বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো।

ডাঃ শুভাগত এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়েছিলেন পরে, ঢাকায় বসে। হানাদারদের হামলা থেকে বেঁচে আসা একজন পঙ্গু ওয়ার্ড বয়ের মুখে। মায়ের অসুখ ডাঃ শুভাগতর জন্যে শাপে বর হয়েছিলো বটে।

কিন্তু—ওই যে বলছিলাম, পুরোণো অভ্যেস তিনি ছাড়েননি। এবং তার জন্যে সরাসরি হানাদারদের না হোক, তাদের সহযোগী আর তাঁর সহকর্মী বিহারীদের বিষনজরেও পড়েছেন। তবু আবার তিনি ঘটনাক্রমে বেঁচে যান। বিহারী সহকর্মীদের ভেতর ছিলেন তাদের ঘরের শত্রু বিভীষণ গোছের একজন। ব্যাকটিরিয়োলজির অধ্যাপিকা ডাঃ পারভীন ইস্পাহানী। তিনি ডাঃ শুভাগতর অবস্থা বুঝে তাঁকে বাঁচানোর জন্যে এক প্রচারে নামেন। শুভাগত নির্দোষ, নেহাৎই গোবেচারা মানুষ, তার দ্বারা রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কাজকর্ম সম্ভব নয় ইত্যাদি বলে।

১৬ ডিসেম্বরের পর ডাঃ শুভাগতর বিহারী সহকর্মীদের টেবিলের ড্রয়ার খুলে কিছু ভয়ানক কাগজপত্র পাওয়া যায়। সেগুলির ভেতর ছিলো তাদের কাঙ্ক্ষিত শিকারের একটি তালিকা, যার বেশ ওপর দিকে দেখা গিয়েছিলো তাঁর নাম।

এদিকে, অফিসে ডাঃ পারভীন ইস্পাহানীর চেষ্টায় তিনি বাঁচলেন বটে, কিন্তু বাসায় তাঁর জীবন সরু সূতোয় ঝুলেই রইলো। সেটা অবশ্যি ঠিক তাঁর নিজের কারণে নয়। ছোটো ভাই অরূপরতনের জন্যে। যিনি তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার কাজকর্মের জন্যে দুশমনদের নজরগত ছিলেন। বাসায় তাই সবাইকেই সন্ত্রস্ত থাকতে হত। এবং এ-কারণে বাবা একটুখানি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও নেন। মার্কামারা ছেলেটি যাতে রাত্তিরে বাইরে গিয়ে কোনো হাঙ্গামা বাধাতে না পারে, তার জন্যে তিনি দরজায় ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে রাখতেন। চাবিও ছিলো তাঁরই হেফাজতে। তবু একদিন সকালে দেখা যায়, তাঁর হেফাজত থেকে চাবি উধাও, দরজা তালাহীন এবং অরূপরতন নিরুদ্দেশ। এখন যদি হানাদারদের সহযোগীরা অরূপরতনের খোঁজে বাসায় হানা দেয়, তাহলে পরিস্থিতিটা কেমন দাঁড়াবে? অন্য লোকে অবশ্যি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, অরূপ কোথায়? শুভাগতরা বিশেষ কোনো উত্তর দেন না। তখন যে কাউকেই বিশ্বাস করবার মতো অবস্থা নেই।

অরূপরতন নিরুদ্দেশ হওয়ায় বাবা-মা, ভাই-বোনের ভয় বাড়ে অবশ্যই। সেই ভয় বুকের ভেতরটা কুরে কুরে খায়। পরিবারের মানুষগুলির স্বাভাবিক আচরণ পর্যন্ত বদলে দেয়। তাঁরা স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনেন

লেপের তলায় ঢুকে। এতো মন্দের মধ্যে ভালো শুধু এই যে, অরূপের সন্ধানে কেউ আসে না।

কিন্তু অরূপের খবর আসে। ঠিক ভয় কাটানোর মতো কিছু না হলেও একটুখানি স্বস্তি পাওয়ার মতো বটে। খবরটি নিয়ে আসেন অচেনা এক লোক। কিন্তু তার পায়ে অরূপরতনের জুতো। তিনি জানান, অরূপ ভারতে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করছেন। অর্থাৎ তিনি এখন মুক্তিযোদ্ধা। ভারতে যাওয়ার পথে তিনি একবার ধরা পড়েছিলেন। তখন তাঁর ওপর দারুণ নির্যাতন চালানো হয়। সে এমনি নির্যাতন যে, তাঁকে চেনার উপায় ছিলো না। সারা শরীর তখন ক্ষতবিক্ষত। দুর্দম অরূপ সেই অবস্থায়ই শত্রুর চোখে ধূলো দিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়েন। ভারতে পৌঁছে তাঁকে এক মাস হাসপাতালে থাকতে হয়। এখন একটু ভালো।

অচেনা লোকের কাছে এই সব খবর পাওয়ার পর অন্য সূত্রেও অরূপের খবর পাওয়া যায়। এক মাসী থাকেন আমেরিকায়। তিনি চিঠি লেখেন, অরূপ ভারতে আছে, মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন শুভাগতরাও। তবে, সরাসরি নয়, পরোক্ষভাবে। তাও সামান্যই। কেবল কিছু সাহায্য–সহযোগিতার কাজ। অচেনা সেই লোকটি কিছু পোস্টার দিয়ে গিয়েছিলেন—অরূপের পক্ষ থেকে। দুই–একটি পুঁটলিও। গোপন কিছু নির্দেশসহ। শুভাগতরা জিনিষগুলি যেমনকার, তেমনি লুকিয়ে রাখেন। দিন কয়েক পর এক দল মুক্তিযোদ্ধা এসে সেগুলো নিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের আনাগোনা তারপরও চলে। তারা আসে ভারত থেকে। তাদের সাথে খবরাদি বিনিময় হয়। কিছু কিছু কাজের কথাও।

এই সব হতে হতে—একদিন ঘটে এক অতি নাটকীয় আর ভয়াবহ ঘটনা।

শুভাগত তাঁর মহাখালীর অফিসে যাতায়াত করতেন বাসে। সেদিন হানাদার বাহিনীর কিছু লোক ফার্মগেটের কাছে তাঁদের বাস থামিয়ে দেয়। তারপর হুকুম হয়, সবাই নেমে পড়ো, লাইন করে দাঁড়াও। প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং সবাই হুকুম তামিল করে। এর পরে যে কি ঘটবে, তা সহজেই অনুমেয়। ডাঃ শুভাগতর চোখের সামনে ভাসতে থাকে মা–বাবা, ভাই–বোনের মুখ। এবং সেই সব মুখের ফাঁক গলে দেখা দেয় তাঁদের দিকে তাক করা কতকগুলি বন্দুকের নল। পরক্ষণেই নলগুলি গর্জে ওঠে ব্রাশ ফায়ারে। ডাঃ শুভাগত আর তাঁর সহযাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে।

তারপর এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ব্রাশ ফায়ারের মুহূর্ত কয়েক পর ডাঃ শুভাগত চোখ মেলেন। এর অর্থ কি? না, তিনি বেঁচে আছেন! অথচ তাঁর দু'পাশে লাশের পর লাশ! তিনি নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারেন না।

তবু বিশ্বাস করতে হয়। যখন গায়ে চিমটি কেটে দেখেন, ব্যথা লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আসে এক বুদ্ধি,—উপস্থিত বুদ্ধি যার প্রচলিত নাম। তিনি ওঠবার চেষ্টা করেন না, মরার ভান করে রক্তাক্ত লাশের পাশেই পড়ে থাকেন। চোখ বুজে, একেবারে চুপচাপ।

এইভাবে কেটে যায় বেশ কিছুক্ষণ। শেষে, যখন বোঝেন, বিপদ কেটে গেছে, তখন উঠে পড়েন। যে সরু সূতোয় জীবনটা ঝুলে ছিলো, সেটা ছিঁড়তে ছিঁড়তেও ছেঁড়েনি।

পরে তিনি ঘটনাটা অফিসে তাঁর সহকর্মীদের বলেছিলেন। সবাই সেটা বানোয়াট বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি নিজেও বিশ্বাস করতে পারেননি, অমন অভিনয় করাটা তাঁর দ্বারা কিভাবে সম্ভব হয়েছিলো।

আবার চলতে থাকে – যাকে বলে দিনগত পাপক্ষয়। অবশ্যি, সরু সূতোয় ঝুলানো জীবন নিয়েই। প্রতিদিন যথানিয়মে অফিসে যান, ডিউটির সময় ফুরোলে বাসায় ফিরে আসেন। অফিসে কাজকর্ম তেমন ছিলো না। তাই, চলতে থাকে কেবল কাজের ভান। দুশমনদের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্যে। সারাক্ষণ ল্যাবরেটরিতে বসে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করেন। আর, মওকা পেলেই আগের মতোই সহকর্মীদের সাথে চাপা গলায় মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন। সেই সঙ্গে চলে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবর নিয়ে আলোচনা। মাঝে মাঝে বিহারীরা ল্যাবরেটরিতে উঁকি দেয়। জানতে চায়, তিনি কি করছেন। ডাঃ শুভাগত জবাব দেন, গবেষণা। তারা আর কিছু না বলে চলে যায়। কিন্তু কেমন জানি এক বাঁকা হাসি ছুড়ে দিয়ে। যা দেখলে সারাটা গা সিরসির করে ওঠে।

তারপর আবার সেই ভয়াবহ ঘটনা। সূতো ছিঁড়ে ফেলবার মতো। তাও একবার নয়। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দু'বার।

তখন ডিসেম্বর মাস। ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ঢাকার আকাশে দু'পক্ষের জঙ্গী বিমানে 'ডগ ফাইট' চলছে। শহরে কড়া ব্ল্যাক আউট। এরই মধ্যে এক রাতে হাসপাতালে ডিউটি পড়ে ডাঃ শুভাগতর। সে–ডিউটি এড়ানোর কোনো উপায় নেই। আর, এমনি ঘটনাক্রম, সেই রাতেই হানাদাররা শিকার খুঁজতে আসে হাসপাতালে।

ডাঃ শুভাগত একবার হানাদারদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন

অভিনয়ের বলে। এবার বাঁচবেন কেমন করে? কোনো ক্রমে পালিয়ে অন্ধকার এক কেবিনে গিয়ে আশ্রয় নেন। গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকেন সেখানকার স্টীলের খাটখানার তলায়। শরীরটা যতো দূর সম্ভব লুকিয়ে। একটু পরই হানাদাররা টর্চের আলো ফেলে শিকার খুঁজতে খুঁজতে কেবিনটার কাছে এগিয়ে আসে। দরজার কাচে গোল হয়ে টর্চের আলো পড়ে। খোঁজাখুঁজি চলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ডাঃ শুভাগতর বুকটা টিপ টিপ করে। হানাদাররা যে কোনো মুহূর্তে তাঁকে দেখে ফেলতে পারে। তারপরই কাচ ভেঙে তাঁকে লক্ষ্য করে চালাবে গুলির পর গুলি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত টর্চের চোখ তাঁকে খুঁজে পায় না। হানাদাররা ভাবে, কেবিনে কেউ নেই। সুতরাং তারা চলে যায়। ডাঃ শুভাগত মায়ের অসুখের দরুন সিলেট হাসপাতালে অনুপস্থিত থাকার কারণে বেঁচে গিয়েছিলেন, এবার বাঁচেন ঢাকার হাসপাতালে উপস্থিত থেকেও। তিনি হাঁফ ছাড়েন।

সকালবেলাই কিন্তু ঘটে আর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তখন তিনি আর তাঁর সহকর্মী ডাঃ রউফ একটা বেবি ট্যাকসি চেপে বাসার দিকে ছুটছেন। অফিসে আর আসবেন না, এই সঙ্কল্প নিয়ে। পথে এক সময় হঠাৎ সাইরেনের শব্দ শোনা যায়। তিনি আর ডাঃ রউফ বেবী ট্যাকসি থামিয়ে একটি গাছের নীচে আশ্রয় নেন। কিছুক্ষণ পর 'অল ক্লিয়ার' হলে তাঁরা আবার বেবি ট্যাকসিতে উঠতে যান। সেই সময় তাঁর দু'পায়ের ফাঁকে ফট করে কিসের যেন শব্দ হয়। ডাঃ শুভাগত ড্রাইভারের কাছে জানতে চান, টায়ার ফাটলো নাকি? সে বলে, না, আপনার পায়ের ফাঁক দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। এখন তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে পড়ুন।

সরু সূতোটা আর ক'বার ছিঁড়তে ছিঁড়তে টিকে যাবে?

এখন ডাঃ শুভাগত আর অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিতে রাজী নন। নিজের এবং মা-বাবা-বোনের জীবন রক্ষার জন্যে একটা পরিকল্পনা করে ফেলেন। বাসায় ফেরবার পর অস্ত্রের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। একটা পিস্তল চাই তাঁর। আর, মা এবং বোনের জন্যে খানিকটা বিষ। হানাদার বা তাদের দোসররা যদি বাসায় হানা দেয়, পিস্তলটা নিয়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণ লড়াই করবেন। আর, মেয়েদের কাজ কি? প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁরা বিষ খেয়ে সম্ভ্রম রক্ষা করবেন।

পথে এক ভিখিরীর সাথে দেখা। মানুষটি আসলে ভিখিরী নন, ডাঃ শুভাগতর পরিচিত মুক্তিযোদ্ধা। এসেছেন ভারত থেকে। নিরাপত্তার কারণে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে এই বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দুজনে কিছুক্ষণ সাবধানে কথাবার্তা

হয়। খবরাখবর বিনিময়ও। তারপর ডাঃ শুভাগত মুক্তিযোদ্ধার কাছে অস্ত্র চান। একটি পিস্তল এবং কিছু গুলি।

মুক্তিযোদ্ধা পিস্তল এবং গুলি যোগান।

তারপর ডাঃ শুভাগত বিষও যোগাড় করে ফেলেন। পুঁটলিতে ভরা পটাসিয়াম সায়ানাইড।

তাঁর মনে এখন বড়ো বল। দুই-দুটি অস্ত্র তাঁর পকেটে। অসহায় অপমানিতের মৃত্যু আর তাঁদের মরতে হবে না। তবে, পিস্তলটির কথা বাসায় গোপন রাখেন। মা-বাবা ওসব শুনলে ভয় পেতে পারেন, এই ভেবে।

যুদ্ধের বাকী দিন কটি তিনি নিজেকে ওই বলে বলীয়ান ভেবেই কাটান।

তারপর আসে ১৬ ডিসেম্বর। ডাঃ শুভাগত বাসায়ই ছিলেন। হঠাৎ রাস্তা থেকে 'জয় বাংলা' ধ্বনি আসে। তিনি জানলা দিয়ে দেখেন, মাথায় কাপড়-বাঁধা কয়েকজন লোক নিয়ে একখানা জীপ ছুটে যাচ্ছে। জানা গেল, হানাদারদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে। ঢাকা এখন মুক্তিবাহিনীর দখলে।

আর ঘরে বসে থাকা চলে না। তিনি এক ছুটে নীচে নেমে আসেন।

এবং এসেই শোনেন এক গা-শিউরানো খবর। হানাদারদের দোসররা এই দিনেও তাঁকে ধরতে এসেছিলো। কিন্তু ভুলক্রমে নীচের ফ্ল্যাটে। ডাঃ শুভাগত আগেই শুনেছিলেন, বুদ্ধিজীবীদের তালিকা বানিয়ে সেই অনুযায়ী ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ওইটিই একমাত্র তালিকা নয়। আরো একটি ছিলো। সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের। ডাঃ শুভাগত সেই তালিকার 'আসামী'। এই জন্যেই রাজাকাররা তাঁর খোঁজে আসে। কিন্তু হঠাৎ রাস্তায় 'জয় বাংলা' ধ্বনি ওঠায় দোতলা অবধি যাওয়ার সময় বা সুযোগ পায়নি।

অর্থাৎ সরু সূতোটা আরো একবার ছিঁড়তে ছিঁড়তে টিকে গেছে!

ডাঃ শুভাগত পিস্তলটা যথাসময়ে যথাস্থানে জমা দিয়ে আসেন। কিন্তু তার আগে, ১৬ ডিসেম্বরই, পিস্তল আর পটাসিয়াম সায়ানাইডের পুঁটলি নিয়ে বুড়ীগঙ্গার ধারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পুঁটলিটা নদীর জলে ছুড়ে দেন। আর, পিস্তলের গুলিগুলো ছোড়েন আকাশের দিকে। একে একে সব কটি। তারপর গলা ছেড়ে ধ্বনি দিয়ে ওঠেন, জয় বাংলা। যে-ধ্বনিতে তাঁর ন'মাসের মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটে। এবং তার চেয়েও বড়ো কথা,-চতুর্থবারে তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়।

পালাতে গিয়ে পগারে পড়া

ডাঃ শুভাগত চৌধুরী যে মানসিক যন্ত্রণা আর নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তা ছিলো সৎ বাঙালী মাত্রেরই সর্বক্ষণের সাথী। তাঁদের জীবনও ঝুলে থেকেছে সরু সুতোয়। ডাঃ শুভাগতর সুতোটা বার বার আচমকা টান খেয়েও টিকে যায়। আবার, অনেকের ক্ষেত্রে এক টানেই ছিঁড়ে গেছে।

এমনি অপঘাতের ভয় তখন ছিলো দেশের সবার মনেই। সে-ভয় জীবনের অনিশ্চয়তার নামান্তর। তা-ই মানসিক যন্ত্রণা তথা নির্যাতনের মূল কারণ। 'একাত্তরে এমনও দেখা গেছে, মানুষ দল ধরে দাঁড়িয়ে আছে বাসের জন্যে, বাস এলে তাতে উঠতেও যাচ্ছে, হঠাৎ হানাদাররা পেছন থেকে তাদের টেনে ধরে মিলিটারী লরিতে তুলে নিয়েছে। এই ভেবে যে, তাদের ভেতর দুই-একজন মুক্তিযোদ্ধাও তো থাকতে পারে। এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের মনে শান্তি বা জীবনের নিশ্চয়তা থাকবে কেমন করে?

'একাত্তরের বাঙালী তাই ফেরারী আসামীর মতো দিন কাটিয়েছে। অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে যায়। যাদের দেশ ছাড়বার উপায় ছিলো না, তারা গেছে শহর ছেড়ে গ্রামে। কিংবা গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে। তাও যারা পারেনি, তারাও অনেক ক্ষেত্রেই চেয়েছে নিজের এলাকা থেকে কাছেরই অন্য কোনো এলাকায় সরে থাকতে। তাদের একজনের ভাষায়, 'তখন সকলেরই মনে হত, তাদের স্থানটিই অরক্ষিত, বাকী সব জায়গা বুঝি নিরাপদ।'

অপরিকল্পিত নির্বাচনে সামনে-আনা এই বাঙালীটির নাম মিয়া মুহম্মদ সিরাজুল হক। তিনি ঢাকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের এক কর্মকর্তা। বর্তমানে অন্যতম প্রিন্সিপ্যাল সায়েন্টিফিক অফিসার।

সিরাজুল হক ওপরের মন্তব্যটি করেন কিছু দিন আগে। গোটা মুক্তিযুদ্ধকালের কথা মনে রেখেই। কিন্তু বিশেষ করে অক্টোবরের পরিস্থিতি মনে পড়ায়। এবং তাঁর নিজের এক করুণ অভিজ্ঞতার বুনিয়াদে। তিনি নিরাপদ জায়গা খুঁজতে গিয়ে নতুন বিপদে পড়েছিলেন।

তাঁর ঘটনাটি যখন ঘটে, মুক্তিযুদ্ধ তখন রীতিমতো স্পষ্ট এবং ব্যাপক রূপ নিয়েছে। তার সাফল্য সুনিশ্চিত, কেবল সময়ের ব্যাপার। হানাদাররা যেখানে সেখানে অপমানজনক পরিস্থিতিতে পড়ছে। মার খাচ্ছে যখন তখন। তাতে ক্ষেপে গিয়ে তাদের হামলা যথাসম্ভব জোরদার করছে। আর, তাদের দোসর

রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনীকে আরো ব্যাপকভাবে লেলিয়ে দিচ্ছে দেশপ্রেমিক বাঙালীদের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে সেই সব জায়গায়, যেখানে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না।

সিরাজুল হকের ফেরারী জীবন শুরু হয়েছিলো, আরো অসংখ্য বাঙালীর মতোই, দেশে এমন পরিস্থিতি দেখা দেওয়ার অনেক আগেই।

২৫ মার্চের পর তিনি দুই-তিন বার পাড়া বদল করেন। শেষ বারে গিয়ে ওঠেন চামেলীবাগের এক অন্ধ গলিতে। অপরিচিত সেই জায়গায় নাজুক পরিস্থিতিতে মন খুলে কথা বলবার মতো লোক পাওয়া ছিলো কঠিন। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে মনটা হালকা করাও। তখন সারাটি রাত কারফিউয়ের পলো শহরটাকে চাপা দিয়ে রাখতো। সিরাজুল হক মাঝে মাঝে ঝুঁকি নিয়ে তার মধ্যেও বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁর বাসা থেকে কয়েক বাড়ী পরেই থাকতেন দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন। সিরাজুল হক তাঁর বাসায় গিয়ে বন্ধুবান্ধবসহ মন খুলে গল্প করেছেন।

কিন্তু এমন ঝুঁকি নেয়া সব সময় চলতো না। কখনো কখনো তাঁর মনে হয়েছে, চামেলীবাগ নিরাপদ নয়। তখন তিনি চলে যেতেন গোপীবাগে, শ্বশুড়বাড়ী। গোপীবাগে মুক্তিবাহিনীর অনেক ছেলের বাড়ী ছিলো। তাঁর এক শ্যালক তাদেরই একজন। সেই সুবাদে-এবং এমনিতেও-মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের সাথে তাঁর শ্বশুড়বাড়ীর লোকজনের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ছেলেগুলির একজন-মুরাদ-ছিলো সিরাজুল হকের ভক্ত। তরতাজা, সুঠাম দেহের অধিকারী তরুণ মুরাদ তাঁকে দেখলেই এক গাল হেসে বলে উঠতো, দুলা ভাই, ভালো আছেন?

গভীর দুঃখের বিষয়, এই হাসিখুশী মুরাদ এখন বেঁচে নেই। স্বাধীনতার পর ঢাকার এক ঘাতক ট্রাক তার প্রাণ কেড়ে নেয়।

মুক্তিযোদ্ধায় ভরা গোপীবাগে সিরাজুল হক হয়তো একটু নিরাপদ বোধ করতেন। জায়গাটি অবশ্যি একেবারে আপদহীন ছিলো না। তাঁর শ্বশুড়বাড়ীর খুব কাছেই হানাদার বাহিনীর দালাল এক মুসলিম লীগারের বাস। কানাঘুষায় শোনা যেতো-এবং প্রমাণও কিছু কিছু মিলেছে,-সে তার বাড়ীতে কুমিল্লা এবং আরো কয়েক জায়গার কতকগুলি দালালকে আশ্রয় দিয়েছে। আর, তাদের নিয়ে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালায়।

একদিন-৩০ সেপ্টেম্বর-সিরাজুল হক গোপীবাগ গেছেন। সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর না নিয়ে। রাত একটু গভীর হতেই টের

পান, এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা কিছু একটা করতে চলেছে। এক সময় মুরাদ এসে খবর দিয়ে যায়, রাত্তিরে তারা মুসলিম লীগের দালালটার বাড়ীতে হামলা চালাবে, বোমা মেরে বাড়ীটা উড়িয়ে দেবে। সিরাজুল হকের শ্বশুড়বাড়ীর মেয়েরা যেন রাতে অন্য কোথাও গিয়ে থাকেন।

তাঁরা মুরাদের কথামতো মেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে দেন। তারপর রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে শুয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। জানলা দিয়ে দালালটার বাড়ীর দিকে চেয়ে। আধো-আলো আধো-অন্ধকারেও বাড়ীটা প্রায় স্পষ্টই দেখা যায়।

সিরাজুল হকেরা অপেক্ষা করছেন। ক্রমে রাত বাড়ে, তাঁদের উৎকণ্ঠাও বাড়ে। মনে প্রবল প্রশ্ন, অপারেশন কখন্ হবে? কোনো লক্ষণ তো দেখা যায় না।

সেই প্রশ্ন আর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে এক সময় তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন।

কিন্তু-কতোক্ষণ পর, ঠিক বোঝা যায় না,-কুকুরের চীৎকার আর গোলাগুলির আওয়াজে সিরাজুল হকের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁর শ্যালক-সম্বন্ধীরা তখন জেগে বসে আছেন। সবাই তটস্থ।

তাঁদের প্রতীক্ষায় সাড়া দিয়ে মিনিট দুই-তিন গোলাগুলি চলে। তাঁরা ভাবেন, এটা অপারেশনের সূচনা মাত্র। একটু পরেই ঘটবে বিস্ফোরণ। কিন্তু তাঁদের প্রতীক্ষাই সার। দেখা যায়, বড়ো রকমের কিছু ঘটবার আভাস মাত্র নেই। দালালটির বাড়ীতে জনমানব আছে বলেও মনে হয় না।

গোলাগুলি থেমে গেলে গোটা এলাকাই নিঝঝুম হয়ে যায়। সিরাজুল হক তখন খোলা জানলা দিয়ে দালালবাড়ীর দিকে তাকান। অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে কষ্ট হয় না, সেটি অক্ষত অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে আছে। তবু সিরাজুল হক আশা করেন, কারো সাড়াশব্দ যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই বাড়ীটার সবাই গুলি খেয়ে মারা পড়েছে।

তাঁরা জেগে থাকতে থাকতেই রাত ভোর হয়ে যায়। মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসে। চারদিকে পাখপাখালি ডেকে ওঠে। দালালের বাড়ী থেকে প্রথমে খুটখাট শব্দ শোনা যায়। তারপর কানে আসে লম্ফঝম্ফ, নর্তন-কুর্দনের আওয়াজ। ক্রমে বাড়ীটা ঘিরে লোকের ভীড় জমে ওঠে। দালাল এবং তার সহচররা সবার সামনে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাত্তিরে তাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি!

গোলাগুলির খবরটা যথাসময়েই হানাদারদের কাছে পৌছে যায়। একটু

বেলা হতেই তাদের একটি দল এসে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। বেশ কয়েকটি বাড়ীতে ঢুকে শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদ। কয়েকটি হানাদার সিরাজুল হকের শ্বশুড়বাড়ীতেও আসে। তাঁর শ্বশুরকে নানারকম প্রশ্ন করতে থাকে। তারপর এক সময়, হয়তো তাঁর উত্তরে সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে, ভালো মানুষের মতো চলে যায়। বাড়ীর লোকজন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

সিরাজুল হক ভাবেন, এখানে আর ভয়ের কিছু নেই। তিনি তাই ঠিক করেন, সেদিন শ্বশুড়বাড়ীতেই থেকে যাবেন।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সূর্যাস্তের পর পরই কারফিউ শুরু হয়। সিরাজুল হকেরা তখন ঘরের মধ্যে আটকা পড়েন। তাঁদের সময় কাটতে থাকে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখে আর সাবধানে, নীচু ভল্যুমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী এবং বি.বি.সি.-র সংবাদাদি শুনে।

এই সব করতে করতে রাত দশটা-সাড়ে দশটা বাজে। সিরাজুল হকেরা তখন টেলিভিশন দেখছেন। এরই মধ্যে শোনা যায়, কে যেন বাইরের দরজায় টোকা দিচ্ছে। তাতে সাড়া দিয়ে তাঁর সম্বন্ধী উঠে যান।

তারপর আর তাঁর দেখা নেই। দশ-বারো মিনিট পার হয়ে যায়, তবু তিনি ফেরেন না। কি হল তাঁর, কোথায় গেলেন তিনি? প্রশ্নগুলি সিরাজুল হকদের মনে জাগে হঠাৎ। তন্ময় হয়ে টেলিভিশন দেখছিলেন তাঁরা। এখন আর বসে থাকতে পারেন না। ব্যাপারটা জানার জন্যে তিনি বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যান।

দরজা খোলা। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মধ্যে দুই-তিনটি ছায়ামূর্তি। একটু একটু নড়াচড়া করছে। সিরাজুল হক মূর্তিগুলিকে দেখে ভাবেন, তারা মুক্তিবাহিনীর ছেলে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এমনিভাবেই তারা আসে। তিনি নীচু গলায় জিজ্ঞেস করেন, কি খবর? ভেতরে আসুন।

মূর্তিগুলি কোনো জবাব দেয় না। শুধু হাত ইশারায় তাঁকে কাছে ডাকে।

তিনি দরজা পার হয়ে সিঁড়িতে পা রাখতেই মূর্তিগুলি লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে তাঁকে ঘিরে ধরে। তাদের হাতে বেয়নেট লাগানো রাইফেল। তারা তাঁর বুকে, গলায় আর পেটে বেয়নেটের খোঁচা মেরে মেরে তাঁকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। সিরাজুল হক বেয়নেটের হুকুম অমান্য করতে পারেন না।

পথে তিনি আরো বহু ছায়ামূর্তি দেখতে পান। তারা একটা বিরাট এলাকা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই হানাদার বাহিনীর লোক। প্রথম ছায়ামূর্তিগুলি

সিরাজুল হককে তাদের একজনের সামনে এনে দাঁড় করায়। অন্ধকারেও বোঝা যায়, লোকটি মেজর। সিরাজুল হকের সম্বন্ধীসহ আরো কয়েকজন বন্দী তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মেজরটি সিরাজুল হকের বাম হাতের ওপর কয়েকবার বেটন ঠুকে উর্দূতে প্রশ্ন করে, আপ কিয়া করতে হ্যাঁয়?

সিরাজুল হক ইংরেজীতে জানান, তিনি পরমাণু শক্তি কমিশনে চাকরি করেন।

মেজর আবার তাঁর বাম হাতের ওপর কয়েক বার বেটন ঠোকে। তারপর ডান দিকে একটুখানি হেলে ইংরেজীতে বলে, তোমাকে মেরে ফেলা হবে।

সিঁড়ির কাছে ছায়ামূর্তি তিনটি রাইফেল দিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরবার পর থেকেই সিরাজুল হকের চিন্তাশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিলো। মেজরের মুখে তাঁকে মেরে ফেলবার ঘোষণা শুনে সে-মুহূর্তে তাঁর মনে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা দেয় না। বুকখানা কেঁপে ওঠা, গায়ে ঘাম ছোটা,- এসবেরও যদি কোনো লক্ষণ থাকে! তাঁর শুধু মনে হয়, তিনি একটি জড় পদার্থ এবং মেজর সেই জড় পদার্থের সাথেই কথা বলছে।

তাঁর এই অবস্থার মধ্যেই আবার মেজরটার এক ঘোষণা শোনা যায়। ভাষা এবার ইংরেজী, মাই আর্মি ওয়ান্টস ব্লাড। উই শ্যাল সাক দ্য ব্লাড অব ইচ এন্ড এভরি বেঙ্গলী।—আমার সেনাবাহিনী রক্ত চায়। আমরা প্রতিটি বাঙালীর রক্ত চুষে খাবো।

এবার সিরাজুল হক যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পান। তাঁর মনে হয়, ২৫ মার্চের পর গত ক'মাসে তিনি যা শুনেছেন আর দেখেছেন, তাঁর ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটতে চলেছে। তারপর তিনি ভাবতে থাকেন, এরা কি তাঁকে এইখানেই হত্যা করবে, নাকি, অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে?

তিনি যখন এই সব ভাবছেন, মেজর তখনও গজর গজর করছে। সেই গজরানোর লক্ষ্য সিরাজুল হক আর তাঁর সহবন্দীরা,—মিসক্রিয়েন্টরা (দুষ্কৃতকারীরা) প্রতি রাত্রে বোমা ফাটিয়ে নিরীহ মানুষের জানমাল নষ্ট করছে, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করছে। তাদের সবার সাথে তোমাদের যোগাযোগ আছে। অথচ আমাদের তোমরা কিছুই জানাচ্ছো না। এবার তোমরা উচিত শিক্ষা পাবে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের তখন সরকারী হুকুমে দুষ্কৃতকারী বলা হত।

হঠাৎ সিরাজুল হকের মনে হয়, মেজরের এসব কথা শুনে চুপ করে থাকাটা বোকামি। একটা কিছু জবাব না দিলে লোকটা নির্ঘাত ধরে নেবে, তার

ধারণাই ঠিক। মুক্তিবাহিনীর সাথে নিশ্চয়ই তাঁদের যোগাযোগ আছে।

কথাগুলো ভেবে তিনি সাহসে ভর করে একটা বানোয়াট কথা বলে ফেলেন, দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি হোক, এটা আমরাও চাই। আমরা তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। তাদের সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই।

এমনি আরো কিছু কথা।

তিনি যখন এই সব বলছেন, তখন আরো এক ভদ্রলোককে মেজরের সামনে এনে দাঁড় করানো হয়। তিনি পাড়ারই অন্য এক বাড়ীর বাসিন্দা। তাঁকেও ধরে আনা হয়েছে সিরাজুল হকের মতোই বেয়নেটের খোঁচা মেরে মেরে।

নতুন শিকার আসতে দেখে মেজরের মনে বোধ হয় নতুন জোশ দেখা দেয়। তার ডান হাতে ধরা বেটনটা সে বার কয়েক নিজের বাম হাতেই ঠোকে। এবার নিশ্চয়ই নতুন শিকারকে নিয়ে পড়বে। কিন্তু তা না করে হঠাৎ আগের মতো ডান দিকে একটুখানি বেঁকে সিরাজুল হক আর তাঁর সম্বন্ধীর উদ্দেশে ইংরেজীতে হুকুম ঝাড়ে, তোমরা এখন যেতে পারো। ঘুমোওগে।

কথাটি তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। এতো কাণ্ড আর গজরানির পরও কি এমন নাটকীয় ব্যাপার সম্ভব? তাঁরা একটু ইতস্ততঃ করেন। তারপর, মেজরের হুকুম শুনেও সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকলে নতুন বিপদ ঘটতে পারে, এই ভেবে বাসার দিকে পা বাড়ান।

ঘরে ঢুকে এক সময় সিরাজুল হক সম্বন্ধীর দিকে তাকান। দেখেন, তাঁর ডান হাতখানা ঘাড়ের ওপর প্রসারিত। সেদিকে ভালো করে তাকাতেই চোখে পড়ে, ঘাড়ের একটা জায়গা ফুলে রয়েছে।

তা—ব্যাপারটা কি?

সিরাজুল হকের প্রশ্নের জবাবে সম্বন্ধী জানান, মেজর তাঁকেও জিজ্ঞেস করেছিলো, তিনি কি করেন। তিনি উর্দুতে জবাব দেন, সরকারী চাকরি। সঙ্গে সঙ্গে মেজর বেটন দিয়ে সজোরে তাঁর ঘাড়ে বাড়ি মারে।

সম্বন্ধীর ঘাড়ে আঘাতের দাগটা অল্প দিনেই মিলিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সেদিন তিনি এবং সিরাজুল হকেরা মনে যে আঘাত পান, তার দাগ আজও রয়ে গেছে। পাকিস্তানী জল্লাদদের বিরুদ্ধে অন্তহীন ঘৃণা আর বিদ্বেষের রূপ নিয়ে।

সুলতান মুনশীর দুটি সপ্তাহ

সিরাজুল হককে দিনের পর দিন তাড়িয়ে ফিরেছে আতঙ্ক, নিরাপত্তাহীনতার বোধ। সেসবের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি পড়েছিলেন নতুন বিপদে। তিনি অতি রাজনীতিসচেতন মানুষ। কিন্তু তাঁর মতো যাঁরা নন, যাঁরা অতি সাধারণ মানুষ, তাঁরাই কি রক্ষা পেয়েছেন নতুন বিপদের হাত থেকে? এই নতুন বিপদ আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলো আকস্মিক, যেমন সিরাজুল হকের ক্ষেত্রেও। তবে, তিনি যমের মুখোমুখি দাঁড়ানোর পরও ফিরে আসেন অক্ষত দেহে। এমন ভাগ্য তো সবার হয়নি। যেমন হেড মাস্টার আবদুল কাইয়ূমের, মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাক চৌধুরীর, বীরাঙ্গণা রাজিয়া খাতুন ওরফে রাজু পাগলীর এবং আরো বহুজনের।

সেই বহুজনের অধিকাংশের কাহিনীই আজ বস্তুতঃ বিস্মৃত, কেবল তাঁদের মহলেই জ্ঞাত। অনেকটা আকস্মিক সন্ধানেই এখন জানা যায় কেবল আতিয়ার রহমান আর তাজুলের মতো দু'চারজনের কথা। সুলতান মুনশীর কাহিনীও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের বাইরে অজ্ঞাত থেকে যেতো এবং শেষ পর্যন্ত বিস্মৃত হত, যদি না তিনি তা আমার সহোদর আবদুল হাই (মাসুম)–এর মাধ্যমে আমাকে জানাতেন।

সুলতান মুনশী নামটি পরিচিত মহলে আটপৌরে ব্যবহারের। পোশাকী নাম মুনশী মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী। এই নামটির মালিক স্বল্পশিক্ষিত, অতি সাধারণ, নিম্নবিত্ত এক গ্রামবাসী। 'একাত্তরে যাঁর বয়েস ছিলো পঞ্চাশ। তাঁর বাড়ী কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার বাহিরচরে। হার্ডিঞ্জ ব্রীজের দক্ষিণ–পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামটির একটি স্থানীয় আটপৌরে নামও আছে। ষোলোদাগ।

মুনশী জসীমউদ্দীন আহমদের বড়ো ছেলে সুলতান মুনশী জীবনের অধিকাংশ সময়েই ছিলেন বেকার। 'একাত্তরের কিছু আগে তিনি ভেড়ামারার উত্তর–পশ্চিম দিকের সীমান্তবর্তী উপজেলা দৌলতপুরের জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি চাকরি পান। তাঁদের বাড়ী ছিলো বৃটিশ আমল থেকেই রাজনীতিসচেতন। পাকিস্তান আমলে তাঁদের রাজনীতি হয় দ্বিধাবিভক্ত এবং বিচিত্রমুখী। বৃটীশ আমলের মুসলিম লীগার, তাঁদের অধিকাংশই যোগ দেন আওয়ামী লীগে, একজন–পরবর্তী কালে হানাদার বাহিনীর কুখ্যাত দালাল–সা'দ আহমদ ভিড়ে

যায় জামাতে ইসলামীতে। প্রথম দলের জহুরুল হক ওরফে রাজা মিয়া ’সত্তরের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হন, কিন্তু যুদ্ধকালীন এক দুর্নীতির কারণে স্বাধীনতার পর সদস্যপদ হারান। এই দুজন সুলতান মুনশীর চাচাতো ভাই, যথাক্রমে সেজো এবং বড়ো চাচার ছেলে।

এমন ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক তথা জ্ঞাতিগত পরিবেশের মানুষ সুলতান মুনশী প্রথম থেকেই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। যদিও তাঁর তেমন কোনো সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়নি। তিনি মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন জুলাই মাসের শেষ দিকে, পরোক্ষভাবে। তারপরই তাঁর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। সিরাজুল হককে সচেতন আতঙ্ক এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, আর সুলতান মুনশীকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকারের দল।

তাঁর বিপদের সূচনা হয় চাচাতো ভাই ফজলুল হক ওরফে তিনু মুনশীর বড়ো ছেলে, মুর্শিদাবাদের পূর্ব সীমান্তের এক শহরে অবস্থানরত মুজিবুল হক মাঙনকে (পরবর্তী কালে এক মেয়াদে ভেড়ামাড়া উপজেলার চেয়ারম্যান) টাকা পাঠানো দিয়ে।

যুদ্ধের কারণে দেশত্যাগী আওয়ামী লীগার মাঙনের তখন টাকাপয়সার টানাটানি যাচ্ছে। সুলতান মুনশীর কাছে কোনো বাবদে তার কিছু পাওনা ছিলো না। এমনিই ভেড়ামারার কবীর কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে তাঁকে টাকার জন্যে অনুরোধ জানায়। এই অনুরোধটি সে করে নেহাৎই আত্মীয়তার দাবীতে।

খবর পেয়ে সুলতান মুনশী এক আত্মীয়বাড়ীর প্রবীণ ভৃত্য মোসলেমকে দিয়ে একশো টাকা পাঠালেন। কিন্তু সরাসরি মাঙনের কাছে নয়, তার মেজো ভাই আলোর কাছে। আলো তখন ছিলো মুর্শিদাবাদ সীমান্তঘেঁষা দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর গ্রামে। বড়ো ভাইকে সে সহজে টাকাটা পৌঁছিয়ে দিতে পারবে।

টাকা পাঠানোর দিন আষ্টেক পর, ১১ আগস্ট, সুলতান মুনশী আলোকে দিয়ে একখানা চিঠি পাঠান। তারও বাহক মোসলেম। চিঠির মর্মার্থ ছিলো মোটামুটি হিসেবে এই রকম ঃ তুমি আমার কাছে ঋণের টাকা চেয়েছো। তা–হাতে এলেই পাঠাবো। তুমি যখন তখন টাকা চেয়ে আমাকে বিব্রত কোরো না।–ঋণের কথা লেখবার উদ্দেশ্য ছিলো হানাদার তথা দালাল–রাজাকারদের চোখে ধূলো দেওয়া। চিঠিখানা তাদের কারো হাতে পড়লে তারা যেন আসল কথা বুঝতে না পারে।

অর্থাৎ চিঠিখানা তিনি লিখেছিলেন তাঁর এবং আলোর নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে।

মোসলেম কিন্তু ফিলিপনগর অবধি যেতে পারেননি। সুলতান মুনশী যখন তাঁর হাতে চিঠি পাঠান, তখন নিজের এক চাচাতো বোনের ছেলে রুণুও (খাজা শামসুল হুদা) তাঁকে একখানা চিঠি দেয়। খাজা শামসুল হুদা ওরফে রুণু ছিলো হানাদারদেরই দালাল। সে আলোকে লেখে, তোমার দলবল নিয়ে দেশে ফিরে এসো। পথে মোসলেম চিঠিগুলোসহ হরিশঙ্করা গ্রামে ধরা পড়েন।

সুলতান মুনশী এসব জানতেন না। মোসলেমকে চিঠি দিয়ে পাঠানোর ঘন্টা তিন–চার পর তিনি তাই নিজেও ফিলিপনগরের দিকে রওনা হলেন। তাঁর চাকরির কাগজপত্র আর কিছু ওষুধ সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু শুধু মোসলেমের ধরা পড়বার খবরটিই নয়, তিনি আরো জানতেন না, ফিলিপনগর তাঁর জন্যে দূর অস্ত।

ভেড়ামারা থেকে বাসে চেপে তিনি নিরাপদেই হরিশঙ্করায় পৌছন। তারপর তাঁর নৌকো ধরবার কথা। কিন্তু ঘাটে তখন নৌকো নেই। তিনি তাই ঘাটের কাছে একটি বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। সেখানে তখন কোনো লোক ছিলো না। কিন্তু বিশ–পঁচিশ মিনিট পর হঠাৎ সেখানে উদয় হয় স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান বাদল। সঙ্গে তিন–চারজন রাজাকার। তারা এসেই তাঁকে পাকড়াও করে। তারপর বাদলের হুকুম, তোমাকে ক্যাম্পে যেতে হবে।

কিন্তু তিনি তার হুকুম মানতে রাজী নন। বলেন, আমি চাকরির প্রয়োজনে ওষুধপত্র নিয়ে এসেছি। অফিসে যাবো। ক্যাম্পে কেন?

দালাল চেয়ারম্যান আর রাজাকাররা কিন্তু তাঁর কোনো কথাই কানে তোলে না। তাঁকে জোর করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এবং সেখানে এক লেফটেন্যান্টের হাতে তুলে দেয়।

তাঁর উদ্দেশে লেফটেন্যান্টের প্রথম প্রশ্ন হয়, তুমহারা পাস কুছ হ্যায়?

অর্থাৎ লোকটি টাকা চায়। সুলতান মুনশীর পকেটে পনেরো–বিশটি টাকা ছিলো। তিনি সব বার করে লোকটিকে দিয়ে দেন। তাঁর পায়জামার ফিতে ভরবার ভাঁজে অবশ্যি আরো একশো টাকা লুকোনো ছিলো। ফিলিপনগরে আলোকে দেওয়ার জন্যে। এই টাকাগুলোর কথা তিনি সযত্নে গোপন রাখেন।

হানাদারটিকে টাকা দিয়ে তাঁর অবশ্যি রেহাই মেলে না। একটু পরই রাজাকাররা তাঁকে নিয়ে যায় ডাং ক্যাম্পে। জায়গাটি বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে

মাইলখানেক ভেতরে।

ডাং ক্যাম্পে তাঁর জন্যে আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো। সেখানে মোসলেমের সাথে দেখা হয়। যাঁর তখন ফিলিপনগরে থাকার কথা। সুলতান মুনশী কিন্তু সেসব মুখেও আনেন না। মোসলেমের ঠোঁটও একদম সেলাই করা। তাঁরা এমন ভাব দেখান, যেন দুজনের কারো সাথে কারো পরিচয়ই নেই।

ক্যাম্পটিতে তাঁদের প্রথমে রাখা হয়েছিলো বারান্দায়। মুক্ত অবস্থায়। কিন্তু সন্ধ্যা নামতেই তাঁদের মুক্ত দশা ঘুচে যায়। দুজনকে তখন শক্ত করে জানলার শিকের সাথে বেঁধে ফেলা হয়। এই অবস্থায়ও তাঁরা এমন ভাব দেখান, যেন কেউ কাউকে চেনেন না।

ধরা পড়বার পর থেকে দুজনের সময় কাটছিলো নির্জলা উপবাসে। সেই উপবাস ভঙ্গ হয় পরদিন সকালে। যখন সেন্ট্রি তাঁদের একখানা করে বিস্কুট আর এক মগ করে চা দিয়ে যায়। সুলতান মুনশী সিগারেট খাবেন কিনা, জানতে চায় লোকটি। বিহারীদের সাথে তাঁর ভাঙা-ভাঙা উর্দূতে কথা বলার অভ্যেস ছিলো। তিনি সেই উর্দূতে জবাব দেন, খাইনে।

মোসলেম কিন্তু বিড়ি খেতেন। তবু তিনিও সিগারেট নেননি। কিন্তু পরে যখন নেশার টান অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন সুলতান মুনশীকে বলেছেন, চাচা, একটা সিগারেট নিয়ে দিন। সুলতান মুনশী তাঁকে বকুনি দিয়ে শান্ত করতেন। ক্যাম্পে এরকমটি ঘটে অনেকবার।

ডাং ক্যাম্পে তাঁরা ছিলেন দিন ছয়েক। সেখানে প্রত্যেক দিন সকালে নাশতার পর তাঁদের উদ্দেশে সেন্ট্রির হুকুম হত, কুস্তি করো। এই কুস্তির অর্থ ঘুষোঘুষি। হুকুমমাফিক সুলতান মুনশী আর মোসলেম ঘুষোঘুষি করেন। কিন্তু এক-একজন এক-একভাবে। ভৃত্য বলে মোসলেম সুলতান মুনশীকে মান্য করেন। তাঁর শরীরও ছিলো দুর্বল। তিনি যখন ধরা পড়েন, তখন তাঁর ওপর হানাদারসুলভ অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। রাইফেলের আঘাতে তাঁর ডান হাঁটুর মালা ফেটে গিয়েছিলো। তিনি কোনো চিকিৎসা পাননি। ফলে জায়গাটায় পুঁজ জমে যায়। তার সঙ্গে ছিলো যন্ত্রণা। এই সব কারণে মোসলেমের মার হত আস্তে।

পশু সেন্ট্রি কিন্তু অতো শত জানে না, জানলেও তার ধার ধারে না। মোসলেমকে আস্তে ঘুষি দিতে দেখে সে ক্ষেপে যায়। দুজনকে বুট দিয়ে লাথি মেরে আর গালাগালি করে নতুন হুকুম ঝাড়ে, জোরসে মারো।

ঘুষোঘুষিটি ছিলো তাঁদের ওপর নির্যাতনের প্রাথমিক পর্যায়। দ্বিতীয়

পর্যায়ের নির্যাতন চলতো পরে, দুপুরে। ডাং ক্যাম্পে তখন বাঙ্কার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। তার জন্যে সাতবাড়িয়া গ্রাম থেকে কিছু মজুর আসে। তারা মাটি কাটে। মোসলেম আর সুলতান মুনশীকে নিয়ে যাওয়া হত তাদের কাছে। কিন্তু কোদাল চালানো নয়, মাটিভর্তি ঝুড়ি মাথায় করে বইবার জন্যে। মোসলেম জখমওয়ালা মানুষ। সে-কারণে তিনি শাস্তিটা থেকে রেহাই পেতেন। কিন্তু সুলতান মুনশীর রেহাই মেলেনি।

তিনি ছিলেন মজুরদের একজনের চেনা। সে তাই অন্য মজুরদের বলতো, ইনি ভদ্রলোক, এঁর ঝুড়িতে বেশী মাটি দিয়ো না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তারা বরং আরো বেশী করে মাটি দেয়। সেই মাটি ভেজা। তাই দারুণ ভারী। সুলতান মুনশী বইতে পারেন না, পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে হানাদাররা ছুটে এসে লাথি মারে আর গালাগালি দেয়।

দুপুরে এমনি খাটনির পর খাওয়ার পালা। খাবার রুটি আর ছোলার ডাল। সামান্য পরিমাণে। খাবার দেওয়ার সময়ই বলে রাখা হত, বিকেলের পায়খানা-পেশাব আগেই সেরে নেবে। রাত্তিরে কাউকে কোথাও যেতে দেওয়ার হুকুম নেই।

পেশাব-পায়খানার ভয়ে সুলতান মুনশীরা বিকেলে কিছুই মুখে তুলতেন না।

ডাং ক্যাম্পের দ্বিতীয় সকালে তিনি আর মোসলেম কুস্তির সাজা থেকে একটু রেহাই পান। তখন ভোরবেলা। তাঁদের ঘুষোঘুষির জায়গার কাছেই ছিলো এক সুবেদার। সে নামাজের পর কোরাণ তেলাওয়াত সেরে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ায়। তাঁদের দুরবস্থা দেখে বলে, থাক, আর কুস্তি লড়তে হবে না।

সেদিন রাত দেড়টা-দুটোর সময় একজন সেন্ট্রি এসে দাঁড়ায় সুলতান মুনশীর কাছে। বলে, তোমাকে লেফটেন্যান্ট সাহেব ডাকছেন।

তিনি লেফটেন্যান্টের কাছে গিয়ে শোনেন, তাঁকে ভেড়ামারা যেতে হবে।

হুকুম অনুযায়ী তিনি একখানা মিলিটারি ভ্যানে উঠে ভেড়ামারার দিকে রওনা হন। সঙ্গে কয়েকজন হানাদার।

বার দুয়েক থামার পর কুঠিবাজারের হানাদার ক্যাম্প ছাড়িয়ে রূপাঞ্জলি সিনেমা হলের কাছে এসে সঙ্গীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, রুশুর বাড়ী আর কতো দূর।

বাড়ীটা কাছেই ছিলো। সুলতান মুনশী নির্দেশ দিয়ে তাদের সেখানে নিয়ে আসেন। লেফটেন্যান্ট এবার গাড়ী থেকে নেমে ভেতরে যায়। তাঁকে গাড়ীতে

তার সৈন্যদের জিম্মায় রেখে। বেরিয়ে আসে একটু পরই, রুণুকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে। তাকে বলে, আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।

রুণু ইংরেজীতে তাকে কিছু বলে। সুলতান মুনশী বুঝতে পারেন না। শুধু দেখেন, রুণু একটু পরই গাড়ীতে এসে ওঠে। তার জায়গা হয় লেফটেন্যান্টের পাশে। সুলতান মুনশী বসেন পেছন দিকে।

এরপর গাড়ী ডাং ক্যাম্পে ফিরে আসে। এবং তাঁকে সেখানে ফেরত দিয়ে, লেফটেন্যান্ট রুণুকে নিয়ে আবার ভেড়ামারায় যায়।

পরদিন, ১৪ আগস্ট, দুপুরে খাবারের বহর দেখে সুলতান মুনশী অবাক। তাঁদের পাতে অন্যান্য দিনের ডাল–রুটির জায়গায় পোলাও আর খাসির গোশ। তা–ব্যাপারটা কি? জানা যায়, ১৪ আগস্ট তো স্বাধীনতা দিবস। এই উপলক্ষে খাবারের এমন ব্যবস্থা। ভালো কথা! সেদিন দুপুরের খাবারটা তাঁরা তৃপ্তির সাথেই খান।

১৬ আগস্ট আবার তাঁর ডাক পড়ে। বেলা বারোটা–সাড়ে বারোটায়। এবারের ডাক শুধু তাঁর জন্যে নয়। মোসলেমকেও যেতে হবে।

তাঁরা লেফটেন্যান্টের সামনে যেতেই সংক্ষেপে হুকুম হয়, গাড়ীতে উঠে পড়ো।

তাঁদের সামনে দুখানা গাড়ী। একখানায় একজন আহত সৈন্য। তাঁরা সেইখানায় চলে যান। লেফটেন্যান্ট ওঠে অন্যখানায়। দুই গাড়ী এক সঙ্গেই ভেড়ামারার দিকে রওনা হয়।

থামে ভেড়ামারা ঘাটে এসে। লেফটেন্যান্ট সেখানে নেমে তাঁদের গাড়ীর ড্রাইভারকে বলে যায়, গাড়ী সাইড করে রাখো। তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁরা ড্রাইভারসহ ভেতরেই বসে থাকেন।

কিছুক্ষণ পর লেফটেন্যান্ট আবার তাঁদের গাড়ীর কাছে আসে। এবারে গায়ে ওয়াটারপ্রুফ চড়িয়ে, ছাতা মাথায় দিয়ে। বলে, আচ্ছা, আমার সেপাইয়েরা কি তোমাদের ওপর কোনো অত্যাচার করেছে?

কথাগুলো লোকটা বলে বাংলায়। যদিও সে পাঞ্জাবী। সে বাংলা, ইংরেজী, উর্দূ–তিন ভাষাই বলতে পারতো।

সুলতান মুনশী মোসলেমের জখমের দিকে ইঙ্গিত করেন, দেখুন, কেমন অবস্থা।

লোকটি জখম দেখে হাসে। বলে, তুমি রুণুর কাছে যাও। তার সাথে দেখা করো। তারপর বাড়ী চলে যেয়ো।

তিনি রুণুদের বাড়ী যান। রুণুর মা তাঁকে হাত-মুখ ধুইয়ে খেতে দেন। রুণু তখন বাড়ীতেই ছিলো। সে বলে, আপনি আলোর সঙ্গে দেখা করুন।

সুলতান মুনশী বলেন, দেখো, বাবা, তোমার সঙ্গে যখন লেফটেন্যান্ট সাহেবের ভাব আছে, তুমি একটা মিটমাট করিয়ে দাও।

রুণু সেকথা কানেই তোলে না। উলটে ভয় দেখায়, আপনি আলোর কাছে যান। তাকে ফিরে আসতে বলুন। তা যদি না পারেন, সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে।

সুলতান মুনশী আর কথা বাড়ান না। শুধু বলেন, যাবে তো যাক।

বলেই তিনি বাড়ীর দিকে রওনা হন।

বাড়ীর কাছে এসে তিনি দেখেন, তাঁর বৃদ্ধা মা পথে বেরিয়ে এসে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন।

এর ঠিক তিন দিন পর রুণু তাঁকে ডেকে পাঠায়। বলে, ডাং ক্যাম্পের লেফটেন্যান্ট খবর পাঠিয়েছে। তার সাথে দেখা করুন।

তিনি তখনই রওনা হন।

হরিশঙ্করায় বাস থেকে নামতেই দুজন রাজাকার ছুটে এসে তাঁকে বলে, আপনাকে ডাকছে।

তিনি রাজাকার ক্যাম্পে গিয়ে ঢোকেন। সেখানে রাজাকারদের কর্তাটিকে চেনা-চেনা মনে হয়। কথায় কথায় জানা যায়, লোকটির নাম মজিবর। বাড়ী গাছিরদিয়াড় গ্রামে। তিনি মাঝে মাঝে তাদের বাড়ী যেতেন।

আলাপ-পরিচয়ের পর রাজাকার কমাণ্ডার বলে, আপনাকে যখন ধরে, আমি তখন বাড়ীতে। আমার বড়ো ভাই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী গিয়ে খবর দেয়। সে আমাকে তখনই চলে আসতে বলে। আমি এসেওছিলাম। কিন্তু আপনাকে পাইনি। তা-এখন কোথায় যাচ্ছেন?

সুলতান মুনশী সব জানান।

মজিবর বলে, ঠিক আছে। আমি এই ক্যাম্পে রাত দুটো পর্যন্ত আছি। আপনি যদি এর মধ্যে ফিরে না আসেন, আমিও ডাং ক্যাম্পে যাবো।

তিনি ডাং পৌছন বিকেল সাড়ে তিনটে-চারটেয়। লেফটেন্যান্ট তখন ক্যাম্পে নেই। সেন্ট্রি জানায়, ক্যাপ্টেন আমানউল্লাহ্ আছেন। তাঁর সাথে দেখা করুন।

সুলতান মুনশী ক্যাপ্টেনের কাছে যান। তার অনুমতি নিয়ে বাংলায় তাঁর বক্তব্য জানান। সব শুনে ক্যাপ্টেন বলে, আপনি সেন্ট্রির কাছে গিয়ে বসুন।

লেফটেন্যান্ট সাহেব এলে তাঁর সাথে দেখা করে বাড়ী চলে যাবেন।

সন্ধ্যে ছয়টা–সাড়ে ছয়টায় ভারত সীমান্ত থেকে খুব গোলাগুলির আওয়াজ আসতে থাকে। রাজাকাররা তখন ছুটতে ছুটতে এসে তাঁর ঘরের ভেতরকার বাঙ্কারে ঢুকতে শুরু করে।

সেন্ট্রি তাঁকে শুধায়, কি, ভাই, ভয় লাগছে?

তিনি জবাব দেন, হ্যাঁ, ভাই, খুব ভয় লাগছে। আমি এখন কি করি, বলো তো?

এই সময় এক সুবেদার আসে তাঁদের কাছে। সে বলে, লেফটেন্যান্ট সাহেব তো এখনো এলেন না। তুমি বাড়ী চলে যাও। কাল ভোরে এসো।

তিনি এবার বেরিয়ে আসেন। পথে তখন জায়গায় জায়গায় লোকজন বসে আছে। তিনি তাদের কাছে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই চান। কিন্তু তারা বলে, আমাদেরই মাথা গোঁজার ঠাঁই মেলেনি। আপনাকে দেব কোত্থেকে?

সুলতান মুনশী তখন তিন মাইল হেঁটে হরিশঙ্করা রাজাকার ক্যাম্পে আসেন। আশ্রয় তাঁর প্রথমে সেখানেও মেলেনি। কেননা, তিনি সেখানকার রাজাকারদের কাছে অচেনা। পরে অবশ্যি রাজাকার কমাণ্ডার মজিবরের উদ্যোগে তাঁর থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। রাত্তিরে তারা তাঁকে থাকতে দেয় একটি অন্ধকার ঘরে।

পরদিন সকালে একটি দোকানে নাশতা সেরে তিনি মজিবরকে বলেন, লেফটেন্যান্ট সাহেবের সাথে তো দেখা হল না। এখন আমি কি করি?

মজিবর জবাব দেয়, আপনি বাড়ী চলে যান। যা করবার, আমি করবো।

সুলতান মুনশী বাড়ী ফিরে আসেন।

কিন্তু তারপর প্রতি দিন দৌলতপুর জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়া–আসা করেন। ওটা তাঁর চাকরিস্থল।

একদিন সেখান থেকে ফেরবার পথে তিনি লেফটেন্যান্টের সামনে পড়ে যান। ভেড়ামারা ঘাটে। লোকটি তাঁকে বলে, তুমি ইণ্ডিয়া যাওনি?

তিনি উত্তর দেন, কেন, স্যার, একথা কেন? আপনাকে তো সব সময়ই বলে আসছি, আমি কখনো ইণ্ডিয়ায় যাইনি, যাবোও না। তবু যদি এই সব জিজ্ঞেস করেন, আমি আর কি করতে পারি?

এতোক্ষণ দুজনের কথা হচ্ছিলো উর্দুতে। এবার লেফটেন্যান্ট বাংলায় জানতে চায়, তুমি যে কয় দিন অফিসে যাওনি, তার কি করেছো?

ঃ আমার সরকারী চাকরি। ক্যাজুয়াল লীভ পাওনা আছে। আমার

ওপরওয়ালাকে লিখে জানিয়েছি, মিলিটারির হাতে ধরা পড়েছিলাম। গরহাজিরার দিনগুলোর জন্যে যেন ক্যাজুয়াল লীভ কেটে নেয়া হয়।

কিছুক্ষণ পর লেফটেন্যান্ট উর্দূতে ফিরে যায়, বাড়ী ফেরবার আগে একবার আমার সাথে দেখা করবে। জি.কে. কলোনির ভি.আই.পি. রেস্ট হাউসে।

তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সুলতান মুনশী শ্রান্ত এবং ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা দরকার। তবু রেস্ট হাউসে যেতে হয়।

লোকটির দেখা মেলে প্রায় ঘন্টাখানেক পর। সুলতান মুনশী তখন মরিয়া। মুখে যা আসে, বলে যান, আমাদের বাড়ীর কাহিনী শুনবেন? আমার এক ভাই জহুরুল হক (রাজা মিয়া) এম. পি. এ.। আর এক ভাই সা'দ আহমদ কুষ্টিয়ায় পীস কমিটির চেয়ারম্যান। আমি সরকারী চাকুরে। আমাকে নিয়ে টানাটানি করে লাভ কি?

লেফটেন্যান্ট শুয়ে ছিলো। লাফ দিয়ে উঠে দরজা বন্ধ করে আসে। আবার শুয়ে পড়ে বলে, তোমাকে ভালো দেখে মেয়ে যোগান দিতে হবে।

প্রস্তাব শুনে সুলতান মুনশী থ'। কিছুক্ষণ পর কোনো রকমে জবাব দেন, ভেড়ামারায় এখন কোনো পরিবারে মেয়ে নেই। সবাইকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

এরপর কি হুকুম হত, কে জানে! কিন্তু হঠাৎ ফোন আসে। লেফটেন্যান্ট ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে কুমিল্লার এক অফিসারের আবির্ভাব ঘটে কামরায়। সে লেফটেন্যান্টের খাটে বসে সুলতান মুনশীর সঙ্গে কথা জুড়ে দেয়।

তখন বেলা শেষ হয়ে আসছে। সুলতান মুনশী বলেন, আমাকে যদি এখন যেতে দেন, বাড়ী গিয়ে মাগরেবের নামাজ পড়ি।

পরদিন সকালে তিনি ভেড়ামারার কাছে মোকারিমপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলের দালাল চেয়ারম্যান আজিজুল হক (রাজাকার), ভেড়ামারার দালাল চেয়ারম্যান হাজী হামেজউদ্দীন (রাজাকার) আর ও.সি.-র সাথে দেখা করেন। বলেন, এখন মেয়ে যোগান।

তাঁরা ফোনে ব্যাপারটা যশোরে ব্রিগেডিয়ারকে জানান। ফলে ওই দিনই ভেড়ামারার লেফটেন্যান্টকে তার সকল সহযোগী কর্মকর্তাসহ বদলি করে দেওয়া হয়। সুলতান মুনশী রেহাই পান।

কিন্তু কেবল তখনকার মতো।

দিন কয়েক পর তিনি দৌলতপুর অফিস থেকে বাড়ী ফিরছেন। পথের পাশে হানাদারদের এক ক্যাম্প। হঠাৎ সেখান থেকে ডাক পড়ে। তা-কি

ব্যাপার? না, তিনি হিন্দু, না, মুসলমান, তা প্রমাণসহ জানাতে হবে। মুসলমান বলে দাবী করলে কলেমাজ্ঞানের পরীক্ষাসহ।

সুলতান মুনশী পরীক্ষায় নিরাপদেই উৎরে যান।

তারপর একথা সেকথার শেষে দাবী, আলোর ঠিকানা বলো।

ঃ তার ঠিকানা তো জানিনে।

সেখানে আবদুল মান্নান নামে এক বিহারী রাজাকার ছিলো। সে হঠাৎ তাঁর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে ওঠে, যে কোনো একটা ঠিকানা দিয়ে সরে পড়ো।

সুলতান মুনশী তার পরামর্শ মতো একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে চলে আসেন। তাঁর ওপর নির্যাতন শেষ হয়।

১১ থেকে ১৬ আগস্ট তক তাঁর ওপর যে নির্যাতন চলে, সেটি ছিলো প্রথম পর্বের। এবং প্রধানতঃ শারীরিক নির্যাতনের। দ্বিতীয় পর্বের নির্যাতন হয় মানসিক। দুই নির্যাতনেরই ফল কিন্তু তিনি ভোগ করেন দীর্ঘ দিন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তিনি কষ্ট পান অশেষ। একবার প্লুরিসিও হয়। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে থেকেছেন, চিকিৎসার জন্যে ব্যয় করেছেন প্রচুর। এক কালে মোটামুটি হিসেবে শক্তসমর্থ মানুষ, সুলতান মুনশী 'একাত্তরের শারীরিক নির্যাতনজনিত দুর্বলতা এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

তাঁর কাহিনী এইখানেই শেষ। কিন্তু কথা আরো কিছু আছে। সেসব না বললে এই অধ্যায় সম্পূর্ণ হবে না।

কথাগুলি অবশ্যি সুলতান মুনশী সম্পর্কিত নয়, তাঁর নির্যাতনভোগের প্রথম পর্বের সহবন্দী মোসলেম বিষয়ক।

মোসলেমও হানাদারদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন সুলতান মুনশীর সাথেই, ১৬ আগস্ট। তারপর দু'দিন ভেড়ামারাতেই থেকে যান। পায়ের জখমের জন্যে তিনি তখন খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর তেমন কোনো চিকিৎসাই হয়নি।

আসলে তাঁর সারাটি জীবনই ছিলো দুঃখের আর কষ্টের। ষোলোদাগে তিনি আসেন উত্তর-পশ্চিমের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে। পৈতৃক নিবাস ফিলিপনগরে। তিন কুলে কেউ ছিলো না। দিন কেটেছে ষোলোদাগের একটিমাত্র পাড়ায়। কখনো এর বাড়ী, কখনো বা ওর বাড়ী চাকরি করে, নয়তো আশ্রিত হয়ে থেকে। এদিকে, প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাস, তাঁকে নিঃস্ব, নিঃসহায়, নিরাত্মীয় করেই তার সাধ মেটেনি, তাঁর একটি চোখও সে কেড়ে নিয়েছিলো। তাঁর তাই কখনো আপন ঠিকানা, আপন সংসার বলতে কিছু জোটেনি। যা পেয়েছেন, তা

কেবল আবালবৃদ্ধের অবজ্ঞামিশ্রিত করুণা, 'মোসলেম কানা' বলে ঠাট্টা। সর্ব ব্যাপারে অবহেলা।

তবু তিনি স্মরণীয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাঁরও তো একটুখানি অবদান ছিলো। আর, তারই জন্যে তিনি নির্যাতন ভোগ করেন।

সম্ভবতঃ ১৯৮৭ সালে তাঁর সব দুঃখ-কষ্টের চির অবসান ঘটে।

এই অধ্যায়ে তাঁর সম্পর্কে লেখা কথা কয়টি তাঁর উদ্দেশে আমার সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি হয়ে থাক।

পার হলে পাটনী শালা

মোসলেম আর সুলতান মুনশীর কথায় মনে পড়ে তাঁদের গ্রাম ঘোলোদাগের আরো কয়েকজনের কথা। যাঁরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অকারণে। হানাদারদের চোখে সুলতান মুনশী আর মোসলেমের যেমনি হোক একটা 'অপরাধ' ছিলো। প্রথমজন পলাতক এক আওয়ামী লীগারকে টাকা দিতে চেয়েছেন। তিনি আবার রাজনৈতিকভাবে সচেতনও ছিলেন। আর, মোসলেমের 'অপরাধ'-তিনি পলাতক আলোর জন্যে চিঠি নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁদের গ্রামে আর যাঁরা নির্যাতনের শিকার হন, তাঁদের দোষটা কী? তাঁরা তো ছিলেন একেবারে আদনা মানুষ, গ্রামের অতি সাধারণ, সাদাসিধে লোক।

সবার কথা এখানে বলার সাধ্যি আমার নেই। কিন্তু আমীরুল, লতীফ আর বাদশার কথা যদি না বলি, সেটা হবে পাপ। তাঁদের সঙ্গী বক্করের কথা না বললেও। তাঁদের কাহিনী রীতিমতো বিস্ময়ের। সেই সঙ্গেই চরম এক নিমকহারামির। আমাদের এক লোকপ্রবাদ ঃ পার হলে পাটনী শালা। যার কৃপায় নদীর পাড়ে পৌঁছলাম, তাকে কড়ি দেওয়ার বদলে গাল দিয়ে বানাই বড়ো কুটুম। আমীরুলের সাথে হানাদারদের আচরণ যেন তারই এক 'একান্তরী

প্রতিরূপ। তবে, ’একাত্তরী বলে তার থেকে অনেক অনেক বড়ো, অনেক অনেক ঘৃণার—এবং অবশ্যই অনেক অনেক পশুসুলভ।

আমীরুল পুরো নামে মোহাম্মদ আমীরুল ইসলাম মালিথা। ষোলোদাগের সবচেয়ে বড়ো পাড়ার মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী মালিথার ছেলে তিনি। বংশগত পেশায় তাঁরা চাষী। কিন্তু ’একাত্তরে অভাবে পড়ে কিছু দিনের জন্যে ধরেন গাড়োয়ানি। গ্রামের আরো কয়েকজনের সাথে মিলে। তখন আষাঢ় মাস, বর্ষার দরুন গ্রামে কাজকর্ম বলতে তেমন কিছুই নেই। তাঁরা মোষের গাড়ী নিয়ে ভেড়ামারা–পাকশী ফেরি ঘাটে – পদ্মা নদীর ধারে ভাড়া টানেন।

তা—কাজটা চলে মন্দ না। ভাড়া তেমন নিয়মিত নয়। আয় তাই সামান্যই। তবু তো আয়। তার ওপর, কাজটায় হাঙ্গামা কম। শুধু, কাঁচা পথে ঘাটে গিয়ে তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতে হয়। কখন্ ঘাটে ভাড়ায় টানার মতো মালামাল আসে, তারই অপেক্ষায়।

সেদিন তাঁরা এমনি বসে আছেন ভাড়ার অপেক্ষায়। মোষগুলোকে আশপাশে চরবার জন্যে জোয়াল থেকে খুলে দিয়ে। এক সময় ভেড়ামারার দিক থেকে চারখানা ট্রাক আসে হানাদারদের। বেলা তখন ন’টার মতো। ফেরি এসে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। তারা তাতে চেপে ওপার যাবে। কিন্তু পাড় আর ফেরির মাঝখানে একটুখানি পানি। হানাদাররা সেই পানি ভাঙতে রাজী নয়। আমীরুলদের উদ্দেশে হুকুম হয়, পার করে দাও।

এই পার করানোর অর্থ শুধু একটাই। হানাদারদের কোলে কাঁধে তুলে ফেরিতে উঠিয়ে দেওয়া। আমীরুলেরা নিরুপায়। দত্যির মতো হানাদারগুলোকে একে একে কোলে করে ফেরির ওপর নিয়ে যান। দলে তাঁরা ছিলেন চারজন, – তাঁরা সবাই মিলে।

তারপর তাঁদের আপন কাজের পালা। ফেরিতে ওপার থেকে মাল এসেছে। সেসব তাঁরা নামিয়ে গাড়ীতে ওঠান। এখন ছেড়ে–দিয়ে–রাখা মোষগুলো ফিরিয়ে এনে জোয়ালে জুড়ে দিলেই রওনা হওয়া যায়।

কিন্তু তাঁরা মোষের কাছে যাওয়ার আগেই বাধা পড়ে। ঘাট থেকে পঁচিশ–ত্রিশ গজ দূরে হানাদারদের ক্যাম্প। সেখানে হঠাৎ কে যেন বাঁশী বাজায়। সঙ্গে সঙ্গে একজন হানাদার ছুটে আসে তাঁদের দিকে। আর, এসেই শুরু করে তাঁদের বেধড়ক মারতে। তাঁদেরই হাতের পাচনবাড়ি কেড়ে নিয়ে, আমীরুলদের বিস্ময়ে বোবা বানিয়ে। এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত ! এক পাল

হানাদারকে বোঝার মতো বয়ে ফেরিতে তুলে দেওয়ার এই ফল ! কোথায় থাকে মালামাল, কোথায় থাকে মোষ! তাঁদের এখন জান নিয়ে টানাটানি।

আমীরুলদের বিস্ময়ের অবশ্যি সেইখানেই শেষ নয়। এবং মারপিটেরও। হানাদারটি একা চারজনকে মারছে। তাতে বোধ হয় ক্যাম্পের অন্য হানাদাররা মনে সুখ পাচ্ছিলো না। তাই একটু পরই সেখান থেকে আমীরুলদের কাছে ছুটে আসে আরো কয়েকজন। তারা তাঁদের প্রত্যেককে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। তারপর টেনে নিয়ে যায় নদীর ধারে, এক–একজন করে। আর, সেখানে আবার চলে বেদম মার। সেই সঙ্গে তাদের ভাষায় উদ্ধত এক প্রশ্ন ঃ এই শালা, তুই মুক্তি?

তাঁরা জবাব দেন, না।

ঃ তোদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কোনো মুক্তি আছে?

এবারও তাঁদের একই জবাব, না।

তাঁরা চারজন – আমীরুল, খোরশেদ আলী সর্দারের ছেলে বক্কর আলী, তজিমউদ্দীন প্রামাণিকের ছেলে আবদুল লতীফ আর কফিলউদ্দীন প্রামাণিকের ছেলে বাদশা। জবাব তাঁরা ঠিক করে রেখেছিলেন আগেই। হানাদাররা ওই জাতীয় কিছু শুধালে 'না' ছাড়া আর কিছুই বলবেন না। অথচ আমীরুলের নিজের ছোটো ভাই শহীদুল ইসলাম তখন ভেড়ামারা থানার মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার। আর, ষোলোদাগে তো মুক্তিবাহিনীর ছেলে অনেক। আমীরুলদের সিদ্ধান্ত, মরতে হলে সবাই মরবেন, কোনো মুক্তিযোদ্ধার নাম তাঁদের মুখ থেকে বেরুবে না।

হানাদারদের প্রশ্ন অবশ্যি আরো ছিলো, পীস কমিটিতে তোদের চেনা কেউ আছে?

আমীরুলেরা জানান, হ্যাঁ, আছে। সে কমিটির চেয়ারম্যান। তার বাড়ী ভেড়ামারায়।

জবাব শুনে হানাদাররা বক্করকে ছেড়ে দেয়। বলে, যা, চেয়ারম্যানকে ডেকে নিয়ে আয়।

বেলা তখন এগারোটা।

হুকুম শুনে বক্কর চলে যান। বাকী তিনজন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে পড়ে থাকেন।

না, ঠিক এক জায়গায় নয়। হানাদাররা তাঁদের নিয়ে যায় এক জঙ্গলের পাশে। সেখানে রোদের মধ্যে বসিয়ে শুরু করে ভয় দেখানো। যতো রকমে

সম্ভব।

এমনি ভয় দেখানো চলে একটানা ঘন্টা দুয়েক।

তারপর আসে আর এক হানাদার। সে তাঁদের নিয়ে যায় জঙ্গলের ভেতরে। এক রাশ কাঁটাওয়ালা ডাল বিছিয়ে হুকুম করে, এর ওপর শুয়ে পড়।

রূপকথায় 'হেঁটোয় কাঁটা ওপরে কাঁটা'-র গল্প আমাদের শোনা আছে। তাতে অপরাধীকে জোর করে কাঁটার ওপর শুইয়ে ওপরে কাঁটা বিছিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হত। আমীরুলদের ব্যাপারটা যেন তারই এক মিনি সংস্করণ। শুধু, তাঁদের জোর করে কাঁটার ওপর শোয়ানো হয় না, বলা হয় নিজের থেকে শুতে। কিন্তু তা কি কেউ পারে?

আমীরুলদের তাও পারতে হয়। অন্ততঃ চেষ্টা করতে। কেননা, যম সামনে দাঁড়িয়ে।

তবু তাঁরা ঠিক পারেন না। বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও।

শেষে হানাদাররাই রূপকথার জল্লাদের ভূমিকা নেয়। তারা তাঁদের তিনজনকে মারতে মারতে কাঁটার ডালের ওপর পেড়ে ফেলে।

আমীরুলেরা সেই ধরা পড়ার পর থেকেই অনবরত মার খাচ্ছেন। তাতে সারা শরীর ফুলে গেছে। হাতে দড়ির বাঁধনের জায়গাগুলো টনটন করছে। তাঁদের কেবল ছটফটানি। পশুগুলোর মার তবু থামে না।

শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাঁরা কাতরানোর শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা এমনি নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন প্রায় দুই ঘন্টা।

তারপর, বেলা তিনটের দিকে, হানাদাররা তাঁদের আবার ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বলে, পীস কমিটির চেয়ারম্যান তোদের বাপ, কেমন? সে ফোন করেছিলো। তোরা চলে যা।

যাওয়ার আগে আমীরুলকে আর এক দফা নরকযন্ত্রণা সইতে হয়।

তাঁর হাতে ছিলো একটা সোনার আংটি। হানাদাররা সেটা খুলে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। মার খেতে খেতে তাঁর হাতের আঙুল শুদ্ধ ফুলে গিয়েছিলো। তার ফলে আংটি আঙুলে সেঁটে বসে আছে। হাজার টানাটানিতেও বেরোয় না।

শেষে এক হানাদার হাতের ওপর বুট দিয়ে চাপ দেয়। যাতে আংটিটা ভেঙে খুলে আসে। কিন্তু আংটি তবু অনড়।

বাধ্য হয়ে হানাদাররা এবার তাঁদের ছেড়ে দেয়।

কিন্তু তাঁদের তো তখন এমনিতে যাওয়ার উপায় নেই। তাঁরা তখন কোনো

রকমে শ্বাস টানছেন। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। বোধ হয় তাই দেখেই হানাদাররা তিনজনকে তাঁদেরই গাড়ীতে তুলে দেয়, ঘাট থেকে একজন লোক ডেকে তাঁদের বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিতে বলে।

আমীরুল, বাদশা আর লতীফের যন্ত্রণার সেইখানেই শেষ নয়। তার জের চলে দীর্ঘ দিন। তাঁরা সুস্থ হয়ে ওঠেন একটানা চার মাসের চিকিৎসার পর।

প্রতিরোধের প্রতিশোধ

না, ঠিক চার মাস নয়, তবে দীর্ঘ দিন চিকিৎসা করাতে হয়েছিলো আর একজনকে। প্রায় তিন মাস। তিনিও ষোলোদাগের মানুষ। আহাদ আলীর ছেলে রতন আলী। যুদ্ধের সময় যিনি ছিলেন বছর তিরিশের তরুণ। আমীরুল আর তাঁর সঙ্গীদের মতো তিনিও চাষী পরিবারের সন্তান।

তবে, তাঁদের মতো 'নির্দোষ' তিনি ছিলেন না। ষোলোদাগের হানাদারদের হাতে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে যাঁরা নির্যাতিত হন, তিনি তাঁদেরই একজন। এবং তাঁর একটি বড়ো 'অপরাধ' ছিলো, যেমন ছিলো গ্রামটির আরো অনেকের। সেই 'অপরাধ' হানাদারদের একটি পশুসুলভ হামলা প্রতিরোধের। তারা তারই একটু প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে তাঁকে ধরে নির্যাতন চালিয়ে।

রতন আলী অবশ্যি তাদের প্রতিশোধের স্পৃহা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। কেননা, প্রতিরোধটিতে সামিল হয় গ্রামের অনেক মানুষ, দল বেঁধে। দুশমনরা তাদের ভেতর থেকে বিশেষ কাউকে চিনে রাখবে, এটা তিনি ভাবতে পারেননি।

আর, তা পারেননি বলেই তাঁকে পড়তে হয়েছিলো হানাদারদের কবলে। অতর্কিত হামলার শিকার হয়ে।

ঘটনাটি ’একাত্তরের এপ্রিলের শেষ দিকের।

হার্ডিঞ্জ ব্রীজের পশ্চিম মাথার কাছে, ব্রীজের মাঠ নামে পরিচিত এলাকায়, তাঁদের কিছু জমি ছিলো। আবাদ করতেন তাঁরাই। রতন আলী সেদিন সেই কাজেই মাঠটিতে যান। তিনু মল্লিক নামে একটি লোক আর তাঁর ছেলে আকমলকে সঙ্গে নিয়ে। ধরা পড়েন অবশ্যি শুধু তিনিই। তিনু মল্লিক আর তাঁর ছেলে হানাদারদের সাড়া পেয়েই দৌড়ে পালিয়ে যান। এমনও হতে পারে, হানাদাররা স্বাভাবিকভাবেই গ্রামটির লোকজনের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজছিলো। প্রতিরোধের ঘটনাটির স্মৃতি তখনও তাদের মনে একেবারে টাটকা। তিনু মল্লিক আর তাঁর ছেলের পলায়ন হয়তো তাতে জ্বালা ধরায়। কিংবা তাদের একটি সন্দেহ দৃঢ়মূল করে ঃ এই চাষী তিনজন প্রতিরোধে শরিক ছিলেন।

প্রতিরোধের ঘটনাটি এর ঠিক তিন দিন আগের।

ব্রীজের মুখের ক্যাম্প থেকে হানাদারদের কয়েকজন সেদিন গ্রামে বেরিয়েছিলো নারী লুটের অভিযানে। তাতে তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিলো আসগর নামে একজনের তরুণী স্ত্রী। কিন্তু তারা তাঁর বাড়ীতে চড়াও হতেই আশপাশের লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে ছুটে আসে। একজন একটি খেটে ছুঁড়ে মারে তাদের দিকে। আর একজন বাঁশ দিয়ে পেটায়। এবং সমবেত লোকগুলি তাড়া করে হানাদারদের শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পে ফিরে যেতে বাধ্য করে।

এই লোকজনের মধ্যে রতন আলীও ছিলেন।

হানাদাররা তাঁকে চিনে রাখুক আর না–ই রাখুক, ব্রীজের মাঠে তাঁদের দেখেই ছুটে আসে। পাঁচজনের একটি দল নিয়ে। রতন আলীকে ধরে তারা প্রথমে একটু মারধর করে। চাবুক দিয়ে তিনটি বাড়ি মারে। তারপর তাঁকে নিয়ে যায় ভেড়ামারা ফেরি ঘাট ক্যাম্পে। তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটার মতো।

কিছু তাঁবু আর বাঙ্কার নিয়ে ক্যাম্প। একটি তাঁবুতে ছিলো একজন অফিসার। সে সেখানে থাকাকালে রতন আলীর গায়ে কেউ আর হাত তোলেনি। কিছুক্ষণ পর সে কোথায় জানি চলে যায়। তখন শুরু হয় আসল নির্যাতন। আর, তা চলে বেশ কিছুক্ষণ। একের পর এক চাবুকের বাড়ি মেরে আর বুটের লাথি ঝেড়ে। মাঠের খাটনিতে তিনি আগে থেকেই ক্লান্ত ছিলেন। তারপর এমনি নির্যাতন। রতন আলী চলাফেরার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেন।

মারধরের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নদীর কূলে। ঠেলাগাড়ীতে উঠিয়ে।

একবার নয়, দু'বার। উদ্দেশ্য তাঁকে গুলি করে খতম করে দেওয়া। কিন্তু দু'বারই তিনি বেঁচে যান। ঘটনাক্রমে তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন নজিমউদ্দীন মিস্ত্রী নামে গ্রামের একটি মানুষ। তিনিই হানাদারদের কাকুতি মিনতি করে রতন আলীকে বাঁচিয়ে দেন।

কিন্তু দু'বার বাধা পাওয়ার পর হানাদারগুলির রাগ গিয়ে পড়ে নজিমউদ্দীনেরই ওপর। তারা তাঁকেই আক্রমণ করবে বলে নানাভাবে হুমকি দিতে থাকে। নজিমউদ্দীন তখন বাড়ী চলে যান। অসহায় রতন আলী হানাদারদের কাছে পড়ে থাকেন।

রতন আলীর প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে কাঠ। তিনি একটু পানি খেতে চান। পশুগুলি উত্তরে বলে, পেশাব করে দিচ্ছি। খাবি?

তিনি আর পানির জন্যে অনুরোধ জানাননি।

পরে অবশ্যি তারা পানি দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু তিনি নেননি। একটু পরেই যখন গুলি খেয়ে মরতে হবে, তখন আর পানি খেয়ে লাভ কি? তিনি তেষ্টা বুকে নিয়েই মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে বাড়ীতে খবর পৌছে গিয়েছিলো। তিনু মল্লিক আর আকমলের মাধ্যমে। হয়তো নজিমউদ্দীন মিস্ত্রীও খবর দিয়েছিলেন। খবর শুনে গ্রামের অনেকেই ছুটে যায় হাফেজ আবদুর রশীদের কাছে। ভেড়ামারা হাই ইস্কুলের শিক্ষক, ষোলোদাগের বিশিষ্ট ব্যক্তি হাফেজ রশীদের হানাদারদের সাথে যোগাযোগ ছিলো। সে তাদের কাজকর্ম সমর্থনও করতো। তখন মোটে আটটা বাজে। তবু, রতন আলীর জন্যে যারা তার বাড়ীতে হানাদারদের কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাতে গিয়েছিলো, সে তাদের জবাব দেয়, এখন অনেক রাত। আমার পক্ষে এ-সময়ে কিছু করা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গতঃ হাফেজ রশীদের আর এক কীর্তির কথা।

ভেড়ামারার দিকে হানাদাররা প্রথম আসে ১১ এপ্রিল, পাকশীর দিক থেকে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পার হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে গভীর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ষোলোদাগে। তার ফলে গ্রামটি প্রায় জনহীন হয়ে যায়। লোকজন কয়েক মাইল দূরে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। রতন আলীরা গিয়েছিলেন পশ্চিমের যজ্ঞেশ্বর গ্রামে। হাফেজ রশীদই নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তাঁদের ফিরিয়ে আনে।

সে যা-ই হোক, এক দালালের কাছে নিরাশ হয়ে লোকে অন্য দালালের কথা ভাবে। সে মোকারিমপুর ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আজিজুল হক। আহাদ আলী সর্দার, নজিমউদ্দীন, কফিলউদ্দীন এবং রতনের বাবা আহাদ আলী

আর শ্বশুর ইসহাক তার কাছে গিয়ে ধরনা দেন।

এবারে কিন্তু ফল মেলে। আজিজ চেয়ারম্যান ফোনে ব্রীজের মুখের ক্যাম্প কর্তাদের বলে, এই সব লোকের ওপর যদি অত্যাচার চালানো বা এদের মেরে ফেলা হয়, তাহলে আমি গ্রামে কোনো লোক রাখতে পারবো না। সুতরাং দয়া করে রতনকে ছেড়ে দিন।

রতন আলী ক্যাম্প থেকে ছাড়া পান রাত দশটা–সাড়ে দশটায়। তাঁর ওপর নির্যাতন অবশ্যি তার পরেও চলে। হানাদাররা তাঁর হাত–পা বেঁধে তাঁকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে রেললাইনের ওপর দিয়ে তাঁদের পাড়ার উত্তর মাথা অবধি নিয়ে আসে। সেখান থেকে তাঁর বাড়ী আধ মাইল দূরে। তবু সেইখানেই তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়। তাঁর হাত–পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে।

তিনি এতোক্ষণে মুক্তি পান।

তারপর আর এক মুহূর্তও সবুর করা নয়। তিনি রেললাইনের ঢাল বেয়ে এক দৌড়ে নীচে চলে আসেন। কিন্তু শরীর দুর্বল। এইটুকু মেহনতেই পড়ে যান।

তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে গ্রামের কয়েকজন লোক, কিছুক্ষণ পর।

এবার তাঁর সেবা–শুশ্রূষা আর চিকিৎসার পালা। সেসবের ব্যবস্থাও ওই উদ্ধারকারীরাই করে। ওষুধপত্রের ব্যবস্থাসহ। গ্রাম্য ডাক্তার রহমতের সাহায্যে।

আবার উঠে চলাফেরা করতে তাঁর সময় লাগে সপ্তাহ দশেক।

কিন্তু আজও তিনি ভালোভাবে কাজকর্ম করতে পারেন না। হানাদারদের নিষ্ঠুর দৈহিক নিপীড়নে ভেতরে অনেক আঘাত লেগেছিলো, মাংস থেঁতলে গিয়েছিলো কোথাও কোথাও। অর্থের অভাবে তিনি সেসবের সুচিকিৎসা করাতে পারেননি।

ষোলোদাগের সন্ত্রাসরাজ

রতন আলী ধরা পড়েও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসেন, যেমন এসেছিলেন সুলতান মুনশী আর মোসলেম, আমীরুল আর তাঁর তিন সঙ্গী। তাঁরা ভাগ্যবান। কিন্তু ষোলোদাগের সবার ভাগ্য এক রকম ছিলো না। গ্রামটির বেশীর ভাগ মানুষেরই ভোগান্তি গেছে অশেষ। শহীদ হয়েছেন বেশ কয়েকজন। কেবল বাঙালিত্ব ছাড়া তাঁদের আর কোনো দোষ ছিলো না। তাঁরা কোনো হানাদার বা তাদের সহযোগীদের হাতে ধরাও পড়েননি।

কিন্তু এসব বোধ হয় বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা গ্রামের আয়তন, অবস্থান আর লোকসংখ্যা।

হার্ডিঞ্জ ব্রীজের দক্ষিণ–পশ্চিমে বিরাট এলাকা জুড়ে তার অবস্থান। পূবে পদ্মা নদী, উত্তরে রেললাইন। সেখান দিয়ে হানাদারদের চলাফেরার কোনো অসুবিধা নেই। উত্তরের একটি পাড়ার মাথা রেললাইনের বাঁধ ঘেঁষা, উত্তর–পূবের মাথাটির শুরু হার্ডিঞ্জ ব্রীজের প্রায় পশ্চিম মাথা থেকে। পাকশী–ভেড়ামাড়া ফেরি ঘাট মাত্র কয়েকশো গজ দূরে। পূব পাশ দিয়ে চলে গেছে একটি জাতীয় মহাসড়ক। যার কাছেই গঙ্গা–কপোতাক্ষ প্রকল্পের পাওয়ার হাউস, পাম্প হাউস। দক্ষিণ–পশ্চিমে প্রকল্পের কলোনি, তার থেকে একটু দূরেই জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আর ব্যবসাকেন্দ্র ভেড়ামারা। এমন যার অবস্থান, তার সামরিক গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

এদিকে, আয়তনে আর লোকসংখ্যায়ও সে বিশাল। দৈর্ঘ্যে – উত্তর থেকে দক্ষিণে–ষোলোদাগ কম পক্ষে এক মাইল। প্রস্থেও প্রায় তেমনি। তার মূল পাড়াটিই বাংলাদেশের গড় আয়তনের যে কোনো গ্রামের চেয়ে বড়ো। অন্য পাড়াগুলিরও প্রত্যেকটিই পৃথক্ গ্রাম হওয়ার যোগ্য। কোনো কোনো পাড়া তো বেসরকারীভাবে নিজস্ব গ্রামনাম নিয়েছে অনেক আগেই।

আর, লোকসংখ্যা? আদমশুমারির বিচারে দশ হাজারের ওপর যে জায়গার লোকসংখ্যা, সে শহর। ষোলোদাগ শহর আজ কয়েক দশক যাবৎ। এবং একাই এক ইউনিয়ন প্রায় বিশ বছর আগে থেকে।

এমনি সব কারণে ষোলোদাগের ওপর হানাদারদের বিষনজর পড়ে যুদ্ধকালের প্রায় শুরুতেই। এবং যুদ্ধের প্রায় শেষ দিন তক সেখানে নির্যাতন চলে নানাভাবে। সেই নির্যাতনের শিকার শুধু বিচ্ছিন্নভাবে দুই–চারজন মানুষই হয়নি,

মাঝে মাঝে হয়েছে এক সঙ্গে গ্রামের সবাই। যার মূলে ছিলো এলাকায় সন্ত্রাসরাজ কায়েমের পাকিস্তানী অপচেষ্টা।

সে-কাহিনী বলতে গেলে গোড়ার দিকের কিছু কথা বলতে হয়। যাতে কাহিনীটির সূচনা।

ভেড়ামারা উপজেলা ১০ এপ্রিল তক ছিলো মুক্ত এলাকা, মার্চের শেষ দিকে কুষ্টিয়ায় সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের কারণে। হানাদাররা এই এলাকায় প্রথম আসে পরদিন, পাবনা জেলা থেকে, হার্ডিঞ্জ ব্রীজের উত্তর দিক দিয়ে পদ্মা নদী পার হয়ে। পশ্চিম পাড়ে তাদের সামনে প্রথম পড়ে গোলাপনগর, এরশাদ সরকারের কৃপায় অধুনা লুপ্ত রেলস্টেশন দামুকদিয়ার পাশের গ্রাম। গোলাপনগরে পা দিয়েই তারা শুরু করে বেপরোয়া গুলি চালাতে। তাতে সেখানকার সবার কাছে দরবেশ নামে পরিচিত সোলায়মান বাবা আর তাঁর পাঁচজন শাগরেদ শহীদ হন। খুনীরা চলে যাওয়ার পর কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করে।

উপজেলায় হত্যাযজ্ঞে এই হাতেখড়ির পর খুনীরা এগুতে থাকে দক্ষিণ দিকে। ভেড়ামারা-রায়টা রেললাইন ধরে। পথে তাদের বাধা দেওয়ার মতো প্রস্তুতি বা লোকজন কোথাও ছিলো না। ব্রীজের পশ্চিম মাথায় এতো দিন পাহারা দিয়েছে ই.পি.আর. আর আনসার বাহিনীর সামান্য কজন সদস্য। গোলাপনগরের খবর পেয়েই তারা আত্মরক্ষার জন্যে সরে যায়।

দক্ষিণমুখী যাত্রায় হানাদারদের পথে পড়ে রামকৃষ্ণপুর গ্রাম। তারা তার কয়েকটি বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। মোকারিমপুর ইউনিয়নের তখনকার চেয়ারম্যান হারেসউদ্দীন মুনশীকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি অবশ্যি বৃদ্ধ বলে পরে ছাড়া পান। তবে, কারণ আরো একটি ছিলো। তিনি তখন কুষ্টিয়া জেলা মুসলিম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট।

হানাদাররা ভেড়ামারা তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে ১৩ এপ্রিল। তখন থেকেই সেখানে শুরু হয় গণহত্যা। এলাকায় সন্ত্রাসরাজ কায়েমের প্রথম চেষ্টা। হানাদাররা হুকুম পায়, লোকজনকে দেখামাত্র গুলি করবে। সেই হুকুম শুনে ভেড়ামারা হয়ে যায় বিরান। লোকজন পালিয়ে আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী সাতবাড়িয়া, ধরমপুর ইত্যাদি গ্রামে। এরই মধ্যে তাদের রক্ষা করবার নামে পীস কমিটি গঠন করে এ্যাডভোকেট সা'দ আহমদ, কুষ্টিয়ার জামাতে ইসলামীর কুখ্যাত নেতা। তার 'শান্তি প্রচেষ্টা' সত্ত্বেও ভেড়ামারায় লোক মরে একশোর ওপর।

তাদের মধ্যে ছিলেন ছয়জন পরিচিত আওয়ামী লীগার। এই নেতাদের গুলি

করে হত্যা করা হয় ফেরি ঘাটে।

ভেড়ামারা দখলের প্রায় পর পরই হানাদাররা হার্ডিঞ্জ ব্রীজের পশ্চিম মাথায় ক্যাম্প বসায়। ২০ এপ্রিল এক মেজরের অধীনে খোলা হয় 'টর্চার ক্যাম্প'—নির্যাতন শিবির। গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের—জি. কে. প্রজেক্টের ভি.আই.পি রেস্ট হাউসে। বাড়ীটি ষোলোদাগের কাছেই। দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রকল্পের কলোনিতে।

এই ক্যাম্প আর নির্যাতন শিবির থেকে চালানো অপারেশনের এক বড়ো শিকার হন স্থানীয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারি শামসুল হক। 'দেখামাত্র গুলি করা'-র নির্দেশের ফলে। হানাদাররা তাঁকে মেরে লাশ ফেলে রেখে আসে ভেড়ামারা মসজিদের পাশে। এ-ঘটনা ২৪ এপ্রিলের।

২৫ মার্চের পর থেকে ভেড়ামারা-ঈশ্বরদীর মধ্যে রেল চলাচল ছিলো না। পাকশী-ভেড়ামারা ফেরি ঘাটও থাকে বন্ধ। ২৮ এপ্রিল হানাদারদের ২৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট দুটিই আবার চালু করে। বাইরের এলাকার সাথে তাদের যোগাযোগের সুবিধার জন্যে। বলতে গেলে ২০ এপ্রিল ব্রীজের মুখে ক্যাম্প আর ভি.আই.পি. রেস্ট হাউসে নির্যাতন শিবির খোলার পর থেকেই ষোলোদাগ অবরোধে পড়ে। এবার অবরোধের শক্তি বাড়ে।

অবরোধ পূর্ণতা পায় অবশ্যি মাসখানেক পর, ২৫ মে। যখন ভেড়ামারায় রাজাকার বাহিনীর থানা সংগঠন গঠিত হয়। প্রধানতঃ ভেড়ামারার চেয়ারম্যান হাজী হামেজউদ্দীন, মোকারিমপুরের চেয়ারম্যান আজিজুল হক প্রমুখের সহযোগিতায়।

ব্রীজের মুখে ক্যাম্প বসবার পর থেকেই ষোলোদাগে যা ঘটতে থাকে, তার কিছু বিবরণ আমি দিয়েছি আগেই। রতন আলী আর আমীরুলদের কাহিনীতে। কিন্তু সেসব কাহিনী তো ক্যাম্পে নিয়ে দৈহিক নির্যাতনের। তেমন নির্যাতন চলেছে গ্রামের ভেতরও, অনেকেরই ওপর। অন্যবিধ নির্যাতন আর অত্যাচার ষোলোদাগে ছিলো প্রায় নিত্যকার ব্যাপার। এবং বহুবিচিত্র।

রতন আলীর কাহিনীতে হানাদার লম্পটদের নারী লুটের কথা উঠেছিলো। সেই প্রসঙ্গে আরো কটি কথা বলি।

আসগরের বাড়ীতে হানা দিয়ে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। তার অন্দরে হাত দিতে পারা দূরের কথা, উলটে গণপ্রতিরোধে মার খায়। তবু পশুগুলির আক্কেল হয়নি। বরং তার পরও তারা বারবার হানা দিয়েছে ষোলোদাগের ঘরে ঘরে। এমনকি, ধরেও নিয়ে যায় বেশ কয়েকজন হতভাগিনীকে। তাদের

নাম-ঠিকানা আমি বলবো না বোধগম্য কারণেই। পাঠকদের শুধু জানিয়ে রাখি, আসগরের বাড়ীর ঘটনার পর তারা শুরু করে চোরা অভিযান। যা চালানো হত অতর্কিতে আর সন্তর্পণে লোকের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে, নয়তো রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে।

এক রাতের ঘটনা। ষোলোদাগে যখন পুরো সন্ত্রাসরাজ কায়েম হয়নি, তখনকার।

গ্রামের পশ্চিম অংশে দারোগাপাড়ার এক গরীব বাসিন্দা আবদুল কাদের। তার ঘরে ছোটো-বড়ো চার-পাঁচজন মহিলা। সে-রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ীর সবাই নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ে। নিয়মমাফিক সব দরজায় খিল লাগিয়ে।

তারপর,-গ্রামের রাত সাধারণতঃ সন্ধ্যার পরই গভীর হয়,কিন্তু ষোলোদাগের রাত তখন সত্যি গভীর,-সেই সময় হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ে। সেই সঙ্গেই শোনা যায় ভারী গলার হুকুম, জলদি খোলো।

বাড়ীর লোকজনের ঘুম ভেঙে যায়। ভাষা আর হুকুমের ভঙ্গি শুনে কারো বুঝতে বাকী থাকে না, এই নিশিরাতের মেহমান কারা। এবং তারা কেমন মেহমানদারি চায়। বিপদে পড়ে গরীব মানুষ আবদুল কাদেরের উপস্থিত বুদ্ধি খুলে যায়। একটুখানি ভেবেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। হানাদারদের কোনো ক্রমে কিছুক্ষণের জন্যে ঠেকিয়ে রেখে। তাঁর কাঁচা ঘর, কাঁচা বেড়া। ক্ষিপ্র হাতে বেড়ার এক কোনার বাঁধন কেটে ফেলে সেই পথে মেয়েদের বাইরে ঠেলে দেন। তারপর বেড়াটা টেনে খুঁটির সাথে ভিড়িয়ে রেখে এগিয়ে আসেন দরজার কাছে। ততোক্ষণে মেয়েরা অন্ধকারেই ছুটতে ছুটতে নিরাপদ জায়গায় চলে গেছে।

আবদুল কাদের দরজা খুলতেই হানাদার লম্পটরা ভেতরে ঢুকে পড়ে। গজর গজর করতে করতে ঘরের ভেতর মেয়ে খোঁজে। একোণ থেকে ওকোণে, এপাশ থেকে ওপাশে। কিন্তু হায়, এ-বাড়ী নির্ভেজাল পুরুষপুরী!

কিছু অশ্রাব্য গালাগালির পর লম্পটগুলো চলে যায়। আবদুল কাদের স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

এমনি সব ঘটনার কারণে ষোলোদাগ এক সময় সত্যিই প্রায় পুরুষপুরী হয়ে গিয়েছিলো। গ্রামের অধিকাংশ মেয়েদের পাঠিয়ে দেয় দূরের কোনো গ্রামে। যে দু'চারজনকে রাখে, তাদের বেশীর ভাগই বৃদ্ধা।

এবার আসি অন্য প্রসঙ্গে।

একটু আগেই বলছিলাম, হানাদাররা ষোলোদাগবাসীর ওপর দৈহিক নির্যাতন শুধু ক্যাম্পেই চালায়নি, মাঝে মাঝেই চালিয়েছে গ্রামে ঢুকেও। বিশেষ

করে তখন, যখন তাদের ভয়ে গ্রামবাসীদের অধিকাংশই পলাতক, দূরের কোনো গ্রামে। সেসব সময়ে হানাদাররা গ্রামে ঢুকে চুপে চুপে শিকার খুঁজে বেড়াতো।

একদিন সেই শিকারসন্ধানী দলের সামনে পড়ে যান বড়ো পাড়ার, যার স্থানীয় প্রচলিত নাম বড়ো ষোলোদাগ, তার–মাঝামাঝি জায়গার বাসিন্দা আহমদ আলী মালিথার ছেলে মামুনুর রশীদ ওরফে আলো। তখন ষোলোদাগ প্রায় খালি। হানাদারদের হামলার ভয়ে মামুনুর রশীদেরা থাকতেন অন্য এক গ্রামে। সেখান থেকে তিনি এসেছিলেন বাড়ীর খোঁজখবর নিতে। যেমন আসতেন অন্যরাও, মাঝে মাঝেই। তবে, কেবল বাড়ীর অবস্থা জানার জন্যে নয়, সেখান থেকে দরকারমতো ধান–চাল এবং অন্যান্য জিনিষ নিয়ে যাওয়ার জন্যেও।

মামুনুর রশীদ বাড়ীতে এসে ঘুরে ঘুরে ঘরদোরের অবস্থা দেখছিলেন। এই সময় হঠাৎ কয়েকজন হানাদার উঠোনে ঢুকে পড়ে। এবং তাঁকে দেখেই পাকড়াও করে। তিনি কিছু বলবারও সময় পান না। হানাদাররা কিছু গালাগালি এবং অনাবশ্যক প্রশ্নের পরই শুরু করে বেদম মার। তাদের সন্দেহ, তিনি বহিরাগত কিংবা মুক্তিসেনা। মামুনুর রশীদের ছোটো ভাই হারুণুর রশীদ ওরফে হান্নান অবশ্যি মুক্তিবাহিনীতে ছিলো। কিন্তু মামুনুর রশীদ সহজ সরল মানুষ। রাজনীতি এক–আধটু বুঝলেও তার সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

সে যা–ই হোক, হানাদাররা তাঁকে মারতে মারতে এক সময় তাঁর চোখ বেঁধে ফেলে। তারপর তাঁকে নিয়ে যায় দক্ষিণ দিকে হাফেজ আবদুর রশীদের বাড়ীর সামনে। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আপনি একে চেনেন?

হানাদাররা অন্য কাউকে নিয়ে গেলে হাফেজ রশীদ কি বলতো, সে–ই জানে। কিন্তু এক্ষেত্রে সে একটু বিপদে পড়ে। বন্দী তার সাক্ষাৎ ভাগ্নে। দালাল হাফেজ রশীদ দু'কূল বজায় রাখবার জন্যে আত্মীয়তার কথাটা চেপে গিয়ে শুধু বলে, হ্যাঁ, একে চিনি। আমাদের গ্রামেরই ছেলে।

মামুনুর রশীদ ছাড়া পেলেও গ্রামের অনেকেই পাননি। হানাদাররা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁদের পাকড়াও করে। বেশ কয়েকজনকে মেরেও ফেলে। শহীদদের মধ্যে ছিলো ভেড়ামারা কলেজের বি.কম. ক্লাসের একটি ছাত্র। হানাদাররা তাকে হত্যা করে গ্রাম থেকে বেশ দূরে একটি জায়গায় ফেলে রেখে আসে। তার লাশ গ্রামবাসীদের চোখে পড়ে বিশ–পঁচিশ দিন পর। তাকে সনাক্ত করা গিয়েছিলো গায়ের জামাটি দেখে।

লুটতরাজের অভ্যেসও হানাদারদের নেহাৎ কম ছিলো না। যে কারণেই

হোক, চাল-ডাল বা তরিতরকারির দিকে তারা কখনো হাত বাড়ায়নি। যদিও সেসব জিনিষ ধ্বংস করেছে অনেক। লুটতরাজে বেরুলে তাদের নজর থাকতো, মেয়েছেলের পর, প্রধানতঃ গরু-ছাগল-মুরগী আর ফলমূলের দিকে। গ্রামের বেশ কিছু গরু-ছাগল তারা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলে। তবে, লোভ বেশী ছিলো মুরগীর ওপর। রাত্তিরে হানা দিলে তারা মুরগীর কুঠি খুলে মোরগ-মুরগী ধরে নিয়ে যেতো। কিন্তু দিনের বেলায় সেটি সম্ভব ছিলো না। তখন তো মোরগ-মুরগী চরে বেড়ায়। হানাদাররা তাই ছোটো ছেলেপিলে বা কিশোরদের ভয় দেখিয়ে লাগিয়ে দিতো তাদের ধরতে। বলা বাহুল্য, এসব ক্ষেত্রে তাদের চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছে।

এমনি কতো কাণ্ড!

ষোলোদাগবাসীরা অবশ্যি একবার লুটতরাজের একটুখানি প্রতিশোধও নিয়েছিলো।

সেদিন কেন জানি ভেড়ামারা ফেরি ঘাট ক্যাম্পে দুজন ছাড়া আর কোনো হানাদার ছিলো না। হয়তো তাদের জরুরী কোনো অপারেশনের জন্যে ক্যাম্প এভাবে অরক্ষিত রেখে বেরিয়ে যেতে হয়। বাঘের ঘরে কেউ হামলা করতে পারে, এও হয়তো তারা ভাবতে পারেনি।

তা-আসল ব্যাপার যা-ই হোক, গ্রামবাসীরা ক্যাম্প খালি থাকার কথাটা জেনে ফেলে। তারপর বেশ বড়োসড়ো একটি দল সেখানে গিয়ে হাজির। প্রহরী দুজন তাদের বাধা দিতে সাহস পায়নি। গ্রামবাসীরাও তাদের কিছু না বলে ক্যাম্পের সমস্ত খাবার জিনিষ লুট করে নিয়ে আসে। আটা-ময়দা, তেল-নুন, ঘি-ডালডা ইত্যাদি।

রহস্যের বিষয়, হানাদাররা ফেরবার পর এর প্রতিশোধ নিতে গ্রামে হামলা করেনি।

কিন্তু এ তো ব্যতিক্রমী ঘটনা। হামলা তারা অবশ্যই করেছে। অন্য সময়। তাও একবার নয়, একাধিক বার। গ্রামবাসীরা তার আভাস পেয়েই ঘরবাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। গিয়ে ওঠে পশ্চিমে ফকিরাবাদ, মণ্ডলা হাফেজপুর, রুণকি পশ্চিম, যজ্ঞেশ্বর ইত্যাদি গ্রামে। সেসব জায়গায় লুকিয়ে থাকে দীর্ঘ দিন। সপরিবারে, ভাড়া-করা ছোটো ছোটো ঘরে কোনো রকমে মাথা গুঁজে।

তারা গ্রাম ছেড়ে পালানোর সময় - এবং তার পরে - গ্রামে যা ঘটে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে শুধু দানবলীলা। সে-লীলার বর্ণনাদান আমার সাধ্যের বাইরে। তার একটুখানি আভাস মেলে শুধু আতিয়ারের একবারের অভিজ্ঞতা থেকে।

আতিয়ারের অভিজ্ঞতা

এই আতিয়ার ষোলোদাগের দারোগাপাড়ার উত্তর দিকের বাসিন্দা আতিয়ার রহমান প্রামাণিক। তাঁদের বাড়ী রেললাইনের বাঁধের পাশে। পেশা চাষবাস।

মাস–তারিখ আতিয়ারের মনে নেই। শুধু মনে আছে, সেদিন ছিলো রবিবার। আর, ঘটনাটা ঘটে দিনের একেবারে শেষ দিকে।

আমার সহোদর আবদুল হাই (মাসুম)–এর কাছে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, সেদিন বিকেলে লোকে বারবার বলাবলি করছিলো, আজ গ্রামে মিলিটারি আসবে। সুতরাং বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নয়।

এ–খবর কোথা থেকে পাওয়া গিয়েছিলো, তারাই জানে। এর প্রচার গ্রামের অন্যত্র কেমন হয়, তাও আতিয়ার প্রামাণিক বলতে পারেন না। কিন্তু প্রতিক্রিয়া যে ব্যাপক ছিলো, সেটা তিনি নিজের চোখেই দেখেন। তাঁর সামনে দিয়েই গ্রামের লোকজন দূরের কোনো জায়গার উদ্দেশে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ভেতর তাঁর নিজের পাড়ার লোকও আছে।

এমন দৃশ্য দেখবার পর তো কারো পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। আতিয়ার প্রামাণিক তাই যথাশীঘ্র ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেন। তাঁর বাড়ীভরা লোক। বাবা–মা আছেন, তাঁর ছেলেমেয়ে–বউ আছে, আছে আরো কিছু লোক। তিনি সবাইকে অন্য শরণার্থীদের সাথে ভিনগাঁয়ের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দেন। বাড়ীতে থাকেন শুধু নিজে। আর, ছোটো ভাই মোবারক প্রামাণিক। ভাইটি অবশ্যি তখন ঠিক বাড়ীতে ছিলেন না, ছিলেন চাষবাসের কাজে মাঠে।

মোবারক মাঠ থেকে ফিরে গোসল করেন। তারপর হাঁড়ি থেকে পান্তা নিয়ে খেতে বসেন। আতিয়ার বাড়ীর ভেতর উঠোনে পায়চারি করতে থাকেন।

এর একটু আগেই তাঁর পাশের বাড়ীর গেদু মালিথা তাঁকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, তোমরাও বাড়ী ছেড়ে চলে যাও।

কথাটা বলেই গেদু মালিথা পথে বেরিয়ে পড়েন।

পায়চারি করতে করতেই এক সময় আতিয়ার প্রামাণিক দেখেন, গেদু মালিথার বাড়ীর সামনে চার–পাঁচজন হানাদার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোবারকের উদ্দেশে বলে ওঠেন, খাওয়া বাদ দে। চল্, পালাই।

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই আবার তাঁর চোখ যায় গেদু মালিথার বাড়ীর দিকে। এবার তিনি দেখেন, বাড়ীটায় দাউ দাউ করে আগুন

জ্বলছে।

এখন আর পায়চারির সময় নেই। এই মুহূর্তেই পালাতে হয়। কিন্তু তাঁর গরুগুলো বাঁধা রয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি তাদের দড়ি কেটে দেন। তারপরই মোবারককে নিয়ে বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে দৌড়।

দৌড়তে দৌড়তে পশ্চিমপাড়া পার হয়ে তাঁরা গিয়ে ওঠেন রেললাইনে। সেখান থেকে চলে যান ভেড়ামারা–রায়টা রেললাইনের পশ্চিম পাশে নওদাপাড়া গ্রামে।

রাতটা আতিয়ার আর মোবারকের নওদাপাড়াতেই কাটে।

পরদিন সকালে তাঁরা খবর পান, তাঁদের প্রতিবেশী ঘোড়ার গাড়ীওয়ালা ইয়াকুব আলী মালিথার হাতে গুলি গেছে। বিপদের সময় তাঁকে দেখবার জন্যে আতিয়ারের মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনি তখনই রওনা দেন।

খবর সত্যি। আতিয়ার প্রামাণিকের তখন প্রথম কাজ হয় ইয়াকুব আলীকে ডাক্তার দেখানো।

ইয়াকুব আলীর কাছে জানা যায়, আগের দিন তিনি তাঁর বাড়ীর সবাইকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী করে নওদাপাড়া যাচ্ছিলেন। পথে হানাদাররা তাঁদের ওপর গুলি চালায়। সেই সময়ই তাঁর হাতে গুলি লাগে।

এই সঙ্গে ইয়াকুব আলী একটি সাংঘাতিক খবর দেন। তাঁর ছেলে রেণু আর ছেলের বউ সম্ভবতঃ হানাদারদের গুলিতে মারা গেছে।

বেলা তখন প্রায় বারোটা। আতিয়ার প্রামাণিক এবার নিজের বাড়ীর অবস্থা দেখবার জন্যে ষোলোদাগের দিকে রওনা হন। পথে, দারোগাপাড়ার পেছনে মণ্ডলপাড়ার কাছে, রেললাইনের পাশে একটা মেটে পুকুর। সেদিকে চোখ পড়তেই আতিয়ার প্রামাণিক চমকে ওঠেন। পুকুরের পাড়ের নীচে রেণু আর তাঁর স্ত্রীর লাশ। পাশে তাঁদের দুটি বাচ্চা ছেলে। যাদের বড়োটির বয়েস দু'বছর, ছোটোটির মাত্র সাত–আট মাস। সেদিন সারা রাত টিপ টিপ করে বৃষ্টি হয়েছে। তার ওপর, চারদিক ছিলো অন্ধকার। জায়গাটাও অজায়গা। এমন অবস্থায় আর পরিবেশে বাচ্চা দুটি যে কেমন করে বেঁচে ছিলো, আতিয়ার প্রামাণিক ভেবে পান না। আর কিছু না হোক, শেয়াল লাশ খেতে এলে তো বাচ্চা দুটিকেও খেয়ে ফেলতে পারতো।

আতিয়ার প্রামাণিক সাধারণ, চাষাভুষো মানুষ। তাঁর আবেগ কম। এই অসহায়, বিপন্ন বাচ্চা দুটিকে দেখে তিনি কাঁদেন না। কিন্তু তাঁর বড়ো মায়া লাগে। তিনি তাদের নিয়ে বাড়ী চলে আসেন। যদি তাদের জন্যে কিছু করা যায়।

কিন্তু তিনি বাড়ীতে কি দিয়ে কি করবেন? গেদু মালিথার বাড়ীর মতো তাঁর বাড়ীও হানাদাররা পুড়িয়ে রেখে গেছে!

তিনি এবার পাড়ার আবু তালেব মেম্বারের বাবা হাজী সাহেবের বাড়ী যান। সেখানে অন্য কোনো ব্যবস্থা না হোক, দেনু নামে গ্রামের একটি লোককে পান। আতিয়ার প্রামাণিক তাঁকে নিয়ে দুধের সন্ধানে বেরোন। ঘটনাক্রমে মাঠে একটি ধাড়ী ছাগল পাওয়া যায়। তার মালিক কে, তাঁরা জানেন না, তা নিয়ে মাথাও ঘামান না। দুজনে মিলে ছাগলটাকে ধরে দুধ দুয়ে বাচ্চা দুটিকে খাওয়ান।

এখনো একটি কৃত্য বাকী। বাচ্চা দুটিকে একজনের হেফাজতে রেখে তিনি তার জন্যে তৈরী হন। দেনু তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। প্রায় ফাঁকা পাড়ায় খোঁজাখুজি করে আরো একজনকে পাওয়া যায়। তাঁর নাম পলান মালিথা। এবার কোদাল সংগ্রহ করে তিনজনে রেণু মালিথা আর তাঁর স্ত্রীর লাশের কাছে চলে যান।

হতভাগ্য মানুষ দুটির শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থা করা তখন সম্ভব নয়। তাঁরা শুধু রেলরাইনের ধারে ছোটো একটি মেটে পুকুরের পাড়ের নীচের দিকে কেটে একটি গর্ত করেন। তারপর লাশ দুটি সেখানে ঢুকিয়ে চাপা মাটি দেন। জীবনে যাঁরা এক সাথে ছিলেন, মৃত্যুর পরও তাঁরা এক সাথেই থাকেন। পাশাপাশি, পরস্পরের দেহলগ্ন হয়ে।

লাশ দাফনের পর আতিয়ার প্রামাণিক আবার বাড়ী আসেন। তাঁর ঘরে অনেক ধান ছিলো। দেখেন, তখনও তাতে আগুন জ্বলছে। হয়তো সব ধানই পুড়ে যাবে।

দেনু গরীব মানুষ। এমন অবস্থা দেখেও বলেন, ভাই, আমি কিছু ধান নেব।

আতিয়ার বাধা দেন না। ধান তো পুড়েই যাচ্ছে। কেউ যদি কিছু নিতে পারে তো নিক।

দেনু ওপর থেকে আগুন সরিয়ে ধান বার করতে থাকেন।

আতিয়ারের মনে তখন কেন জানি একটা ভয় ঘুর ঘুর করছে। তিনি সতর্ক চোখে বার বার এদিক-ওদিক তাকান।

এরই মধ্যে তিনি এক সময় শোনেন, মাথার ওপর দিয়ে সাঁ করে গুলি চলে গেল।

গুলির উৎসের সন্ধানে তিনি চারপাশে চোখ ফেলেন। দেখেন, আটষট্টি পাড়ার কাছে রেললাইনের ওপর তিনজন হানাদার। তাঁর বুঝতে বাকী থাকে না, তারাই গুলি করছে। আগের দিনের নারকীয় কাণ্ডের পরও তাদের নরহত্যার সাধ মেটেনি। সেই জন্যেই জনহীন পাড়াতেও গুলি ছোড়া।

হানাদারদের দেখেই আতিয়ার প্রামাণিক আর দেনু শুয়ে পড়েন।

তারপর, গুলিবর্ষণ একটু থামতেই, বুকে হেঁটে কোনো ক্রমে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন। পেছনের পাড়া হয়ে চলে যান অন্য দিকে।

কিন্তু এবার আর নওদাপাড়ায় আশ্রয় নেয়া নয়। সোজা গিয়ে ওঠেন—তার থেকে অনেক দূরে, যজ্ঞেশ্বরে।

তাঁকে যজ্ঞেশ্বরে থাকতে হয়েছিলো বহু দিন।

খাঁচার ভেতর খাঁচা

আতিয়ার প্রামাণিকের এই অভিজ্ঞতা বস্তুতঃ 'একাত্তরের বাংলাদেশের সব মানুষের অভিজ্ঞতা। যে-দেশ ছিলো পাকিস্তানী সন্ত্রাসরাজের এক বিরাট খাঁচায় পোরা। ষোলোদাগ যেন সেই খাঁচারই একটি ছোটো প্রতিকৃতি। কিংবা বলা যায়, বড়ো খাঁচার ভেতর ছোটো খাঁচা। যার ভেতর বিশেষভাবে বন্দী হয়েছে কখনো কোনো গ্রাম, কখনো কোনো শহর। সবই সন্ত্রাসরাজের স্বার্থে।

খাঁচা অবশ্যি আরো ছিলো। ছোটো খাঁচার ভেতর আরো ছোটো খাঁচা। যেগুলির ভিতর পোরা হত ব্যক্তি কিংবা পরিবারকে। কখনো সাময়িকভাবে, কখনো বা পাকাপাকি বন্দোবস্তে দীর্ঘ দিনের জন্যে। সেখান থেকে কেউ ফিরে এসেছে, কেউ বা হারিয়ে গেছে চিরকালের তরে।

আর, খাঁচা যেমনি হোক, তার ভেতরকার বন্দীর ভাগ্যে 'আদর' যে কেমন জুটতো, তা তো সহজেই অনুমেয়। তবে, হ্যাঁ, আদরের মাত্রাভেদ ছিলো। রকমফেরও। পাকিস্তানী খাঁচার চরম আদরের ফল আমাদের সবারই জানা। নরম আদরের ফলও অজানা কিছু নয়। পিঁজরায় থাকে যে টিয়া পাখী, সেও তো নির্যাতনের শিকার। দানাপানি আর সোহাগের কথায় তার দিন বাহ্যতঃ সুখেই

কাটে। কিন্তু তার ডানার জন্যে আকাশ তো থেকে যায় বহু বহু দূর।

পোষা টিয়ার আদর পাওয়ার আশা অবশ্যি পাকিস্তানী সন্ত্রাসরাজের বন্দীর পক্ষে ছিলো হাস্যকর। বরং তাঁরা যে 'নরম আদর' পেয়েছেন, তার জ্বালাও ভয়াবহ। ভুক্তভোগী মাত্রেই তা জানেন।

এমনি এক ভুক্তভোগী শামসুল আলম। বর্তমানে যিনি বাংলাদেশ সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের এক সাব-এডিটর।

'একাত্তরে তাঁর দিন কাটছিলো দেশে-থেকে-যাওয়া আর দশজন সাধারণ, ছা-পোষা বাঙালীর হালে। রুটিনমাফিক নাওয়া-খাওয়া, পেশার দায়ে বাইরে অফিস-কাচারিতে হাজিরা দেওয়া, সময় এবং সুযোগ পেলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বা 'ভোয়া' কিংবা আকাশবাণীর খবর শোনা,-এই সব নিয়ে। বাড়তি কাজের মধ্যে ছিলো মাঝে মাঝে সঙ্গী-সাথী আর বন্ধুজনের সাথে যুদ্ধের কথা আলোচনা করে, চাপা একটা ভয়ের বোধ বুকে পুষে। এমনিভাবেই তাঁদের দিন যেতো ফুরিয়ে, মাস যেতো গড়িয়ে। বলতে গেলে, অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাটেই।

কিন্তু সবার জীবন শেষ অবধি এইভাবে কাটেনি। হঠাৎ একদিন তাতে দেখা দিয়েছে বিপত্তি। যাতে সব রুটিন উলটে যায়।

শামসুল আলমের জীবনে সেই বিপত্তি দেখা দেয় আগস্ট মাসে। বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধ যখন এগিয়ে চলেছে চরম পর্যায়ের দিকে। আর, তাই দেশের ওপর, দেশের মানুষের ওপর হানাদার শ্বাপদদের ছোবল পড়ছে ঘন ঘন।

তারিখটা ১৬ আগস্ট। সময় রাত আটটা। শামসুল আলম ঢাকার মতিঝিল কলোনির বাসায় বসে সপরিবারে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনায় ব্যস্ত। হঠাৎ তাতে বাধা পড়ে। বাইরে থেকে আসা পর পর কয়েকটি গুলির আওয়াজে।

আর কোথাও না হোক, সরকারী কলোনীতে এমন আওয়াজ অভাবনীয়। শামসুল আলম তাই প্রথমে হতবোধ। তারপর রেডিয়োটা বন্ধ করে সদর দরজা খোলেন। ব্যাপারটা কি, জানার জন্যে। বাইরে তখন হট্টগোল। সামনে প্রতিবেশী এক বিহারী। শামসুল আলম তাঁর কৌতূহলটা তার কাছেই ব্যক্ত করেন। আর, উত্তরে যা শোনেন, তাতে তাঁর শরীর কেঁপে ওঠে।

তাঁর বিহারী প্রতিবেশী ছিলো দুই-তিনজন। তাদের সবাই তাঁর বন্ধুর মতো। অন্ততঃ এতো দিন তিনি তা-ই জেনেছেন। অথচ আজ তাদেরই একজন কিনা তাঁকে বলে, সব বাঙালী গাদ্দার। আপনার বাসায় লুকিয়ে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা

আসা-যাওয়া করে। আপনাকেও আমরা দেখে নেব। আমাদের এদিকে মুক্তিবাহিনী এসেছে। আপনি সব জেনেও না জানার ভান করছেন?

শামসুল আলমের মাথায় কিছুই ঢোকে না। লোকটা এসব কি বলছে?

তাঁর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে, এটা তাঁর আগেই মনে হয়েছে। তাঁর বাসার সামনে একটি বাগান ছিলো। বিহারীরা সেটা বারবার কেটে দিয়েছে। তিনি প্রতিবাদ করে ফল পাননি। শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। একবার এক বিহারী ছেলে এসে তাঁকে শোনায়, শেখ সাহেব হিন্দু। তাঁর আসল নাম রণজিৎ সিং। তিনি খুব খারাপ মানুষ।

প্রতিবেশী বিহারীটির আজকের কথাগুলি কি এতো দিনকার ষড়যন্ত্রেরই কোনো অংশ?

শামসুল আলম ভীত মনে এমনি নানান কথা ভাবতে থাকেন।

আর, ভাবতে ভাবতেই এক সময় হঠাৎ দেখেন, তাঁদের বাসার চারদিকে অবাঙালী পুলিস আর রাজাকারদের গাড়ীর ভীড়। একজন বিহারী রাজাকার এসে বলে, আপনি ভেতরে যান। কিন্তু বাসার সব আলো যেন জ্বালানো থাকে।

শামসুল আলম তাদের কথামতোই কাজ করেন।

ইতিমধ্যে কিছু পুলিস তাঁর বিহারী প্রতিবেশীদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেছে। কথা সেরে তারা এসে তাঁর বাসায় ঢোকে। বাসা সার্চ করবে। শামসুল আলমের বলার কিছুই নেই। তিনি নাবালক ছেলেমেয়ে কটিকে নিয়ে অসহায়ের মতো কুঁকড়ে থাকেন। তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন।

পুলিস তল্লাশির নামে বাসার সমস্ত জিনিষ তছনছ করে। তাঁর অসুস্থ নবজাত শিশুটিকে পর্যন্ত উলটে পালটে দেখে। পায়খানা-গোসলখানার জিনিষপত্রও বাদ যায় না। সবশেষে নজর দেয় রান্নাঘরের দিকে, এটা কি? ওখানে কি আছে? দরজা খুলুন।

তিনি ভাঙা উর্দূতে জবাব দেন, এটা রান্নাঘর। ভেতরে আমার স্ত্রী আছে। তিনি খুব পর্দানশীন। দরজা খোলা যাবে না।

তাঁর আপত্তি অবশ্যি খাটে না। শেষ পর্যন্ত দরজা খুলতেই হয়।

শামসুল আলমের স্ত্রীকে দেখবার পরও পুলিস প্রশ্ন করে, এ কে?

ঃ আগেই তো বলেছি, আমার স্ত্রী।

ঃ আপনার কোনো বড়ো মেয়ে নেই?

ঃ আপনারা তো দেখেছেনই, আমার সব বাচ্চাই ছোটো।

এবার পুলিস চলে যায়। তাঁকে বাসার সব আলো জ্বালিয়ে রেখে ভেতরে বসে থাকবার হুকুম দিয়ে।

তল্লাশি অবশ্যি এইখানেই শেষ হয়নি। পুলিস এরপর আবার তল্লাশি চালায়। তারা নাকি খবর পেয়েছিলো, শিবলী নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা কলোনিতে ঢুকেছেন।

রাত এগারোটায় শামসুল আলমকে থানায় যেতে বলা হয়। তাঁর বাসায় পুলিস কিছুই পায়নি। তিনি তাই থানায় যেতে আপত্তি করেছিলেন। পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। বরং পুলিসের গাড়ীতে উঠে তিনি কথা বলতে গেলে ইন্সপেক্টরের হাতে কয়েকটি ঘুষি খান।

তাঁকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে পুলিস আবার মুক্তিযোদ্ধা শিবলীকে খুঁজতে যায়। কিন্তু ফিরে আসে শামসুল আলমের কয়েকজন বাঙালী প্রতিবেশীকে নিয়ে।

তাঁদের যখন রমনা থানায় নিয়ে ওঠানো হয়, রাত তখন প্রায় একটা। তল্লাশিতে তাঁদের কারো বাসায় কিছু পাওয়া যায়নি। একজন অফিসারকে একথা জানানোর পরও সে হুকুম দেয়, উনকো সেল মে ভেজ দো।

পরদিন শামসুল আলমের অফিসের লোকজন বিভিন্ন সূত্রে তাঁর গ্রেফতারের খবর পায়। তাঁর বড়ো ছেলের মুখে বিস্তারিত কাহিনী শোনেন বড়ো সাহেব। তিনি ওপর মহলের সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করেন।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে তাঁর ডাক পড়ে থানার সেই অফিসার ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ সেলিমের কামরায়। তিনি কামরায় গিয়ে দেখেন, তাঁর বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করেছিলো, সেই বিহারীগুলিও সেখানে উপস্থিত। তারা ক্যাপ্টেনকে বলে, এই লোকটি এমনিতে সামান্য, কিন্তু কলোনির লীডার। বহু মীটিং করেছে, সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছে, টিক্কা খানকে গালাগালি দিয়েছে।

প্রায় চব্বিশ ঘন্টার ধকলে ক্ষীণদেহ শামসুল আলম এই সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফিরলে আবার শুরু হয় জেরা। তিনি সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। শুধু মীটিংয়ের কথাটি ছাড়া। কিন্তু বলেন, মীটিং আমি করেছি বটে। তবে, তা সংগ্রাম নয়, শান্তির জন্যে। বিশ্বাস না হয়, আপনি নিজে কলোনিতে গিয়ে খোঁজ নিতে পারেন।

ক্যাপ্টেন এবার অভিযোগকারীদের বলে, কলোনিতে আপনাদের কোনো সাক্ষী আছে? থাকলে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন। নইলে কিন্তু আপনাদের গ্রেফতার করবো।

শামসুল আলম কিন্তু আর বিহারীগুলির দেখা পাননি। সেদিন রাত ন'টায়

তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই শর্তে যে, তিনি প্রতিদিন থানায় হাজিরা দেবেন। বাসায় ফেরবার পর তিনি জানতে পান, লোকগুলি সপরিবারে বিহারী–অধ্যুষিত মীরপুরে পালিয়ে গেছে।

তিনি থানায় নিয়মিত হাজিরা দেন ১৮ থেকে ২২ আগস্ট তক।

তারপর আবার দু'দিন হাজত বাস এবং নানাবিধ অবান্তর প্রশ্নের কারণে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণাভোগ। এবং শেষে আগের মতো শর্তে মুক্তি লাভ।

এবারের মুক্তিও ছিলো সাময়িক। আবার থানা থেকে ডাক আসে দিন ছয়েক পর, ৩০ আগস্ট। ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ সেলিমের সাথে দেখা করতে হবে। রাত তখন প্রায় একটা। থানা থেকে এসেছিলো রাজাকার আর পুলিস। শামসুল আলম তাদের কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে রাতটুকু বাসায় কাটানোর অনুমতি নেন।

সকালে থানায় গিয়ে তিনি ক্যাপ্টেনের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।

লোকটি আসে বিকেল পাঁচটায়। আরো কয়েকজনসহ তাঁকে ডেকে নিয়ে বলে, মিসক্রিয়েন্ট (অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা) কোথায় আছে?

তাঁদের জবাব, জানিনে।

এমনি প্রশ্ন আর উত্তর চলে বার বার, বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর ক্যাপ্টেন তাঁদের হাজতে রাখবার হুকুম দিয়ে চলে যায়। সন্ধ্যেয় আবার আসবার কথা জানিয়ে। তখন সে নাকি তাঁদের নিয়ে পেট্রোলে বেরুবে।

সন্ধ্যেয় সে যখন আসে, শামসুল আলম তখন মাগরেবের নামাজ পড়ছেন। নামাজের পর তাঁকে বাইরে আনা হয়। আরো পাঁচজনের সাথে। এই পাঁচজনের একজন ছিলেন মতিঝিল টি.এণ্ড.টি ইস্কুলের হেড মাস্টার মোহাম্মদ আলী।

তাঁদের যখন গাড়ীতে ওঠানো হয়, তখন একজন অফিসার জিজ্ঞেস করে, এদের কোথায় নিয়ে যাবেন?

বর্বর ক্যাপ্টেনের জবাব, এদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবো।

'একাত্তরে বাঙালী হত্যাকে হানাদার আর তাদের দোসররা বলতো ইণ্ডিয়ায়–বা বাংলাদেশে–পাঠিয়ে দেওয়া।

গাড়ী হানাদারদের পাহারায় তাঁদের নিয়ে অন্ধকার চিরে অজ্ঞাত কোনো স্থানের দিকে যেতে থাকে।

পথে তাঁদের আর একবার হত্যার কথা শুনতে হয়। তখন হানাদারদের অন্য একখানা গাড়ী তাঁদের গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানায় বোধ হয় সাজ্জাদ সেলিমের সমমর্যাদার কোনো অফিসার ছিলো। সেও জানতে চায়, এদের কোথায় নিয়ে যাবেন?

ঃ বুড়ীগঙ্গায়।

তারপর শামসুল আলমের দিকে ফিরে সাজ্জাদ সেলিম জিজ্ঞেস করে, যাত্রাবাড়ী কোথায়, জানো? এদিকে আমাদের অনেক লোক মারা গেছে। মিসক্রিয়েন্ট কোথায় আছে, বলো। নইলে তোমার জান নিয়ে নেব।

শামসুল আলম সবিনয়ে বলেন, আমার কিছু জানা নেই। জান নিয়ে নিলে আর কি করবো?

এবার তাঁকে কিছু গালাগালি শুনতে হয়।

গাড়ীর যাত্রা শেষ হয় বুড়ীগঙ্গার কাছে একখানা বাড়ীর সামনে গিয়ে। পরে শামসুল আলম জেনেছিলেন, বাড়ীটা ছিলো হানাদারদের ফায়ারিং স্কোয়াডের অন্যতম ঘাঁটি। সেখানে অনেক লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে অথবা হাত-পা বেঁধে বুড়ীগঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়।

ক্যাপ্টেন তাঁদের নিয়ে গিয়ে তোলে বাড়ীটার ছাদে। তার চারদিক বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা। সেই ঘেরাওয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন হানাদার। ক্যাপ্টেন বন্দী ছয়জনকে বালির বস্তার দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করায়। তারপর হানাদারদের একজনকে বলে, ভালো দেখে একটা এল.এম.জি. নিয়ে এসো।

এল.এম.জি. এলে সেটা ঠিক করে তাঁদের দিকে তাক করে ধরা হয়। অর্থাৎ বন্দীদের হত্যার সব আয়োজন শেষ। ক্যাপ্টেন তাঁদের দিকে ফিরে বলে, এক দুই তিন গোনার পরই গুলি হয়ে যাবে। এখনো বলো, মিসক্রিয়েন্ট কোথায় আছে।

হেড মাস্টার সাহেব এবং অন্য দুজন বন্দী প্রাণের ভয়ে বলে ওঠেন, সময় পেলে তাঁরা 'দুষ্কৃতকারী' খুঁজে বের করে দেবেন।

এখন বাকী থাকেন শামসুল আলমসহ অন্য তিনজন। তাঁদের একই কায়দায় তিন বার হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেক বারই এক কথা। যেমন ছিলো আগেও,—আমরা কিছুই জানিনে।

ব্যাপারটি রহস্যজনক, এর পরও শামসুল আলমদের গুলি করা হয় না।

কিছুক্ষণ পর তাঁদের সবাইকেই ক্যাপ্টেন ছাদ থেকে নামিয়ে আনে। তিন-তিনজনের দুটি দলে ভাগ করে দুখানা গাড়ীতে উঠিয়ে নেয়। রাত তখন নিস্তব্ধ।

শামসুল আলম পরে শুনেছিলেন, তাদের থেকে আলাদা করা বন্দী তিনজনের ওপর পথে খুব অত্যাচার চালানো হয়।

এবারে গাড়ী এসে দাঁড়ায় সেগুনবাগানে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সামনে।

তখন অবশ্যি মহাবিদ্যালয় সেখানে নেই। তার জায়গায় বসেছে হানাদারদের ক্যাম্প। সাজ্জাদ সেলিম তাঁদের তার অফিসারের হেফাজতে রেখে চলে যায়।

তারপর কয়েকটি দিন তাঁরা ছিলেন প্রায় অভুক্ত। এমনকি, পায়খানা–প্রস্রাবের সুযোগও পাননি।

লোকটি আবার আসে ৩ সেপ্টেম্বর। সেদিন হেড মাস্টার সাহেব এবং অন্য দুজন ছাড়া বাকী তিনজনকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আগের মতোই শর্তসাপেক্ষে।

বাকী রাতটুকু অবশ্যি তাঁদের ক্যাম্পেই কাটাতে হয়। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন তাঁদের একবার বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের–তখনকার স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের – কাছ থেকে ঘুরিয়ে আনে। ছয়জনকেই। কি কারণে, সে–ই জানে।

শামসুল আলমকে পরে আর হানাদারদের খাঁচায় যেতে হয়নি। কিন্তু তিনি মুক্তির শর্তটুকু কাটানোর জন্যে তাঁর অফিসের কর্তা, সাহিত্যজগতে আহমদ মীর নামে পরিচিত মহিউদ্দীন আহমদের কাছে তদবির করেন। ১৭ আগস্ট তাঁর নাবালক ছেলে অফিসে এসে বড়ো সাহেবকে ওপর মহলে তাঁর মুক্তির জন্যে অনুরোধ জানালে দু'পক্ষে কি কথা হয়েছিলো, শামসুল আলমের সঠিক জানা নেই। কিন্তু কিছু দিন আগে তিনি আমাকে বলেন, মহিউদ্দীন তাঁর অনুরোধ শুনে সাফ জবাব দেয়, আমি কিছু করতে পারবো না।

তিনি আরো জানান, লোকটি ছিলো রাজাকার।

না, ঠিক রাজাকার নয়, 'কোলাবরেটর', হানাদারদের সহযোগী। পরবর্তী কালে তার সহকর্মী, মোনায়েম খানের প্রাক্তন জনসংযোগ অফিসার এম.এ. ওহাবও। মুক্তিযুদ্ধের পর আমি একটি অতি বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছিলাম, তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ এনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দুটি ফাইল খোলা হয়। তারা বেঁচে যায় বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে। তখন দুজনে ভালো মানুষ সেজে অতি দাপটে দফতর চালাতে থাকে।

মহিউদ্দীন যুদ্ধের পর পরই আত্মরক্ষার জন্যে একটি কাজ করে। তার এক জুনিয়র অফিসারকে দিয়ে কোনো পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখিয়ে নেয়। যাতে বলা হয়, সে যুদ্ধের সপক্ষে অনেক কাজ করেছিলো। এমন আত্মপ্রচার মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক আর কোনো সরকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

বড়ো খাঁচায় এক দিন

কথায় কথা আসে। মহিউদ্দীনের কথায় মনে পড়ে আরো একজনের নাম। সম্পর্কে তিনি মহিউদ্দীনের মামা। বন্দী হয়েছিলেন শামসুল আলমের খাঁচার থেকে অনেক বড়ো এক খাঁচায়। একাধিক জায়গায়। তিনি আমাকে সেখানকার নির্যাতনভোগের একটি লিখিত বিবরণ দিয়েছেন। তাতে তাঁর অনেক উদ্ধারকারীর নাম আছে। কিন্তু সে–তালিকায় মহিউদ্দীনের নাম নেই।

তিনি আমার প্রতিবেশী সাহিদুল বারী। 'একাত্তরে ছিলেন প্রাদেশিক তথ্য দফতরের ফিল্ম পাবলিসিটি শাখার সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট। পরে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জনসংযোগ দফতরে মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনীয়ার।

সাহিদুল বারী গ্রেফতার হন ১০ আগস্ট দিনগত রাতের এক সামরিক অপারেশনের সময়, তাঁর ছোটো ভাই সাফিউল বারী ওরফে মানিকসহ। সে রাত্তিরে গ্রীণ রোড কলোনি–স্টাফ কোয়ার্টাস–ঘেরাও করে 'কুমিং অপারেশন' চালানো হয়। বাংলায় যাকে বলতে পারি পোকা বাছাইয়ের অপারেশন। ঢাকায় বেসরকারী এলাকায় এমন কাণ্ড একাধিক বার দেখা গেছে। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের কলোনিতে ওইটিই ছিল সম্ভবতঃ প্রথম।

অপারেশনে আসে বিরাট এক দল হানাদার, বেশ কিছু বাঙালী–বিহারী রাজাকার নিয়ে। রাত তখন দুটো–তিনটে। তারা প্রতিটি ফ্ল্যাটের লোকজনকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। রাজাকারদের সহযোগিতায়। বারী সাহেবের ফ্ল্যাটে তাদের কয়েকজন ঢোকে ভোর পাঁচটায়। তল্লাশির নামে বাসার সব কিছু তছনছ করে। ছোটো ভাই মানিককে নির্মমভাবে মারতে থাকে। ঘরে লুটতরাজও চলে। নগদ টাকাপয়সাসহ অনেক দামী জিনিষ হানাদারেরা নিয়ে নেয়। সবশেষে সাহিদুল বারী আর তাঁর ভাইকে গ্রেফতার করে তাদের গাড়ীতে তোলে। দুজনের নামে নাকি অভিযোগ ছিলো, মুক্তিবাহিনীর সাথে তাঁদের যোগাযোগ আছে।

সকাল সাড়ে সাতটায়, অপারেশন শেষে, হানাদাররা তাঁদের দুজনকে নিয়ে যায় এম.পি. হাউসে। স্টাফ কোয়ার্টার্স থেকে সেদিন গ্রেফতার হন আরো একজন–আহসানউল্লাহ্। অপারেশনকারীরা এম.পি. হাউসে বন্দীদের ক্যাপ্টেন আসলাম নামে এক হানাদারের হেফাজতে দিয়ে দেয়। মুক্তিবাহিনীর সাথে

সাহিদুল বারীর সত্যিই যোগাযোগ ছিলো। তাদের সূত্রে তিনি জানতেন, হানাদারদের হাতে ধরা পড়ে যারা এম.পি. হাউসে যান, তাঁদের ওপর চালানো হয় অকথ্য নির্যাতন। মুক্তিযুদ্ধ তথা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তথ্য জানার মতলবে। এম.পি. হাউসে এর জন্যে ছিলো বিপুল আয়োজন। সাহিদুল বারী তাই সেখানে পৌঁছেই মন স্থির করে ফেলেন। যেখানে দেশ আর স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত, লাখো লাখো মানুষের জানমালের নিরাপত্তা আর মা–বোনের ইজ্জতের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে তিনি কারো কাছে নতশির হতে পারেন না।

এম.পি. হাউসে অবশ্যি বড়ো কিছু ঘটেনি। সামান্য দু'চারটি প্রশ্নের পর হানাদাররা তাঁকে চালান করে দেয় নাখালপাড়ার এক ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পটি খোলা হয় বেসরকারী মালিকানাধীন একটি কলোনির ছয়টি বেদখলকৃত বাড়ীতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এটি ছিলো আক্ষরিক অর্থেই এক কসাইখানা। এখানে পাকিস্তানী কসাইয়েরা কতো বাঙালীকে যে হত্যা করেছে, তার হিসেব নেই।

এই কসাইখানায় সাহিদুল বারীকে প্রথমে ঢোকানো হয় একটি নির্জন কামরায়। সেখানে পা দিতেই তাঁর সারা গা শিউরে ওঠে। কামরার মেঝেয় চাপ চাপ জমাট–বাঁধা রক্ত। এই বীভৎস দৃশ্য একটু পরেই হয়ে ওঠে আরো বীভৎস। ইলেকট্রিক তারের চাবুক হাতে নিয়ে দত্যির আকারের এক হানাদারের আবির্ভাবে।

ঘরে আসবার পরই দৈত্যটি হিংস্র চোখে তাঁর দিকে তাকায়। তারপর শুরু করে বিজাতীয় স্বরে আর ভাষায় কিছু কর্কশ প্রশ্ন। যেগুলির প্রথমটি ঃ তুই কি বাঙালী? এবং এই সঙ্গে সে জানতে চায়, তিনি মুক্তিযোদ্ধার ট্রেণিং নিয়েছেন কিনা, তাঁর পরিবারে কতোজন মুক্তিযোদ্ধা আছে ইত্যাদি।

প্রথম প্রশ্নটি বাহুল্য মাত্র। বস্তুতঃ ইয়ারকি মারা গোছের। কেননা, বাঙালী ছাড়া আর কেউ যে এখানে বন্দী হয়ে আসে না, দৈত্যটি তা ভালোভাবেই জানে। তবু সাহিদুল বারী ভদ্র, সংযত গলায় 'হাঁ' সূচক জবাব দেন। তাতে দোষেরও কিছু ছিলো না। কিন্তু পরের প্রশ্নগুলির লক্ষ্য হানাদারদের প্রয়োজনে জ্ঞান বৃদ্ধি। অন্য দিকে, সেগুলির উৎস মিথ্যা সন্দেহ। তিনি তাই স্পষ্ট ভাষায় 'না' বাচক উত্তর দেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন, লোকটি তাঁর কথায় বিশ্বাস করে না। তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে গাল দেয়, ইলেকট্রিক শক দেওয়ার ভয় দেখায়।

কিন্তু সাহিদুল বারী অনড়।

এবার শুরু হয় তাঁর ওপর নির্যাতন। ইলেকট্রিক তারের চাবুক দিয়ে সপাং সপাং মার। এবং তা চলে একটানা অনেকক্ষণ। তাতে তাঁর সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হয়ে যায়।

এই নির্যাতনে এক সময় একটু যতি পড়ে। না, সাহিদুল বারীকে রেহাই দেওয়া বা দৈত্যটির বিশ্রাম নেয়ার জন্যে নয়, আবার জেরা করবার উদ্দেশ্যে। এবারের প্রশ্ন, বল্, তোর সাথে আর কোন্ কোন্ মুক্তি ছিলো? তাদের ক্যাম্প কোথায়?

কিন্তু তিনি এবারও 'সন্তোষজনক' কিছু বলতে রাজী নন।

সুতরাং আবার শুরু হয় নির্যাতন। আগের চেয়েও প্রচণ্ডভাবে। ইতিমধ্যেই প্রায় বিধ্বস্ত, বারী সাহেব আর সইতে পারেন না। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান।

জ্ঞান ফেরবার পর তাঁর কেন জানি মনে হয়, এবার হানাদাররা তাঁকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তাদের চিনতে তাঁর তখনও অনেক বাকী ছিলো। একটু পরই তাঁর ভুল ভাঙে। যখন আবার শুরু হয় নির্যাতন। তাঁকে অন্য এক কামরায় নিয়ে গিয়ে।

কামরাটি অন্ধকার। কিন্তু আগেরটির মতো নির্জন নয়। সেখানে ছিলো চারজন জল্লাদ। তাঁকে দেখেই তাদের একজন এক সঙ্গীকে বলে, তেল মালিশ করো।

বারী সাহেব আবার কুহকিনী আশার ছলনায় পড়েন। ভাবেন, এরা সত্যিই তাঁর গায়ে তেল মালিশ করবে—এবং তাতে তাঁর জখমগুলির ব্যথার কিছুটা উপশম হবে।

হ্যাঁ, তা-ই বটে! মুহূর্ত কয়েক পরই চারজন জল্লাদ একই সঙ্গে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় বেপরোয়া আঘাত হানা। লাথির পর লাথি, ঘুষির পর ঘুষি। সেসবের যেন কোনো শেষ নেই, কোনো বিরতি নেই। প্রথম পর্বের নির্যাতনে জর্জরিত শরীরটা এবার এক-এক জায়গায় ফেটে যেন চৌচির হয়ে যায়। দর দর করে রক্ত ঝরে গায়ের জামাটা সম্পূর্ণ ভিজিয়ে ফেলে। মাথাটা ভয়ানকভাবে ঘুরতে থাকে। তাঁর মনে হয়, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

কিন্তু তাতে হানাদারদের কি? তাঁর অমনি দশার মধ্যেই একজন হুঙ্কার ছাড়ে, এখনো সত্যি কথা বল্। তাহলে তোকে ছেড়ে দেব।

এবার সাহিদুল বারীও যেন হুঙ্কার ছাড়েন। চীৎকার করে বলেন, না, না, আমি কিছু জানি না।

ফলে আবার শুরু হয় বেধড়ক প্রহার। এবং কিছুক্ষণ পরই আবার তাঁর

জ্ঞানলোপ।

এবার যখন জ্ঞান ফেরে, তখনও তাঁর মাথা ভীষণভাবে ঘুরছে। পৃথিবীটাকে মনে হচ্ছে অদ্ভুত এক সাদা গোলাকার বস্তু। দম যেন আটকে আসছে। এরই মধ্যে তিনি অনুভব করেন, কামরাটি যেন এক গুদাম ঘর। সেখানে তাঁরই মতো আরো পনেরো-বিশজন বাঙালী আধমরা অবস্থায় কাতরাচ্ছে।

এই সময় কয়েকজন নরপশু তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে। কিন্তু তাঁর যেন সেসব শোনার শক্তিও নেই। তখন বেলা দুপুর। সকাল থেকে তাঁর পেটে এক দানা খাবার বা মুখে এক ফোঁটা পানি পড়েনি। গলা শুকিয়ে কাঠ। আবার, ইতিমধ্যে দু'বার নারকীয় নির্যাতন গেছে। মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না। তবু তিনি কোনো ক্রমে বলেন, এক গ্লাস পানি।

উত্তরে অসুরগুলি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বলে, পেশাব খাবি? চল্, দিচ্ছি।

বলেই তাঁকে চুল ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে অন্য এক কামরায় নিয়ে যায়।

সেখানে আবার জিজ্ঞাসাবাদ। বারী সাহেবের এক প্রতিবেশী ডাঃ সালাহ্উদ্দীন। ইস্তফা দিয়ে আসা সরকারী চাকুরে। থাকেন স্টাফ কোয়ার্টার্সের পাশে নিজের বাড়ীতে। গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেন। হানাদারদের এবারের প্রশ্ন তাঁর বিষয়ে। ধরা পড়বার আগে তাঁর সাথে সাহিদুল বারীর কয়েক বার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গোপনে আলোচনা হয়েছে। তবু সাহিদুল বারীর সাফ জবাব, আমি ডাঃ সালাহ্উদ্দীনকে চিনিনে।

হানাদাররা নিশ্চয়ই চর মারফত এলাকার সব খবরই রাখতো। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় একটু পরই। যখন তারা কাঁঠালবাগানের মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার বুলুর কথা জানতে চায়। বুলুর সাথেও সাহিদুল বারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ছিলো। এই মুক্তিযোদ্ধাটিকে তিনি জানতেন ছোটো ভাইয়ের মতো। বুলু তাঁর বাসায় আসা-যাওয়া করেছেন প্রায় নিয়মিতভাবে, গোপনে। মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে খবরাখবর আর আর্থিক সাহায্যের জন্যে। তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন শুনেও সাহিদুল বারী আগের মতোই জবাব দেন, আমি বুলুকে চিনিনে।

এমনিভাবে বার বার 'চিনিনে' শুনে নরপশুগুলি একেবারে ক্ষেপে যায়। তাঁর জন্যে জল্লাদদের উদ্দেশে হুকুম হয়, রুটি বানাও।

সাহিদুল বারী বোঝেন, এটা নির্যাতনের আর এক নারকীয় পদ্ধতি। কিন্তু সে-পদ্ধতির নির্যাতন যে কতো ভয়াবহ, সে-সম্পর্কে তাঁর সামান্যতম ধারণাও ছিলো না। সে-ধারণা হয় অচিরেই, সরাসরি অভিজ্ঞতায়। জল্লাদরা প্রথমে তাঁকে

উপুড় করে শুইয়ে দেয়, হাত দুখানা দু'পাশে ছড়িয়ে রেখে। তারপর তিনজন উঠে দাঁড়ায় শরীরটার তিন জায়গায়, দুজন ছড়ানো দুই হাতের ওপর।

পাঁচজন জল্লাদের সবার পায়েই ছিলো ভারী বুট। সেই বুট দিয়ে তারা শুরু করে তাঁকে পিষতে আর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি মারতে। তাতে ধড়টা কোনো রকমে আস্ত থাকে। কিন্তু হাত দুখানা থেঁতলে যায়।

এদিকে, পা নিয়ে চলে আর এক চণ্ডলীলা। দুজন ষণ্ড পা দুখানা ভাঁজ করে গুটিয়ে ফেলেছিলো। তারা সেই গুটানো পায়ের তালুতে লোহার রড জাতীয় কি এক জিনিষ দিয়ে বাড়ি মারতে থাকে। প্রচণ্ড জোরে, একের পর এক। তারা এক-একটি বাড়ি মারে, আর, সাহিদুল বারী বুক ফাটিয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন। তা-ই দেখে জল্লাদদের কী উল্লাস! আবার, হুমকি দেয়, বেশী চীৎকার করলে গুলি মেরে শেষ করে ফেলবে।

রুটি বানানোর পদ্ধতির অবশ্যি এই সাথেই শেষ নয়। লাথি, পেষাই আর রডের সাথে আরো কিছু ছিলো। মাঝে মাঝে ঘুষি আর অবিরাম গালি বর্ষণ। প্রচণ্ডতা সেগুলিরও কিছু মাত্র কম নয়। গালগুলি ছিলো অতি অশ্লীল।

সব মিলিয়ে সাতজনে যেন প্রতিযোগিতা চলে। কে কতো মারতে এবং বকতে পারে, কে কার থেকে বেশী, তার। প্রায় অসাড়, জ্ঞানহীন সাহিদুল বারীর মনে হয়, এর কাছে নাৎসী শিবিরের নির্যাতনও বুঝি কিছু নয়।

এই নির্যাতনের সময় মাঝে মাঝে টিটকারি-বিদ্রূপও চলছিলো। একজন বলে, মুজিব তোর বাপ? সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন তার সাথে জুড়ে দেয়, ইন্দিরা তোর মা? তৃতীয় একজন হুমকি ছাড়ে, শালারা বাংলাদেশ বানাবি? দাঁড়া, তোকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এমনি করে তারা এক-একটি টিটকারি বা হুমকি ছাড়ে, আর, তার পর পরই দৈহিক নির্যাতনের প্রচণ্ডতার মাত্রা বাড়ে।

এক পর্যায়ে সাহিদুল বারী আর যেন সহ্য করতে পারেন না। তাঁর মনটা দুর্বল হয়ে আসে। তিনি ভাবেন, আর নয়, এবার সব কিছু বলে ফেলি। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে অসংখ্য নিপীড়নে ক্লিষ্ট দেশের ছবি, সংখ্যাহীন সন্তানহারা মা আর ইজ্জত-হারানো নারীর করুণ মুখ। না, এই দেশ, এই সব মা-বোনের সাথে তিনি কিছুতেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। কথাটা ভাবতেই তিনি নিজেকে সামলে নেন। দেহের অবশিষ্ট শক্তির সবটুকু দিয়ে চীৎকার করে বলে ওঠেন, তোমরা আমায় যতোই মারো, কাটো, আমার মুখ থেকে একটা কথাও বার করতে পারবে না।

বলা বাহুল্য, তাতে জল্লাদদের পৈশাচিক নির্যাতন আরো বাড়ে। তাঁর সারা শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। মুখ দিয়ে ফেনা গড়ায়। এবং এক সময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

তাঁর যখন আবার জ্ঞান ফেরে, তখন দিন ফুরিয়ে এসেছে। তিনি একবার মাথা তোলবার চেষ্টা করেন। কিন্তু লাভ হয় না। শরীর এতো দুর্বল যে, ওই সামান্য কসরতেই তিনি আবার বেহুঁশ হয়ে পড়েন। আবার জ্ঞান ফিরে পান প্রায় আধঘন্টা পর।

এবারে জ্ঞান ফিরলে কানে আসে হানাদারদের বুটের খটখট আওয়াজ। একটু পরই তাঁর সামনে আবির্ভাব ঘটে ক্যাপ্টেন আসলামের। লোকটি বোধ হয় নাখালপাড়া নির্যাতন শিবিরের কর্তা—কিংবা পয়লা সারির কর্তাব্যক্তিদের একজন। ঘরে এসেই সে শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদ।

আগের প্রতি বারের মতোই এবারও প্রসঙ্গ নতুন। শেখ সাহেবের ফিল্ম বানানো,—তুমি কি শেখ মুজিবের ফিল্ম তুলেছো?

ফিল্ম তোলা অবশ্যি সাহিদুল বারীর দাফতরিক কাজ ছিলো না। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট হিসেবে তিনি সরকারী নেতাদের বক্তৃতা রেকর্ড করতেন। পরে সরকারের পক্ষ থেকে প্রচারের প্রয়োজনে।

তবে, স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু কাজ করেছিলেন। মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় এবং—তার আগেও—বঙ্গবন্ধুর সাথে নানান জায়গায় ঘুরতেন। সভা-সমিতিতে তাঁর জন্যে সেসব জায়গায় মাইকের এবং বক্তৃতা রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিছু রেকর্ড (টেপ) পরে হানাদাররা কেড়ে নেয়। কিন্তু তার আগেই বেশীর ভাগ টেপই তিনি মুক্তিবাহিনীকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

অর্থাৎ সাহিদুল বারী মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন ভালোভাবেই। যুদ্ধের শুধু আগে নয়, চলা কালেও। এই ভূমিকায় তিনি ছিলেন তাঁর ভাগ্নে মহিউদ্দিন আহমদের একেবারে বিপরীত কোটির মানুষ। দুজনেই পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার চুঁচুড়া থেকে আসা মোহাজের। কিন্তু নিম্নমানের এক কেরানীর ছেলে, নিজেও প্রথম জীবনে প্রাদেশিক সরকারের নিম্নমান কেরানী, মহিউদ্দিন বরাবরই পাকিস্তানী কর্তাদের সুকৌশলে তোয়াজ করে চলেছেন। আর, সাহিদুল বারী হন মনে প্রাণে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী বাঙালী।

এই বিদ্রোহী চরিত্রের কারণে যুদ্ধের সময় তিনি একটি বড়ো রকমের ঝুঁকি নেন। একটা সরকারী দায়িত্ব উপেক্ষা করে।

তখন হানাদার–কবলিত বাংলাদেশের গভর্ণর ডাঃ এম. এ. মালিক। একবার এই গভর্ণরের বগুড়া সফরের প্রোগ্রাম হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী হিসেবে সাহিদুল বারীর ওপর ভার পড়ে সেখানকার সভায় মাইকের ব্যবস্থা আর বক্তৃতা রেকর্ড করবার। কিন্তু তিনি দালাল গভর্ণরের সভায় যেতে রাজী নন। অসুস্থতার ভান করে ছুটি নেন।

অফিস অবশ্যি অসুস্থতার কথাটা বিশ্বাস করেনি। সেখান থেকে তাই একজন পিয়ন পাঠানো হয় তাঁর বাসায়। কথাটির সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্যে। বারী সাহেব তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে অনুরোধ জানান, অফিসে গিয়ে বলোগে, আমি সত্যিই খুব অসুস্থ। অফিসে যাওয়া বা কোনো কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এহেন সাহিদুল বারীকে ক্যাপ্টেন আসলামের প্রশ্নের উত্তরে আর মিথ্যে কিছু বলবার প্রয়োজন হয়নি। যদিও আসলাম মিথ্যে জবাবই চাইছিলো। তবে, বারী সাহেব কোনো জবাবই দেননি।

ক্যাপ্টেন আসলাম তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে গর্জে ওঠে, তুমি ব্ল্যাকলিস্টেড। এবং ব্ল্যাকলিস্টেড সবাইকেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়।

এরপর জল্লাদরা তাঁকে নিয়ে যায় চতুর্থ এক কামরায়।

সেখানে ঢুকতেই সাহিদুল বারী দেখেন, মেঝের এক জায়গায় মানুষের মগজ ছড়ানো। নিশ্চয়ই পাকিস্তানী পশুদের চরম নির্যাতনের শিকার কোনো হতভাগ্য বাঙালীর। দৃশ্যটি দেখে তিনি আপাদমস্তক শিউরে ওঠেন।

তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করে নরপশু আসলাম নারকীয় আনন্দে হেসে ওঠে। বলে, আমাদের কথামতো না চললে বা সহযোগিতা না দিলে শুধু তুমি নও, তোমার পরিবারের কারোই রেহাই নেই। সবাইকেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।

সাহিদুল বারী তবু আসলামের পছন্দসই কিছু বলতে রাজী নন। কেননা, তখন তিনি তাঁর অপমৃত্যু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

এই সময় পাশের কোনো কামরা থেকে কিছু হৃদয়বিদারী আর্তনাদ শোনা যায়। আসলাম বলে, দেখবে, ওখানে কি হচ্ছে?

বলেই তাঁকে আর্তনাদের উৎসস্থলে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি দেখেন, দুজন লোককে হাত–পা বেঁধে এক চলন্ত সীলিং ফ্যান থেকে উপুড় করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ফ্যান ঘুরছে, আর, সেই দুই হতভাগ্যের নাক–মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে! তাতে সারা মেঝে লাল হয়ে গেছে। এমনি অবস্থাতেও চারজন জল্লাদ হতভাগ্য মানুষ দুটির ওপর নানাভাবে শারীরিক নির্যাতন

চালাচ্ছে।

দৃশ্যটি দেখিয়ে ক্যাপ্টেন আসলাম আবার হুমকি দেয়, এখানো সময় আছে, সত্যি কথা বলো। নইলে তোমার অবস্থা ওদের চেয়েও ভয়াবহ হবে, তুমি আরো নৃশংস শাস্তি পাবে।

এমন হুমকি সত্ত্বেও সাহিদুল বারী নীরব।

ক্যাপ্টেন আসলাম এবার আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, ঠিক আছে। তোমাকে দেখাচ্ছি মজা।

তারপর নিজেই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে নিয়ে, সর্ব শক্তি দিয়ে। সাহিদুল বারী তখন এমনিতেই মুমূর্ষু। সেই অবস্থায়ও তাঁকে বিরামহীনভাবে ডাণ্ডা পেটা করতে থাকে পশুটি। মুহূর্তেই সাহিদুল বারীর সারা গা থেকে রক্তের স্রোত নামে। এক সময় হাতের একটা আঙুল ভেঙে যায়। ক্রমে তাঁর সব অনুভূতি, সব জ্ঞান লোপ পায়। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না।

ঘন্টাখানেক পর জ্ঞান ফিরলে যেন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। সাহিদুল বারী শোনেন, তাঁকে মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে!

খবরটি শুনে তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না। যমদূত যাঁর জন্যে হাত বাড়িয়ে রয়েছে, তাঁর মুক্তি কিভাবে সম্ভব? এটা নিশ্চয়ই জল্লাদদের এক চাল। মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে তাঁর কাছ থেকে কথা বার করবার ফন্দি।

কিন্তু না, ঘটনাটি অলৌকিকও নয়, কারো কোনো চালও নয়। একেবারে সত্যি। সাহিদুল বারীও তা মানতে বাধ্য হন, যখন তিনি বাসায় ফিরে আসেন। সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা, গ্রেফতারের ঘন্টা বারো পর।

তা—এমন ঘটনা কিভাবে সম্ভব হল?

হল যে—এইভাবে।

তাঁর গ্রেফতারের কিছু পরই গ্রীণ রোড কলোনির লোকজনের মাধ্যমে অফিসে খবর পৌঁছে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা। তখন প্রাদেশিক তথ্য দফতরের কর্তা ছিলেন আরশাদ-উজ-জামান। যুদ্ধের পর যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বহির্দেশীয় প্রচার বিভাগের কর্তা—এবং আরো পরে ইসলামী রাষ্ট্রসংস্থা ও.আই.সি.–র মহাসচিব হন। বহুভাষী এই ভদ্রলোক ছিলেন মনে প্রাণে দেশপ্রেমিক বাঙালী। মুক্তিবাহিনীকে তিনি গোপনে নানাভাবে সাহায্য করেন। এদিকে, দেশে ওপর মহলের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো। তাঁদের সাহায্যে তিনি সাহিদুল বারীর মুক্তির জন্যে উঠে

পড়ে লাগেন। তাঁর সাথে সাথে আরো অনেকেই। তথ্য দফতরের প্রকাশনা শাখার প্রধান মকবুল আহমদ খান, ফিল্ড পাবলিসিটির ইনফরমেশন অফিসার ফজলুর রহমান, আরো কয়েকজন কর্তকর্তা আর সাহিদুল বারীর কিছু সহকর্মী। যিনি যেভাবে পারেন, অবিরাম চেষ্টা চালান। এমনি সব চেষ্টার ফলেই পাকিস্তানী হায়েনারা শেষ পর্যন্ত সাহিদুল বারীকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়।

নির্যাতন শিবির থেকে বেরুনোর সময় ক্যাপ্টেন আসলাম তাঁকে পাঁচশো টাকা দিতে চায়। বলে, মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দাও। পারলে চাকরিতে তোমার প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে।

সাহিদুল বারী মনে মনে হাসেন। শয়তান, বর্বর, নররূপী হায়েনারা তাঁর ওপর শারীরিক–মানসিক নির্যাতন চালিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়ে এখন তাঁকে প্রলোভনে বশে আনতে চায়। তিনি নরপশুটির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে স্বেচারে উঠে কোনো মতে গাড়ীতে চেপে বসেন।

বাসায় ফেরবার পর তিনি বেশ কিছু দিন একেবারে শয্যাশায়ী ছিলেন।

তাঁর ছাড়া পাওয়ার খবর শুনে একদিন মকবুল আহমদ খান অফিস থেকে ফেরবার পথে তাঁকে দেখতে যান। আমাকে সঙ্গে নিয়ে। হানাদারদের ভয়ে তখন কেউ তাঁর বাসার কাছ দিয়েও হাঁটতে চাইতো না।

আমরা যখন যাই, সাহিদুল বারী তখন মেঝেয় পাতা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে বালিশে ভর দিয়ে একটুখানি উঁচু হয়ে বসেন। নির্যাতনের কোনো বিবরণ তিনি সেদিন আমাদের শোনাননি। তেমন শক্তিও তাঁর ছিলো না। কথায় কথায় তিনি শুধু বলেন, স্যার, আল্লা যেন আমার পরম শত্রুকেও এমন অবস্থায় না ফেলেন।

আট মাসের নরকবাস

কিন্তু সাহিদুল বারী একা নন, তাঁর মতো কথা বলতে পারতেন, পারেন বাংলাদেশের আরো বহু মানুষ। যাঁরা 'একাত্তরে হানাদার শ্বাপদদের থাবায় আটকা পড়েছিলেন। তাঁদের প্রায় সবাই প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন যেন অলৌকিকভাবে। কিন্তু অক্ষত দেহে ফিরেছেন খুব কম মানুষই। অন্য দিকে, কেউ নির্যাতন ভোগ করেন একদিন, কেউ বা দিনের পর দিন,–এমনকি, মাসের পর মাস।

সবচেয়ে দীর্ঘ কাল যাঁরা শ্বাপদদের থাবায় আটকা ছিলেন, তাঁদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা সহজেই অনুমেয়। আরো অনুমেয়, সেই নির্যাতন কেবল দৈহিক ছিলো না, উপরন্তু ছিলো মানসিক । বরং তাঁদের মানসিক নির্যাতন হয়েছে দৈহিক নির্যাতনের থেকেও দুঃসহ। অনেকের ক্ষেত্রে নির্যাতন তাঁদের পরিবার পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

এমনি একজন হলেন পুলিস অফিসার মোহাম্মদ মোস্লেফ। 'একাত্তরে যিনি ছিলেন তখনকার–আজকের বৃহত্তর–সিলেট জেলার এস.পি.। স্বাধীনতার পর তাঁকে নিয়োগ করা হয় বাংলাদেশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ পুলিস সুপার।

মোস্লেফ সাহেবের সাথে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ আমি পাইনি। কিন্তু তাঁর একটি সাক্ষাৎকার পড়েছি দৈনিক 'পূর্বদেশ'–এ, ১৯৭২ সালের ২০ এবং ২২ জানুয়ারি। এটি নিয়েছিলেন এরশাদ মজুমদার। আমার আলোচনার ভিত্তি এই সাক্ষাৎকার, সামান্য সংক্ষেপ আর সম্পাদনার পর।

সাক্ষাৎকারটি অসম্পূর্ণ। মোহাম্মদ মোস্লেফ হানাদারদের খাঁচায় আটক ছিলেন একটানা আট মাস। আর, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায়। এরশাদ মজুমদার তাঁর ওপর নির্যাতনের কাহিনী বলেছেন কেবল দুটি জায়গার। এবং জুলাইয়ের শুরু অবধি। অর্থাৎ মাস দুয়েকের।

তবু, এই খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ কাহিনী থেকেই আমরা যা জানি, তাতেই এখনো গা শিউরে ওঠে।

এস.পি. মোহাম্মদ মোস্লেফও হানাদারদের হাতে ধরা পড়েন, যেমন সাহিদুল বারী, স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত থাকার 'অপরাধে'। কিন্তু সাহিদুল বারীর মতো তাঁর ভূমিকা নেপথ্যের ছিলো না, ছিলো প্রত্যক্ষ। তিনি এক মাসের ওপর

হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। সেই লড়াইয়ের আগে ছিলেন মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের এক বিশিষ্ট সক্রিয় ব্যক্তি। সিলেটের প্রখ্যাত আওয়ামী লীগার, পরবর্তী কালে বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে আর সহযোগিতায়। সরকারী চাকুরে হলেও মোহাম্মদ মোস্লেফ ভুলতে পারেননি, তিনি বাঙালী, দেশের জন্যে তাঁরও কিছু কর্তব্য আছে। তিনি তাই তাঁর অধীন বাঙালী পুলিসদের নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

হানাদাররাও ভুলে যায়নি, তিনি সরকারের পুলিস হলেও বাঙালী এবং দেশপ্রেমিক। তারা তাই ২৫ মার্চের কালরাত্রির পরই তাঁকে গৃহবন্দী করে। তাঁর পরিবারের সকল সদস্যসহ।

এই গৃহবন্দিত্বে তাঁদের কাটে নয় দিন।

যে কারণেই হোক, সিলেটে হানাদাররা তখন সুসংগঠিত নয়। কিংবা তাদের বিভিন্ন দলের কাজকর্মে সমন্বয় নেই। তাই, ৪ এপ্রিল অন্য এক দল হানাদার এসে তাঁকে বাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম দেয়। তারা জানতো না, তাদেরই অন্য সহকর্মীরা তাঁকে গৃহবন্দী করে রেখে গিয়েছিলো। তাদের এই অজ্ঞতা তথা হুকুমটি মোহাম্মদ মোস্লেফের জন্যে শাপে বর হয়। মুক্তি পাওয়ার পর পরই তিনি আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের কাজে। সরাসরি স্বাধীনতা যুদ্ধে।

এবারে তাঁর প্রথম কাজ হয় কয়েকখানা সরকারী গাড়ী দখল করা। সেগুলি নিয়ে তিনি চলে যান মৌলভীবাজারে। সেখানে তাঁর দেখা হয় দুজন স্থানীয় নেতার সাথে। একজন মানিক চৌধুরী, অন্যজন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের সদস্য আবদুল আজিজ। তাঁদের সাহায্যে আর সহযোগিতায় মোহাম্মদ মোস্লেফ আবার একটি পুলিস বাহিনী সংগঠিত করেন। তাঁর এই বাহিনীতে যোগ দেন কয়েকজন দৃঢ়চেতা দেশপ্রেমী পুলিস অফিসার। যাঁদের মধ্যে ছিলেন মৌলভীবাজারের ও.সি., রাজনগর থানার ও.সি., একজন সার্কেল ইন্সপেক্টর প্রমুখ।

তাঁদের পুলিসদল নিয়ে মোহাম্মদ মোস্লেফ আর তাঁর সহযোদ্ধা অফিসাররা একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায়। এই প্রতিরোধ বাহিনীর কর্মক্ষেত্র ছিলো একটি বিস্তীর্ণ এলাকা। কাইন পুল থেকে শ্রীমঙ্গল অবধি। তাঁদের প্রতিরোধ ছিলো এমনি প্রবল যে, সারা এপ্রিল মাসে কোনো হানাদার এই এলাকায় ঢুকতে পারেনি।

কিন্তু ইতিমধ্যে পাকিস্তানী দস্যুদের তৎপরতা অনেক বেড়ে গেছে। তারা

প্রতিরোধের এলাকাটিতে বার বার বিমান হামলা চালাচ্ছিলো। সে-হামলার মোকাবেলা করবার ক্ষমতা মোহাম্মদ মোস্লেফরা কোথায় পাবেন? শেষ পর্যন্ত তাঁরা হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাঁরা তারপর স্থির করেন, দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধ চালানো যেহেতু আর সম্ভব নয়, তাই চলে যাবেন সীমান্তের ওপারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ওপারে যাওয়া তাঁর হয় না। তার আগেই, ৫ মে, হানাদার মেজর আলমদাদ তাঁকে পাকড়াও করে ফেলে।

তারপর থেকেই শুরু হয় তাঁর ওপর নির্যাতন। নানাবিধ প্রশ্নের সাথে। যেসবের মন-ভেজানো কোনো উত্তর তিনি দেননি বা দিতে পারেননি। এবং তাই নির্যাতন সহ্য করেছেন যতো দূর সম্ভব মুখ বুজে।

এই নির্যাতন ছিলো এমনি নির্মম আর ভয়াবহ যে, তাতে এক পর্যায়ে তাঁর ডান পাঁজরের হাড় ভেঙে যায়। মাথাসহ দেহের অনেক জায়গা ক্ষতবিক্ষত হয়। ক্রমে দারুণ মানসিক বিপর্যয় ঘটে। স্মৃতিশক্তি কমে যায়। ওজন হ্রাস পায় তেইশ পাউণ্ড। মুক্তির পরও বেশ কিছু দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। নির্যাতনকালের সব কথা মনে করতে পারেননি। এমনকি, মাঝে মাঝে তাঁর ছেলেমেয়েদের নামও ভুলে যেতেন।

হানাদারদের নির্যাতনে তাঁর বড়ো মেয়েটিরও দারুণ শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি হয়।

গ্রেফতারের পর হানাদাররা তাঁকে প্রথমে নিয়ে গিয়ে তোলে সিলেট মডেল হাই ইস্কুলে। সে-আমলের সালুটিকার বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত, পাহাড় এবং ঝোপজঙ্গলে ঘেরা ইস্কুলটি তখন আর ইস্কুল নয়, পাকিস্তানী নরপশুদের নরনির্যাতনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সেখানে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করেছে, প্রাণ হারিয়েছে অগণিত মানুষ।

মডেল হাই ইস্কুলে মোহাম্মদ মোস্লেফের ঠাঁই হয় দোতলার একটি অন্ধকার কামরায়। সেটি শুধু নির্জনই ছিলো না, আসবাবহীনও ছিলো। সেখানে তাঁর ওপর নির্যাতন চালানোর ভার নেয় একাধিক পশু। মেজর কাইউম, ক্যাপ্টেন জাফর ইকবাল আর নায়েক মোহাম্মদ খান। মুক্তির পর অন্য অনেক কিছু ভুলে গেলেও এই নামগুলি তাঁর মনে ছিলো।

তাদের নির্যাতন চলে দিনের পর দিন। নানা পন্থায়। এরই মধ্যে একদিন তাঁর পাঁজরের হাড় ভেঙে যায়। শরীরটা তো ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলোই। এক-একদিন রক্তে কামরার মেঝে যেন ভেসে গেছে। মোহাম্মদ মোস্লেফ

পুলিস অফিসার, শক্ত সবল দেহের মানুষ। সেই মানুষও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

আশ্চর্যের বিষয়, জ্ঞান ফিরলে তিনি কিন্তু মেঝেয় রক্ত দেখতে পাননি। শুধু তাঁর গায়ের জামাটি রক্তে ভিজে থেকেছে। মেঝেটি হানাদাররা সম্ভবতঃ তাদের চলাফেরার সুবিধার জন্যে–কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে–সাফ করে রাখতো।

নির্যাতনের সময় প্রতি বারই জল্লাদ কাইউম আর জাফর ইকবাল তাঁকে অকথ্য গালাগালি সহযোগে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতো। যেগুলির উদ্দেশ্য ছিলো একটি তথ্য জানা। তিনি কার ইঙ্গিতে, কার সহযোগিতায় বিদ্রোহী হন। তারা তাঁকে হুমকিও দিতো, সদুত্তর না পেলে তাঁকে যে কোনো সময় মেরে ফেলতে পারে।

মোহাম্মদ মোস্লেফ তো ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তাঁর বিবেক, তাঁর দেশের কাছ থেকে। কিন্তু সেকথা জল্লাদদের বলে লাভ কি? তিনি চুপ করে থেকেছেন।

মডেল হাই ইস্কুলে মোহাম্মদ মোস্লেফ তাঁর জখমগুলির জন্যে কখনো ওষুধপত্র পাননি। সেবা–শুশ্রূষা তো ছিলো দূর কি বাত। কেননা, সেসব মানবিক ব্যাপার। এমনকি, খাবার যা পেয়েছেন, তাও এক নির্যাতন। মাত্র খানদুয়েক শুকনো চাপাতি। তার সঙ্গে কচিৎ–কখনো একটুখানি ডাল। পরিমাণে যা দু'তিন চা–চামচের বেশী নয়।

এমনি বন্দীজীবনের একদিনের কথা তিনি এরশাদ মজুমদারকে বলেছিলেন।

সেদিন হানাদারেরা তাঁকে দোতলা থেকে নীচের একটি বাথরুমে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে নিয়ে তাঁকে উলঙ্গ করে ফেলে। তাঁর হাত–পা একখানা চেয়ারের সাথে বাঁধে। তারপর চালাতে থাকে নির্যাতন। দফায় দফায়, নানা কায়দায়। মেজর কাইউম আর ক্যাপ্টেন জাফর ইকবাল। নির্যাতন চালানোর সময় তারা শাওয়ার থেকে তাঁর ওপরে পানি ছেড়ে দেয়। হয়তো তিনি যাতে জ্ঞান না হারান, সেই জন্যে।

তবু তিনি জ্ঞান হারান।

জ্ঞান হারিয়ে কতোক্ষণ বাথরুমে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিলেন, তিনি জানেন না। আবার যখন জ্ঞান ফেরে, তখন শুধু দেখেন, ওপরের সেই কামরাটির মেঝেয় শুয়ে আছেন।

হাতলওয়ালা চেয়ারের সাথে হাত–পা বেঁধে নির্যাতন চালানো হয় আরো

একদিন। জুন মাসের শেষ দিকে।

এমনিভাবে দিন কাটে একে একে এগারোটি।

এই সময় শরীরটা মাঝে মাঝে অসাড় হয়ে এসেছে। তিনি তখন ঘাড়টা সোজা রাখতে পারতেন না। চোখ খোলা। কিন্তু কিছু দেখতে পাননি। তবু নির্যাতন থেকে রেহাই নেই। সেন্ট্রি এসে রাইফেলের বাট দিয়ে বাড়ি মেরে ঘাড় সোজা করে দিতে চেয়েছে। তাতে সব সময় কাজ হয়নি। তখন বাড়ি পড়েছে আরো জোরে, তিনিও আবার চেষ্টা করেছেন ঘাড় তোলার।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, মডেল হাই ইস্কুলের নরকে তিনি একজন মানুষের সাক্ষাৎও পেয়েছিলেন। তাও আবার হানাদার শ্বাপদদের ভেতর। মানুষটি তখন তাঁর নরক–কামরার সামনেকার সেন্ট্রি। তাঁকে দেখে মোহাম্মদ মোস্তফ বড়ো আনন্দ পেয়েছিলেন।

মানুষটির নাম লিয়াকত।

মোহাম্মদ মোস্তফ সেদিন গায়ের জখমগুলির ব্যথায় বড়ো কষ্ট পাচ্ছেন। ভাবছেন, একটু ওষুধ পেলে লাগাতেন, তাতে ব্যথাটা হয়তো একটু কমতো। কিন্তু এই নরকে ওষুধ তাঁকে কে দেবে?

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে বাবার একটি পরামর্শের কথা, এরকম সময়ে ওষুধ না পেলে কেরোসিন লাগাতে পারো। তাতেও উপকার পাবে।

কিন্তু কেরোসিনই বা কোথায় মেলে?

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেন্ট্রি লিয়াকত। যন্ত্রণা সইতে না পেরে এক সময় সাহস করে তাঁকেই বলেন, ভাই, আমার এই কষ্ট। আমাকে একটু কেরোসিন দিতে পারো?

লিয়াকত সব শুনে তাঁর হারিকেন থেকে খানিকটা কেরোসিন ঢেলে নিজেই তাঁর পিঠে মালিশ করে দেন। মোহাম্মদ মোস্তফের কষ্ট তাতে অনেকখানি লাঘব হয়।

এই সেবাটুকুর মাধ্যমে লিয়াকতের সাথে তাঁর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লিয়াকত হয়ে যান তাঁর শুভার্থী বন্ধু। তাঁকে হানাদারদের গোপন কথাটা পর্যন্ত বলে ফেলেন। লিয়াকত তাঁকে জানান, পাকিস্তানী সৈন্যরা যেদিন মুক্তিবাহিনীর কাছে বেশী মার খায়, সেদিন তাদের মেজাজ বিগড়ে যায়। প্রতিশোধ হিসেবে বন্দীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

একদিন লিয়াকত তাঁকে পরামর্শ দেন, মেজরকে তিনি যেন কিছু লিখিতভাবে না বলেন। তাতে বিপদ হবে।

তিনি শুনেছেন, লিখিত কথা শিবিরের অনেকেরই মৃত্যু ডেকে এনেছে।

তাঁকে অবশ্যি কেউ কিছু লিখে দিতে বলেনি।

দিনের পর দিন অমানুষিক নির্যাতনের ফলে তিনি ক্রমে বেঁচে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত, নিজেই জীবনের পালা চুকিয়ে দেন। একদিন তার চেষ্টাও করেছিলেন। গলায় পরনের কাপড় জড়িয়ে। তবে, চেষ্টাটা কেবল মনেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ছেলেমেয়ের–বিশেষ করে, বড়ো মেয়েটির মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠায় সেটা শেষ পর্যন্ত আর হাতে বাস্তব রূপ পায়নি।

জুন মাসের শেষ দিকে সিলেটের হানাদার কর্তৃপক্ষ কি কারণে জানি সিদ্ধান্ত নেয়, তাঁকে ঢাকা পাঠাবে।

এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবার আগে তারা তাঁকে মডেল হাই ইস্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে তোলে সার্কিট হাউসে।

তিনি এতো দিনও বেঁচে আছেন, এই–ই তো এক আশ্চর্য ব্যাপার। ঢাকায় যাওয়ার পর কি ঘটবে, কে জানে? তিনি তাই হানাদারদের একটি অনুরোধ জানান, এখান থেকে বিদায় নেয়ার আগে আমার ছেলেমেয়েদের একটু দেখতে দাও।

উত্তরে তারা যা বলে, তাতে তিনি শিউরে ওঠেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা নাকি সার্কিট হাউসেই আছে। শুধু তা–ই নয়। তিনি আরো দেখতে পান, তারাও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। সবচেয়ে বেশী তাঁর বড়ো মেয়ে। তাদের সাথে দেখা হলে তিনি কোনো কথা বলতে পারেননি। তিনি যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

তিনি এরপর হানাদারদের বলেন, ওদের তো কোনো অপরাধ নেই। তোমরা ওদের কেন এখানে নিয়ে এসেছো?

তারা উত্তর দেয়, তোমার একথা জিজ্ঞেস করবার কোনো অধিকার নেই। তুমি কয়েদী। সুতরাং কয়েদীর মতো আচরণ করবে।

সার্কিট হাউস থেকে আবার তাঁকে মডেল হাই ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখান থেকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা হয় ২ জুলাই। হাত দুখানা শক্ত করে বেঁধে, একখানা ট্রাকে উঠিয়ে। ট্রাক ঘাটে গেলে তাঁকে তুলে দেওয়া হয় আই.ডব্লিউ.টি.এ.–র এক ফেরি নৌকোয়।

ফেরিতে তাঁর সহবন্দী ছিলেন এক কলেজ শিক্ষক–অধ্যাপক ইউসুফ। অন্য যাত্রী অনেক। তাদের সবাই হানাদার। তারা তাদের পছন্দমতো জায়গায়

বসে ছিলো। তাঁদের দুজনের থাকা- শোওয়ার জায়গা হয় ডেকের ওপর।

তাঁরা ফেরিতে ছিলেন দু'দিন। এই দু'দিনে তাঁকে আর অধ্যাপক ইউসুফকে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি। তাঁদের বরাতে জুটেছে শুধু হানাদারদের এঁটোকাঁটা।

৫ জুলাই সকাল সাড়ে দশটায় তাঁদের ঢোকানো হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ জায়গায়। তাঁদের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ থাকে না। স্বাধীনতার পর অধ্যাপক ইউসুফের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ক্যান্টনমেন্টের বন্দীজীবনের কোনো বিবরণ মেলে না। তিনি শুধু বলেছেন, সেখানেও তাঁর ওপর সিলেটের ধরনে নির্যাতন চলে।

তাঁর কাহিনীতে যতি টানি তাঁরই কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করে।

এরশাদ মজুমদারকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় তিনি মাঝে মাঝে কথার খেই হারিয়ে ফেলেন। কখনো কখনো ডুকরে কেঁদে ওঠেন। চোখ থেকে অবিরাম পানি ঝরে। এই সবের এক ফাঁকে তিনি বলেন, এতো নির্যাতনেও বেঁচে থাকবেন, বাইরের মুক্ত আলো-বাতাস আবার দেখবেন, আত্মীয়-প্রিয়জনদের কাছে ফিরে আসতে পারবেন, এ-আশা তাঁর ছিলো না।

গলার কাছে ইঞ্জিনের চাকা

মোহাম্মদ মোস্তফের ওই কথাগুলিও জুড়ে দেওয়া যেতো, যায়-অন্য বহু বাঙালীর মুখে। যাঁরা 'একাত্তরে হানাদার শ্বাপদদের নখরে কবলিত হওয়ার পরও মুক্ত আলো-বাতাসে ফিরে এসেছেন। হ্যাঁ, তাঁদেরও কারোই আশা ছিলো না, আবার প্রিয়জনের আদর-ভালোবাসা ভরা মুখ দেখতে পাবেন। ঢাকার মিয়া মুহম্মদ সিরাজুল হক, শামসুল আলম আর সাহিদুল বারী, বাহিরচর ষোলোদাগের আমীরুল ইসলাম, বক্কর আলী, আবদুল লতীফ, বাদশা আর রতন

আলী, দিয়াড় বাঘইলের ওয়াহেদ আলী প্রামাণিক আর আবু হেনা, মীরপুরের আতিয়ার রহমান আর তাজুল,—সবার কাহিনীই তো এই কথাই বলে।

আরো বলে ফজলুল হকের কাহিনী। যাঁর মুখ থেকে পছন্দসই স্বীকারোক্তি আদায়ের মতলবে গলার ওপর দিয়ে ইঞ্জিনের চাকা চালানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে একাধিকবার। তিনি বাহিরচরের অনেক নির্যাতিতের একজন।

ইঞ্জিন চালানোর বিবরণে পরে আসি। আগে তাঁর সম্পর্কে কিছু বিস্ময়কর কথা বলে নিই।

ফজলুল হকের বাড়ী বাহিরচরের একেবারে পূবপাড়ায়। হার্ডিঞ্জ ব্রীজের পশ্চিম মাথার কাছে, পদ্মা নদীর ধারে। পাড়াটির নাম বারো দাগ। আয়তনে বেশ বড়ো এবং মূল গ্রাম থেকে একটু দূরে বলে পাড়ার বাসিন্দারা তার একটি আলাদা গ্রাম–নামও দিয়েছিলো। সেই বৃটিশ আমলেই। নামটি কাঁটামাঠবাড়িয়া। ফজলুল হক কাঁটামাঠবাড়িয়া তথা বাহিরচর বারো দাগের সাকের আলী প্রামাণিকের ছেলে।

পেশায় ফজলুল হকেরা পুরুষানুক্রমে চাষী,—যদিও এখন তিনি মাঝে মাঝে ছোটোখাটো ব্যবসাও করেন। জ্ঞানবিদ্যার সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকার কথা নয়। তাই, রাজনীতির সাথেও। কিন্তু 'একাত্তরে দেখা গেল, চাষী ফজলুল হকও হয়ে উঠেছেন রাজনীতিসচেতন। শুধু তা–ই নয়, প্রতিরোধ তথা মুক্তিসংগ্রাম সংগঠন আর তাতে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাও তিনি রাখেন।

সময়টা চৈত্রের শেষ সপ্তাহ অর্থাৎ এপ্রিলের মাঝামাঝি। বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে শহরে হানাদার, বিহারী আর রাজাকাররা হত্যালীলা, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন আর লুটপাট শুরু করেছে। ফজলুল হক প্রতিদিনই লোকমুখে সেসবের কিছু কিছু খবর শোনেন। ক্রমে তাঁর মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, হানাদারদের সদ্য–দখলে–আসা শহর ভেড়ামারার বাসিন্দাদের ওই সব নারকীয় কাণ্ডের সময় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখে।

শেষ পর্যন্ত চাষী তরুণ ফজলুল হক প্রতিরোধের সংগ্রামে এগিয়ে আসেন। একটি ছোট্টো ঘটনার প্রায় তাৎক্ষণিক.প্রতিক্রিয়ায়। ভেড়ামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কলোনিতে বাস করতো বেশ কিছু বিহারী কর্মচারী। দেশে হানাদারদের হামলা নিয়ে একদিন তাদের সাথে ফজলুল হকের তিক্ত কথা কাটাকাটি হয়। তার জ্বালায় তিনি আত্মীয়–স্বজন আর গ্রামবাসী অন্যদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তোলার কথা ভাবতে থাকেন। এবং অচিরেই তা গড়েও ওঠে। তাঁর উদ্যোগে

তাঁর ফুফাতো ভাই নবীরউদ্দীন, বাবর আলী মাস্টার, রেণু, মধু মোল্লা প্রমুখসহ পঞ্চাশ-ষাটজন গ্রামবাসীকে নিয়ে।

কিন্তু বাহিনী তো গঠিত হল। এর পরের কর্তব্য কি ? মুক্তিযুদ্ধ তখনও ঠিক সংগঠিত নয়। তবে, তাঁরা ভাবেন, পাকশীর দিকে গেলে কিছু সহযোগী মিলতে পারে। সুতরাং সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। সিদ্ধান্ত নেয়ার একটু পরই তাঁরা নদী পার হয়ে ওদিকে চলে যান। এবং অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পান, সেখানে ই.পি.আর.-এর কিছু সদস্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আর কি? ফজলুল হকেরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দলে যোগ দেন।

তারপর তাঁদের প্রথম কাজ হয় এক দুষ্ট বিহারীকে পাকড়াও করা। লোকটা ছিলো পাকশীর স্টেশন মাস্টার। সে কোনো বাঙালীকে সামনে পেলেই তার সাথে খিটিমিটি বাধাতো। ফজলুল হকেরা ই.পি.আর.-এর সদস্যদের সহযোগিতায় তাকে ধরে নদীর ধারে এনে রাখেন। পরে ই.পি.আর. বাহিনী এসে তাকে গুলি করে মেরে ফেলেন। তাঁদের নির্দেশে ফজলুল হক লোকটির লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে আসেন। তাঁর মনের জ্বালা একটুখানি কমে।

কিন্তু তারপরই একটি চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া যায়। পাকশী থেকে তিন-চার মাইল দূরে নতুনহাট নামে একটি জায়গায় হানাদার বাহিনী এসেছে। খবরটির সত্যতাও প্রমাণিত হয় অচিরেই। যখন্ নতুনহাটের দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসতে থাকে। সেই আওয়াজ থেকে আরো বোঝা যায়, হানাদাররা তাঁদের দিকেই এগুচ্ছে।

এখন ফজলুল হকদের প্রথম এবং সবচেয়ে বড়ো ভাবনা, হানাদারদের অগ্রগতি কিভাবে প্রতিহত করা যায়। তাঁরা প্রায় তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেন, পাকশীর দিক থেকে হার্ডিঞ্জ ব্রীজে ওঠার সিঁড়িটির এক মুখ ভেঙে ফেলতে হবে। যাতে হানাদাররা ব্রীজ পেরিয়ে পশ্চিমে বাহিরচর বা ভেড়ামারার দিকে যেতে না পারে।

সিঁড়ির অন্য মুখটি তখন বন্ধ ছিলো।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁরা যথাশীঘ্র সিঁড়ির নীচে মাইন পাতেন। ই.পি.আর. বাহিনীর সহযোগিতায়। একটু পরই মাইন বিস্ফোরণের ফলে সিঁড়িটি ভেঙে পড়ে। ফজলুল হক তখন তাঁর দলবল নিয়ে নদীপথে বাড়ী ফিরে আসেন। তবে, কিছুক্ষণ পরই তাঁরা ই.পি.আর. বাহিনীর ভেড়ামারা ফেরি ঘাটের ক্যাম্পে ফিরে যান।

ক্যাম্পটির পরিচালনায় তখন ছিলেন সুবেদার ওসমান আলী। তাঁর সাথে

ফজলুল হকদের পরিচয় হয়। তিনি তাঁদের অনুরোধ জানান, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের গুলি-বারুদ ছড়িয়ে আছে। আপনারা সেগুলি গুছিয়ে এনে এক জায়গায় জমা করুন।

ফজলুল হকেরা অনুরোধটি সানন্দেই রক্ষা করতেন। কিন্তু তার সময় পাননি। তখন হানাদাররা পাকশী ফেরি ঘাট থেকে গুলি চালাতে শুরু করেছে। সেই গুলি নদীর পশ্চিম পারে ভেড়ামারা ফেরি ঘাটে এসে পড়ছে। উত্তরে ই.পি.আর. বাহিনীও গুলি চালায়। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। হানাদারদের হাতে আধুনিক ভারী অস্ত্র। তার গোলা-গুলি নানান দিক থেকে ভেড়ামারা ঘাটে এসে পড়তে থাকে। তাতে ই.পি.আর. বাহিনীর ছয়জন এবং ফজলুল হকের ভাই ইনসান আলী শহীদ হন।

ই.পি.আর. বাহিনীকে এবার আত্মরক্ষার নিরাপদ উপায়ের কথা ভাবতে হয়।

তাঁরা তখন সন্ত্রস্ত। সুবেদার ওসমান আলী তাঁর সহকর্মীদের নির্দেশ দেন, তোমরা পেছন দিকে যে যেখানে পারো পালিয়ে যাও। পালালেন তিনি নিজেও। ফজলুল হকের গায়ের চাদরখানা চেয়ে নিয়ে তাঁর মেসিনগানটায় জড়িয়ে।

ঠিক সেই সময়ই হানাদাররা নৌকোযোগে নদী পার হয়ে ভেড়ামারা ফেরি ঘাটে এসে পৌছয়। ফজলুল হক তখন বাড়ী চলে আসেন। ই.পি.আর.-এর একজন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে। রাত চারটেয়। এর আগের দিন তিনি বাড়ীর লোকজন অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের কৃষাণ ছাড়া সবাইকে। ঘরে তাই রান্নাবান্না হয়নি। ফজলুল হক টিন থেকে কিছু ছাতু আর গুড় বার করেন। সঙ্গীসহ খাবেন বলে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, খাওয়া হয় না। হঠাৎ কোথা থেকে যেন রাইফেলের গুলি এসে পড়ে বাড়ীর ভেতর। পর পর কয়েকটি। তাঁরা তখন কৃষাণসহ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তিনজনে বাড়ীর সামনে একটি নীচু জায়গায় শুয়ে পড়েন।

সেই অবস্থায় তাঁরা বুঝতে পারেন, হানাদাররা ফেরি ঘাট থেকে বারো দাগের দিকে এগিয়ে আসছে। ফজলুল হকের এবার ইচ্ছে হয় তাদের উদ্দেশে গুলি চালাতে। তাঁর হাতে তখন একটি রাইফেল ছিলোও বটে। রাইফেলটা তাঁকে ওই রাতেই ই.পি.আর. বাহিনী দিয়েছিলো। কিন্তু তিনি তো ও-বস্তু চালাতে জানেন না। বিপদের সময় এক মুহূর্তে শিখে নেয়াও সম্ভব নয়। তবু সঙ্গী ই.পি.আর. সদস্যটি তাঁকে শিখিয়ে দিতে লাগলেন।

কিন্তু সেই শেখানোও শেষ হয় না। ফজলুল হক হঠাৎ দেখেন, তাঁদের

খোলায়–অর্থাৎ ধান মাড়াইয়ের জায়গাটিতে–সাত–আটজন হানাদার দাঁড়িয়ে আছে। এদিক–ওদিক তাকাচ্ছে। তাঁদের ওপর চোখ পড়তেই তারা একটা হাতবোমা ছুড়ে মারে। ফজলুল হক বিপদ বুঝে চক্ষের পলকে লাফ দিয়ে পাশের কলার ঝাড়ে গিয়ে ঢোকেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। তাতে হতভাগ্য ই.পি.আর. সদস্য আর তাঁদের কৃষাণটি মারা পড়েন। কৃষাণের বাড়ী ছিলো চুয়াডাঙার দিকে।

এরপর হানাদাররা তাঁর ঘরের ওপর বোতল গোছের কি একটা জিনিষ ছুড়ে দেয়। সেটা সশব্দে ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চার–পাঁচটি ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। ঘরগুলির সবই ছিলো কাঁচা। খড়ের চালা আর বাঁশের বেড়ার।

হানাদাররা চলে গেলে তিনি নিরাপদ এক পথে পালিয়ে যান। দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে ওঠেন বড়ো ঘোলোদাগে।

পরে তিনি শুনেছিলেন, হানাদাররা সেদিন ছয়জনকে গুলি করে মেরে ফেলে। এই শহীদদের নাম সোনা সর্দার, মজিদ প্রামাণিক, ওয়াজ প্রামাণিক, আজহার প্রামাণিক, আতর আলী সর্দার আর তৈজদ্দীন। তাঁরা সবাই ছিলেন বারো দাগের বাসিন্দা।

ফজলুল হক বড়ো ঘোলোদাগ থেকে পালিয়ে চলে যান রুণকি পশ্চিম নামের একটি গ্রামে। সেখানে তিনি ছিলেন দেড় মাস।

এরপর তিনি জানতে পান, তাঁর নামে রাজাকারদের নানান অভিযোগ। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সহযোগিতা করেন, বিহারীদের মেরে ফেলেন ইত্যাদি। রাজাকাররা তাই তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এসব কথা শুনে তাঁর শুভার্থীরা বলে, তুমি কিছু দিন সরে থাকো।

ফজলুল হক তখন যশোর চলে যান। সেখানে তাঁদের পাড়ার জকির নামে এক রেল মিস্ত্রী ছিলেন। ফজলুল হক তাঁর সাথে দেখা করেন। জকির মিস্ত্রী ফজলুল হককে রেলের খালাসীর চাকরি দেন।

তিনি খালাসীর চাকরি করেছিলেন এক মাস। সে–মাসের মাইনে পেয়েই চাকরিটা ছেড়ে দেন। কিছু চাল কিনে গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি আগেই খবর পেয়েছিলেন, তাঁর পরিবারের লোকজন বড়ো ঘোলোদাগ পাড়ায় তাঁর ফুফাতো ভাই সাদেক আলী খাঁর বাড়ীতে আছে। ফজলুল হক তাই নিজের বাড়ীতে না গিয়ে সেইখানে ওঠেন।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর তিনি একটা বারান্দায় শুয়ে পড়েন।

রাত বারোটা–একটার দিকে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। কারা যেন

সাদেক আলীকে ডাকছিলো। ফজলুল হক চোখ মেলে দেখেন, হানাদাররা বাড়ীটা ঘেরাও করেছে। তারাই ডাকছে সাদেক আলীকে। এদিকে, চারজন হানাদার ফজলুল হকের গায়ে চারটি রাইফেল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হানাদারদের ডাকাডাকিতে সাদেক আলীও ইতিমধ্যে উঠে পড়েছিলেন। তারা তাঁকে কিছুক্ষণ গালাগালি দেয়। তারপর ফজলুল হককে বেঁধে গঙ্গা–কপোতাক্ষ প্রকল্প–জি.কে. প্রজেক্টের পাম্প হাউসে নিয়ে যায়।

ফজলুল হকের বুঝতে বাকী থাকে না, রাজাকাররা সাদেক আলী খাঁর বাড়ীর ওপর সর্বক্ষণ নজর রেখেছিলো। তাঁদের পরিবারের লোকজন সেইখানে এসে ওঠায়। তারাই হানাদারদের খবর দিয়ে সাদেক আলী খাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসে।

পাম্প হাউসে ফজলুল হককে নিয়ে তোলা হয় দোতলার একটি কামরায়। সেখানে তাঁকে প্রথম 'অভ্যর্থনা' জানায় তারের চাবুকধারী এক হানাদার। কিন্তু কি কারণে যেন লোকটি তাঁকে মারে না। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য একটি কামরায়। হানাদাররা কামরাটির ভেতর বিদ্যুৎ চালানোর প্রস্তুতি নেয়। উদ্দেশ্য, বিদ্যুৎস্পর্শ দিয়ে তাঁর ওপর নির্যাতন চালাবে–কিংবা তাঁকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু এবারও কিছুই হয় না।

কামরাটিতে তিনি ছিলেন ঘন্টা দুয়েক। তারপর তাঁকে হাত বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচে। পাম্প হাউস থেকে বেরুনোর আগে হানাদাররা প্রশ্ন করে, ব্রীজের সিঁড়ি কে ভেঙেছিলো?

ফজলুল হক কোনো জবাব দেননি।

পরবর্তী প্রশ্নকারী এক ক্যাপ্টেন। ব্রীজের নীচে সে তার সৈন্যদের জিজ্ঞেস করে,–মূল লক্ষ্য যদিও ফজলুল হক,–এ লোক কি করে?

ঃ এ বহুত হারামী আদমি। মুক্তি।

ঃ ঠিক আছে। তোমরা চলে যাও।

ফজলুল হক তখন হাত বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ ক্যাপ্টেন লাফিয়ে উঠে তাঁর বুকে লাথি মারে। তিনি টাল সামলাতে না পেরে চিত হয়ে পড়ে যান। ক্যাপ্টেন তখন তাঁর উরুর ওপর বসে রাইফেলের বাট দিয়ে বুকে বাড়ি মারতে থাকে। একের পর এক।

একটু পরই ফজলুল হক বেহুঁশ হয়ে পড়েন।

জ্ঞান ফিরলে তিনি এক হানাদারকে বলতে শোনেন, মেজর সাহেব বলে

পাঠিয়েছেন, লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

মেজরের কাছে গেলে তাঁকে প্রথমে প্রশ্ন করা হয়, তোমার বাড়ী কোথায়?

ঃ এখানেই।

পরের প্রশ্ন, তোমাকে কি জন্যে ধরে আনা হয়েছে, জানো?

ঃ জ্বী না, জানিনে।

মেজর এবার সামনের হানাদারদের হুকুম দেয়, একে সাত নম্বর গার্ডারে নিয়ে যাও।

হার্ডিঞ্জ ব্রীজের সাত নম্বর গার্ডারে নির্যাতনের বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো।

ফজলুল হককে এবারে ব্রীজে ওঠানো হয়। একখানা রেল ইঞ্জিনে তোলার জন্যে। ইঞ্জিনখানা ব্রীজের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলাচল করতো।

ইতিমধ্যে ফজলুল হকের বাবা আর বড়ো ভাই খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন। তাঁরা তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে মেজরের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি জানান। কিন্তু কে শোনে কার কথা? হানাদাররা তাঁকে ইঞ্জিনে উঠিয়ে সাত নম্বর গার্ডারে নিয়ে যায়।

ঠিক সেই সময়ই গার্ডারের ক্যাপ্টেনের কাছে ফোন আসে, তাঁকে ওপারে অর্থাৎ পাকশীর দিকে নিয়ে যেতে হবে।

সুতরাং ইঞ্জিন আবার চললো।

ওপারে গিয়ে তিনি ইঞ্জিন থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে আস্ত জানোয়ার গোছের চেহারার এক জল্লাদ এসে হাজির। লোকটি একাই তাঁকে উঁচু করে উঠিয়ে পাকশী স্টেশনের একটি কামরায় নিয়ে যায়,-যেখানে এখন স্টেশন মাস্টার বসেন। তিনি সেখানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে এক দল হানাদার তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবার হাতেই চাবুক। এবং সব কটি চাবুকের বাড়ি তাঁর ওপর পড়তে থাকে। এক সাথে, একটানা। মাঝে মাঝে নতুন হানাদার কামরায় আসে। আগের দলটির কাউকে বলে, দোস্ত, আমাকে দাও। তারপর, চাবুক হাতে পেতেই টাটকা জোশ নিয়ে শুরু করে মার।

এমনিভাবে সবার মারের পালা চুকে গেলে একজন বলে, এই শালা, এবার শুয়ে পড়। ঘুমো।

ফজলুল হক শুয়ে পড়েন।

হানাদাররা তখন তাঁকে নিয়ে যায় স্টেশনের ওপরে। রেললাইনের ওপর শুইয়ে দেয়। ইঞ্জিন তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার ড্রাইভারকে বলে, ইঞ্জিন চালাও।

ড্রাইভার ইঞ্জিন নিয়ে এগিয়ে আসে। প্রথমে একটু জোরেই। পরে আস্তে আস্তে।

চাকা যখন ইঞ্চি ছয়েক দূরে, তখন একজন হানাদার ড্রাইভারের উদ্দেশে বলে, থামো।

ইঞ্জিন থেমে যায়।

তখন আবার নির্দেশ হয়, পিছাও।

ইঞ্জিন সরে গেলে হানাদারটি ফজলুল হকের স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে, এখনো সময় আছে। সত্যি করে বলো, তুমি মুক্তিযোদ্ধা কিনা। নইলে কিন্তু তোমার ওপর দিয়ে ইঞ্জিন চালানো হবে।

ফজলুল হক হানাদারদের কোনো কাঙ্ক্ষিত উত্তর দেন না।

এইভাবে ইঞ্জিন আনা আর পিছিয়ে নেয়া এবং স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা চলে কয়েক বার।

এতে যখন কোনো ফল হয় না, তখন হানাদাররা আবার তাঁকে নীচে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে হলঘরে নামিয়ে দিয়ে বলে, শুয়ে পড়।

এবার আবির্ভাব ঘটে অন্য এক হানাদারের। তার হাতে প্রায় তিন ফুট লম্বা এক তলোয়ার। সে ফজলুল হকের মাথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর বলে, তুমি যেমন মানুষ, তেমনি আমিও মানুষ। তুমিও মুসলমান, আমিও মুসলমান। আমার কাছে সত্যি কথা বলো। নইলে তোমাকে খুন করবো।

এই সময় ক্যাপ্টেন বলে, থাক। লোকটাকে আটকে রাখো।

হানাদাররা তার কথায় তাঁকে অন্য এক কামরায় নিয়ে যায়। ঘরটায় আরো দুজন বন্দী ছিলো। একজনের বাড়ী রাজশাহী জেলার লালপুরে। অন্যজন নাটোরের এক হকার। দুজনেই অর্ধমৃত।

তাঁকে যখন কামরাটিতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা। দশটার দিকে দরজা খুলে একজন হানাদার ঘরে ঢোকে। সঙ্গে দশ–বারো বছরের একটি ছেলে। তার হাতে ছোটো একটি বালতি। তাতে ছোটো ছোটো রুটি। ছেলেটা তাঁকে খানদুয়েক রুটি আর দু'টুকরো মাংস দিয়ে বলে, খেয়ে নাও।

ফজলুল হক জবাব দেন, ক্ষিধে নেই। খাবো না।

ছেলেটা জবাব শুনে তাঁকে একটা চড় মারে। হুকুমের সুরে আবার বলে, খেয়ে নাও।

তিনি আর কিছু না বলে খেয়ে নেন।

রাত বারোটার দিকে আসে আর এক হানাদার। ফজলুল হক তাকে আগেও দেখেছেন। তাঁকে যখন চাবুক মারা হচ্ছিলো, তখন। সে কিন্তু তাঁকে মারেনি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুধু অন্যদের চাবুক মারা দেখছিলো।

ঘরে ঢুকে লোকটি আলাপ শুরু করে। বেশ নরম গলায়। প্রথমে জানতে চায়, তাঁর বাড়ী কোথায়। তারপর সাহস দেওয়ার সুরে বলে, ঘাবড়িয়ো না। আমি তোমার জন্যে আমার ওপরওয়ালার কাছে সুপারিশ করবো।

সে তাঁর কাছে তাদের নিজেদের কথাও কিছু বলে।

ভোরবেলা আবার দরজা খোলা হয়। হানাদাররা হুকুম করে, একজন একজন করে বাইরে এসো। পেশাব করে যাও।

ফজলুল হকেরা তিনজন। এবং তিনজনই প্রায় পঙ্গু। তাঁরা অনেক কষ্টে বাইরে আসেন। এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর কামরার দিকে পা বাড়ান।

এই সময় লালপুর আর নাটোরের বন্দী দুজনের উদ্দেশে হুকুম হয়, তোমরা দাঁড়াও। আর, ফজলুল হক হুকুম পান, তুমি ভেতরে যাও।

তিনি কামরায় ঢুকতেই বাইরের দুজনকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। এদিকে, ফজলুল হকের কামরার দরজায় আবার তালা পড়ে।

এর ঘন্টা তিন–চার পর স্টেশন বাড়ীটার কাছে ছয়খানা জীপ আসে। তখন ফজলুল হকের কামরার দরজা আবার খুলে দেওয়া হয়। তিনি দেখেন, কামরার সামনে চেয়ার পেতে বসে আছে তিনজন মেজর। তারা নাকি হার্ডিঞ্জ ব্রীজের দুই মাথার দুই ক্যাম্পের মেজর আর পাবনার এক কর্ণেল। ফজলুল হকের তাদের সামনে ডাক পড়ে। একজন হানাদার তাঁকে কামরা থেকে বার করে আনে। তারপর তিনি নিজের থেকেই এগুতে থাকেন। কিন্তু শরীর দুর্বল। দু'পা এগুতেই পড়ে যান। কোনো ক্রমে উঠে আস্তে আস্তে অফিসারগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

তখন কর্ণেলটি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। প্রশ্ন সবই পুরোণো। তাঁর বাড়ী কোথায়, তিনি মুক্তিযোদ্ধা কিনা ইত্যাদি। বাড়তি কথার মধ্যে তিনি শোনেন, তাঁর বিরুদ্ধে কেস ছিলো, তিনি মুক্তিবাহিনীতে ছিলেন এবং বিহারী হত্যা করেছেন। ফজলুল হক প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দেন। কিন্তু অভিযোগগুলি অস্বীকার করে।

এরপর কর্ণেলটি ভেড়ামারা ফেরি ঘাট ক্যাম্পের মেজরের কাছে জানতে চায়, তাঁকে কেন ধরা হয়েছে। মেজর কি যেন একটা উত্তর দেয়। ফজলুল হক সেটা বুঝতে পারেন না। তাদের সব কথাবার্তাই উর্দূতে হচ্ছিলো। তাঁর কাছে

সে-ভাষা দুর্বোধ্য।

তবে, তিনি তাদের অনুমতি নিয়ে বলেন, স্যার, আমি নির্দোষ। কিছুই করিনি।

তাঁর কথা শুনে তারা তাঁকে ধমক দেয়। তারপর তাদের মধ্যে কি কি যেন নিয়ে আলোচনা চলে। অনেকক্ষণ।

আলোচনা শেষ হলে একজন বলে, ঠিক আছে। তুমি বাড়ী চলে যাও।

ফজলুল হক তখন আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে রওনা হন।

কিন্তু তিনি খানিক দূর এগুতেই পেছন থেকে ডাক পড়ে। একজন হানাদার এসে বলে, আমার মেজর সাহেবের হুকুম, তোমাকে বাড়ী পৌছিয়ে দিতে হবে।

তারপর তারা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা ইঞ্জিনে ওঠায়। ইঞ্জিন হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পার হয়ে বারোদাগ পাড়ার কাছে তাঁকে নামিয়ে দেয়। ফজলুল হক অতি কষ্টে হেঁটে সেখান থেকে বাড়ী এসে পৌছন।

এবার চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষার পালা। আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে।

চিকিৎসা চলে দীর্ঘ দিন। এতো দীর্ঘ দিন যে, তা শেষ হওয়ার আগেই হানাদাররা আত্মসমর্পণ করে।

নিষ্ঠুরতা কতো রকমের

ফজলুল হককে হানাদাররা শেষ পর্যন্ত কি কারণে ছেড়ে দিয়েছিলো, তা তারাই জানে। তবে, সে-কারণ যে বাঙালীর গলার ওপর দিয়ে ইঞ্জিনের চাকা চালানোর ব্যাপারে অনভ্যাস নয়, সেটা হার্ডিঞ্জ ব্রীজের আশপাশের কারো অজানা নেই। তাঁদের বরং সাক্ষ্য, ইঞ্জিন চালিয়ে নরহত্যায় রীতিমতো অভ্যস্তই ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় গোড়ার দিক থেকেই। ফজলুল হক গলা বাঁচিয়ে ফিরে আসেন জুলাইয়ের প্রথম দিকে। 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার তৎকালীন

এক মফস্বল সংবাদদাতা, ভেড়ামারার কন্ট্রাক্টর নূরুল হকের ডায়েরি বলে, হার্ডিঞ্জ ব্রীজে নরহত্যা ঘটে এর অনেক আগে, ৩০ এপ্রিল। সেটি সেখানকার প্রথম ঘটনা কিনা, কেউ জানে না। কিন্তু একটি ছোটোখাটো গণহত্যা যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আগেই বলেছি, ভেড়ামারা হানাদারদের নিয়ন্ত্রণে আসে ১৩ এপ্রিল এবং তারা তখন থেকেই স্থানীয় তথা শহরের আশপাশের এলাকার মানুষজনকে দেখামাত্র গুলি করে মারতে থাকে। তাদের এ-জাতীয় নরহত্যা চলে বেশ কয়েক দিন। এই সময় তারা 'পোকা বাছাই'-ও শুরু করে। এই পোকা বাছাই ছিলো স্বাধীনতার সপক্ষের-বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ সমর্থক আর কর্মীদের খুঁজে পেতে ধরে এনে মেরে ফেলা। হানাদারদের এ-জাতীয় অপারেশন আবার শুধু ভেড়ামারা বা তার আশপাশের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, পদ্মার পূব পাশের গ্রামগুলিতেও প্রসারিত হয়। সে-সময় অনেক হতভাগ্যই হার্ডিঞ্জ ব্রীজে গাড়ীর চাকার তলায় অথবা হানাদারদের অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারান।

৩০ এপ্রিলের ঘটনায় শহীদ হন এক সঙ্গে আঠারোজন। হানাদাররা তাঁদের ধরে এনেছিলো পাকশী রেল স্টেশনের দক্ষিণ দিকের রূপপুর, সাহাপুর আর দাশুড়িয়া গ্রাম থেকে। পাকড়াও করবার পর হানাদাররা প্রথমে তাঁদের রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আটকে রাখে। তারপর, রাত্তিরে, নিয়ে যায় হার্ডিঞ্জ ব্রীজের ওপর। সেখানে সবাইকে হাত-পা বেঁধে রেললাইনের ওপর শুইয়ে দেয়। এবং শেষে তাঁদের ওপর দিয়ে চালায় হন্তারক ইঞ্জিন। সেদিন ছিলো শুক্রবার।

শহীদদের পিষ্ট, ছিন্নভিন্ন লাশগুলি নীচে পদ্মা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

প্রায় এমনি আর একটি হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এর কয়েক দিন পরই, ৬ মে। আর, নূরুল হক খোঁজখবর নিয়ে এটির কথাও লিখে রেখেছিলেন তাঁর ডায়েরিতে।

এবারের ঘটনার শিকার ছিলেন সিরাজগঞ্জ থেকে ধরে আনা এগারোজন বাঙালী। তাঁদেরও হানাদাররা প্রথমে আটকে রাখে পাকশী রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে। তারপর তারা আর রাতের অন্ধকারের জন্যেও অপেক্ষা করেনি। বেলা এগারোটায়ই নিয়ে যায় ব্রীজের ওপর। এবং তাঁদের হাত-পা বেঁধে নদীতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে।

কিন্তু এবারের হত্যাযজ্ঞ ঠিক নির্বিঘ্নে হয়নি। বন্দীদের পক্ষ থেকে বাধা আসবার কারণে। তাঁদের যখন নদীতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিলো, তাঁরা তখন দুজন পাকিস্তানী জল্লাদকে ধরে ধস্তাধস্তি শুরু করেন। তার ফলে এক

সময় ওই দুই জল্লাদসহ সবাই নদীতে পড়ে যান। তাঁদের একজন ভালো সাঁতার জানতেন। তিনি হাত উঁচু করে কখনো সাঁতার দিয়ে, কখনো স্রোতে ভাসতে ভাসতে পাবনার কাছে নদীর পাড়ে গিয়ে ওঠেন। তিনি ছাড়া অন্য সব বন্দীই শহীদ হন। জল্লাদ দুজনও নদীতে ডুবে মারা যায়।

পাকিস্তানী জল্লাদদের বহুবিচিত্র নিষ্ঠুরতার কয়েকটি লোমহর্ষক ঘটনার কথা শুনেছিলাম ঢাকায় বসে। সম্ভবতঃ মে মাসে। বলেছিলেন আমার এক সহকর্মী। যুদ্ধের সময়কার বেশ কিছু খবর আমি লিখে রাখি। আফসোসের বিষয়, সহকর্মীর দেওয়া খবরগুলি কেবল শুনেই গেছি। সেগুলির স্থান-কাল এখন তাই মনে পড়ে না, মনে আছে শুধু চুম্বকটুকু।

একটি ঘটনা শিশুহত্যার।

হানাদাররা তখন কোনো কোনো জায়গায় গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তাতে কতো মানুষ যে পুড়ে মারা যায়, তার হিসেব নেই। যারা আগুনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পালানোর চেষ্টা করে, হানাদাররা তাদের গুলি করে মারে। নয়তো ধরে আগুনের ভেতর ফেলে দেয়। এমনি হামলার সময় এক গ্রামে তারা একটি শিশুকে শূন্যে ছুড়ে মারে। তারপর সেই মাসুম শিশুটিকে বেয়নেটের মাথায় লুফে নেয়।

আর একটি ঘটনা। এটিও বলেছিলেন কোনো সহকর্মী। এবং এ-ঘটনাও গ্রাম ঘিরে হামলার সময়কার।

তখন হানাদাররা একটি ছোটো ছেলেকে ধরে তাকে দিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ছেলেটি তাদের হুকুমে সাড়া দেয়নি। বলা বাহুল্য, সে তখন ছিলো ভয়ে অসাড়। হানাদার জল্লাদরা সেটা বোঝেনি,-বুঝবার কথাও তাদের নয়। তারা বরং ধরে নেয়, ছেলেটির উত্তর না দেওয়ার অর্থ নীরব প্রতিরোধ। সুতরাং একটি নারকীয় প্রতিশোধ নেয়। ছোটো একটি পাকিস্তানী পতাকা যোগাড় করে তার ডাণ্ডাটি ভারী কি একটা জিনিষ দিয়ে ঠুকে ঠুকে তার মাথায় পুঁতে বসিয়ে।

পাকিস্তানী নিষ্ঠুরতার এক বিচিত্র কাহিনী আমাকে বলেছেন ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী। ঘটনাটি কুলাউড়া উপজেলার কাদিপুর গ্রামের। এবং তাঁর খুড়তুতো ভাই ফটিক সোমকে নিয়ে।

ফটিক সোমেরা ছিলেন নির্বিরোধ মানুষ। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমাজের এলাকাটিতে তাঁদের তেমন কোনো শত্রুও দেখা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধকালের জাতি নির্যাতন-বিশেষতঃ হিন্দু নিধনের সময়ও তাঁরা তাই

হিন্দুদের দেশত্যাগের হিড়িক সত্ত্বেও পৈতৃক ভিটেতেই পড়ে থাকেন। মাঝে মাঝে এদিক–ওদিকে ভয় পাওয়ার মতো দুই–একটি ঘটনা ঘটলেও।

এইভাবে একে একে পাঁচ মাস কেটে যায়। তারপর, সেপ্টেম্বরে, দেখা দেয় দারুণ দুর্যোগ। সেদিন হঠাৎ গ্রামে এক দল জল্লাদ ঢুকে পড়ে। এক সময় তারা এসে দাঁড়ায় ফটিক সোমের বাড়ীতে। হয়তো রাজাকারদের গোপন ইঙ্গিতে বা পরিচালনায়। তারপর তারা ফটিক সোমকে জোর করে ধরে বাইরে নিয়ে আসে। বাড়ীর সামনেকার বড়ো পুকুরের ধারে। সেখানে একটি কবর খোঁড়ানো হয়। কবর তৈরির পর জল্লাদরা জ্যান্ত মানুষটিকে করাত দিয়ে কেটে দু'টুকরো করে। তাঁর স্ত্রী–পুত্রকন্যার চোখের সামনেই। এবং শেষে টুকরো দুটিকে লাথি মেরে কবরে ফেলে দিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে। ফটিক সোমের স্ত্রী–পুত্রকন্যার বুকফাটা কান্নাকে যেন ব্যঙ্গ করে।

মনে হয়, ঘটনাটি ছিলো পূর্বপরিকল্পিত।

ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী ঘটনাটির কথা শুনেছিলেন যুদ্ধের পরে। তাঁর জেঠতুতো জ্ঞাতি ভাই সুনীল সোমের কাছে।

ইতিহাসে আমরা অনেক কুখ্যাত জল্লাদের কাহিনী পড়েছি। চেঙ্গিজ খান, হালাকু খানের কীর্তির কালো রঙ মানুষের ইতিহাসের কলঙ্ক। হিটলারের অনুসারী আর সেনাবাহিনীর নরনির্যাতন তার দোসর। একালের জল্লাদ জাতি মার্কিনীরা হিরোশিমা–নাগাসাকিতে, ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামে যে নরমেধ যজ্ঞ করেছে, তার জন্যে তাদের আমরা এই সেদিন অবধি জেনেছি পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত বর্বর জাতি বলে। কিন্তু 'একাত্তরে পাকিস্তানী জল্লাদরা তাদের ওপরও টেক্কা মারে। হয়ে ওঠে সর্ব কালের ঘৃণিততম জাতি। ওপরের ঘটনা কটি তো তারই সামান্য কিন্তু অকাট্য প্রমাণ।

অথচ ওই পাকিস্তানীরা আজও ভালোমানুষ সেজে পৃথিবীতে বিরাজ করছে।

একদিনের কথা। হংকং থেকে ব্যাংকক আসছি। আমার সহযাত্রীদের কয়েকজন পাকিস্তানী আর্মি অফিসার। একজন বসে আছে আমার ঠিক বাম পাশের সীটে। ঝিলমের সেই লোকটির সাথে খুচরো কিছু কথা হয়। মাঝে মাঝে সে দুই–একটি গা–জ্বালানো কথা বলছিলো। যেমন, স্বাধীন হয়ে আমরা নাকি অনেক পিছিয়ে পড়েছি। বিমানে বসে ঝগড়া বাধানো কোনো ক্রমেই উচিত নয়। আমি তাই নিজেকে যতো দূর সম্ভব সংযত করে জবাব দিই, একদম উলটো কথা। আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। আমাদের দেশে এসে দেখে যেতে পারো।

লাঞ্চের সময় দেখি, লোকটি মাংস খায়নি। নেহাৎই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতে যাওয়া অনুচিত। তবু আমি কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারিনে, তার মাংস না খাওয়ার কারণটা জানতে চাই। এই অনুচিত প্রশ্নটিতে আমার একটু লাভও হয়। পাকিস্তানীদের চরিত্রটা আবার বুঝতে পারি।

লোকটি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলে, হালাল কিয়া নেহি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা ব্যঙ্গাত্মক জবাব আসে ঃ 'একাত্তরে বাংলাদেশে যারা নজিরবিহীন নিষ্ঠুরতার সাথে নির্বিচারে নরহত্যা করেছে, তারাও হালাল-হারাম মানে নাকি? কিন্তু আমি তো বিমানে বসে ঝগড়া বাধাতে চাইনি। জবাবটা তাই মনেই চেপে রেখে শুধু বলি, ও।

হানা ঘরে ঘরে

কিন্তু আমি চেপে গেলেই কি কথাগুলো মিথ্যে? আসলে তো তারা কিছুই মানে না। তাদের নির্দিষ্ট নীতি বলতে আছে কেবল আধিপত্যবাদ। তারই এক নগ্ন প্রকাশ ঘটেছিলো 'একাত্তরে বাংলাদেশে জাতি নির্যাতনে। ব্যক্তি বাঙালী থেকে শুরু করে তার পরিবার, তার গ্রাম-গঞ্জ-শহর, শেষে সারা দেশে যা বিস্তারিত হয়, ২৫ মার্চের কালো রাত থেকেই।

এই জাতি নির্যাতনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার সাধ্য আমার নেই, একথা গোড়াতেই স্বীকার করেছি। তবু এতোক্ষণ যা বললাম, তাতে হয়তো তার কিছুটা নমুনা পাওয়া যাবে। বিবৃত কাহিনীগুলিতে নমুনার চরিত্রগত পুনরাবৃত্তি এক-আধটু ঘটলেও। সেই পুনরাবৃত্তির জের টেনে পাকিস্তানী নির্যাতনের আরো কিছু কাহিনী যদি এখানে সংযোজিত করি, উক্ত নির্যাতন সম্পর্কে একালের তরুণ বাঙালীদের ধারণা হয়তো স্পষ্টতর হবে। বিশেষতঃ ২৫ মার্চের কালো রাত্রি এবং পরবর্তী কয়েকটি দিনের গণহত্যার পরেকার

ঘটনাবলীর ব্যাপারে। যাতে ব্যক্তি-বাঙালীর ওপর নির্যাতনও একটি ধারায় গণহত্যার রূপ নেয় প্রতিটি পর্যায়েই সন্ত্রাসমূলক আধিপত্য বিস্তার প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবে।

উক্ত ধারার কথায় এবার আমার প্রথমেই মনে পড়ছে রাজশাহী শহরের সাগরপাড়ার এক পরিবারের ঘটনা। তার বর্ণনা দিয়েছেন সুচরিতা সেনগুপ্ত। ঘটনার অন্যতম শিকার সুধীরকান্তি সেনগুপ্তের বড়ো মেয়ে, আমার প্রতিবেশিনী কল্পনা ধর গুপ্তের মাধ্যমে।

সুধীরকান্তি সেনগুপ্ত ছিলেন প্রাদেশিক সরকারের পশুপালন বিভাগের অফিসার। তাঁর ছয়জনের সংসার। স্বামী-স্ত্রী, দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ছেলেমেয়েদের সবাই ছাত্রছাত্রী। চট্টগ্রামের পটিয়ার মানুষ সুধীরকান্তি তাদের নিয়ে সাগরপাড়ার এক ভাড়া বাড়ীতে নির্ঝঞ্ঝাটেই দিন কাটাতেন। তাঁর বাড়ীওয়ালা মুর্শিদাবাদের লালগোলা থেকে আসা এক মোহাজের ভদ্রলোক। তাঁরা দুই সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও দুটি পরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিলো বেশ।

২৫ মার্চের কালো রাত্রির পর তাঁদের নির্ঝঞ্ঝাট জীবনে বিপর্যয়ের সূচনা ঘটে,—যেমন ঘটে তখনকার আর সব বাঙালীর জীবনেই। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দেখা যায়, রাজশাহী শহরে দারুণ উত্তেজনা। সাগরপাড়ার লোকজন তো রীতিমতো সন্ত্রস্ত। সুধীরকান্তি আর তাঁর বাড়ীওয়ালা আর তাঁদের এলাকায় থাকতে সাহস পান না। ৮ এপ্রিল ভোরে তাঁদের পরিবার দুটি সাগরপাড়ার বাসা ছেড়ে দিয়ে গিয়ে ওঠেন তালপট্টির মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী হীরালালের বাড়ীতে। সামান্য কিছু দরকারী জিনিষ ছাড়া আর সবই সাগরপাড়ায় ফেলে রেখে।

কিন্তু তালপট্টিতে স্বস্তি মেলে না। বরং দেখা যায় পরিস্থিতি আরো খারাপ। তাই দেখে সুধীরকান্তির বাড়ীওয়ালা বলেন, তিনি সপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। মুর্শিদাবাদের লালগোলায়। সেখানে তাঁর মা এবং কয়েকটি ভাইবোন থাকেন। সহৃদয় বাড়ীওয়ালা সুধীরকান্তিকে প্রস্তাব দেন, আপনারাও চলুন আমাদের সাথে।

কিন্তু সুধীরকান্তি দেশ ছাড়তে রাজী নন। তবে জানান, তাঁর পরিবারের অন্য কেউ যেতে চাইলে যেতে পারে।

তাঁর অনুমতি পেয়ে বড়ো মেয়ে সুচরিতা, ছোটো ছেলে সুভাষ আর ছোটো মেয়ে সবিতা সকালবেলা বাড়ীওয়ালার সঙ্গে রাজশাহী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। পায়ে হেঁটে চলে যায় গোদাগাড়ি ঘাটে। সেখান থেকে নৌকোয় পদ্মা পার হয়ে

আবার হাঁটতে হাঁটতে লালগোলায়।

ওপারের যাত্রা তাদের নির্বিঘ্নই ছিলো, পায়ে হাঁটার কষ্টটুকুর কথা বাদ দিলে। কিন্তু এপারে তাদের পড়তে হয় দ্বিমুখী বিপদে। পথে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অবাঙালী ভেবে মেরে ফেলতে চায়। আর, বিহারীরা মারতে আসে তারা বাঙালী বলে। এই দ্বিমুখী বিপদ কাটাতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

সুচরিতারা লালগোলায় বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে কাটায় মাত্র কয়েক দিন। তারপর চলে যায় আত্মীয়স্বজনের কাছে। সেখানে তারা ভালো হালেই ছিলো। শুধু একটুখানি উদ্বেগ ছাড়া। তাদের ওপারে পৌছনোর কথা বাবা–মা জানতে পারেননি, তারাও তাঁদের কোনো খবর পায়নি।

মাস ছয়েক পর একদিন হঠাৎ তারা শোনে, দাদা সুব্রত একা, বিচ্ছিন্নভাবে, ব্যারাকপুর চলে গেছে। রাজশাহীর প্রতিবেশী চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আহমদ শরীফের সহায়তায়। ডাঃ শরীফও ছিলেন সুধীরকান্তির মতো চট্টগ্রামের পটিয়ার মানুষ।

তারা আরো খবর পায়, তাদের মাও চলে গেছেন ব্যারাকপুরে। এক দালালের সাহায্যে। উঠেছেন তাঁর ছোটো ভাইয়ের বাসায়।

এ–পর্যন্ত সবই ভালো খবর।

তবে, এগুলি তো মূল ঘটনার আনুষঙ্গিক কথা মাত্র। সুধীরকান্তির স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের দিন ওপারে ভালোভাবেই কাটে। কিন্তু তাঁর কি হয়?

তিন ছেলেমেয়ে রাজশাহী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তিনি হীরালালের বাড়ীতেই থেকে যান। সস্ত্রীক—এবং মোটামুটি হিসেবে নিরাপদেই। তারপর, ২০ এপ্রিল, হীরালালের বাড়ীতে এসে হাজির হয় এক ছদ্মবেশী যমদূত। লোকটির নাম মনসুর। সে ছিলো সুধীরকান্তির সাগরপাড়ার বাসার পাশের এক বাড়ীর ভাড়াটে। প্রতিবেশী হিসেবে তিনি তাকে খুব ভালোবাসতেন। সে এসে ভালোমানুষের মতো জানতে চায়, তাঁর ছেলেমেয়ে কোথায়। লোকটি অবশ্যি তাঁর খোঁজ রাখতো। কিন্তু তিনি সেসব জানেন না। তার মতলব বুঝতে না পেরে তাকে সব কথা খুলে বলেন। শুধু তা–ই নয়, তাকে সাদরে নিমন্ত্রণ জানান, দুপুরে আমার এখানে খাবে।

মনসুর কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেনি। সুধীরকান্তি তার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ না খেয়ে বসে ছিলেন। হয়তো মনসুরের এমনি কাণ্ডের দরুন সুধীরকান্তির মন তখন খুব অশান্ত। ছেলেমেয়েদের জন্যে দুশ্চিন্তায়। স্ত্রীকে বলে দা, বঁটি ইত্যাদি অস্ত্রজাতীয় সমস্ত জিনিষ লুকিয়ে ফেলেন। যাতে এসবের

কারণে কোনো বিপদে পড়তে না হয়।

তবু বিপদ আসে।

তখন বিকেল পাঁচটা। হঠাৎ কে যেন দরজায় কড়া নাড়ে। তাতে সাড়া দিয়ে হীরালাল দরজা খোলেন। দেখেন, সামনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পাঞ্জাবী, বিহারী আর স্থানীয় মুসলমান। তারা জানতে চায়, হীরালাল কোথায়?

তিনি জবাব দেন, আমিই হীরালাল।

আগন্তুকরা এবার বলে, আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।

হীরালাল তাতে আপত্তি জানান।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! তারা জোর করে তাঁর হাত–পা বেঁধে ফেলে। তারপর আবার জানতে চায়, বাড়ীতে আর কে আছে?

তিনি জানান, আর এক বাবু আছেন।

আগন্তুকরা আর কিছু না বলে তাঁকে নিয়ে চলে যায়।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আবার দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ।

এবার সুধীরকান্তিই দরজা খোলেন। এবং দেখেন, সেই পুরোণো দল। তাদের কথাও পুরোণো, আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।

তারপরই তারা তাঁর গামছা কেড়ে নিয়ে তাঁকে বেঁধে ফেলে। তিনি তখনই হাত–মুখ ধুয়ে এসেছেন। গামছাখানা তাঁর হাতেই ছিলো।

সুধীরকান্তিকে নিয়ে যাওয়ার পর হানাদারগুলি আরো একবার আসে। রাত্তিরে। এবারে তারা হীরালাল আর সুধীরকান্তির স্ত্রীদের ধরে নিয়ে যায়। বাড়ীতে তখন অনেক সোনাদানা, হীরালালের অন্যান্য প্রচুর দামী জিনিষ এবং বেশ কিছু ছাগল আর মুরগী ছিলো। হানাদাররা সবই লুট করে বাড়ীটায় তালা দিয়ে রাখে।

হানাদাররা মহিলা দুজনকে পাড়ার এক বিহারীর টিনের চালাঘরে নিয়ে গিয়ে তোলে। সেখানে হীরালাল আর সুধীরকান্তির সঙ্গে দেখা। ঘরে শহরের আরো কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন। সবারই হাত বাঁধা। তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন।

সুধীরকান্তি একটু পর স্ত্রীকে বলেন, তুমি এখান থেকে চলে যাও। নইলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। ওদের কথা শুনেছো? ওরা বলাবলি করছে, আওরতরা বুড়ী আছে, ওদের ছেড়ে দাও।

কথাগুলির অর্থ যা–ই হোক, মহিলা দুজন চলে আসেন।

আসবার সময় সুধীরকান্তির স্ত্রী দেখেন, একজন পাঞ্জাবী তাঁর স্বামীকে

ডেকে আলাদা করে নিয়ে বলছে, তুমি হিন্দু, না, মুসলমান?

মহিলা দুজন বাড়ী আসেন। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারেন না। সদর দরজায় তালা লাগানো।

তাঁরা আর সইতে পারেন না। কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারপর শুরু করেন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি! একটুখানি আশ্রয়ের সন্ধানে।

এক সময় দুজনে এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকে পড়েন। তাঁদের দেখে বাড়ীর কর্ত্রী এগিয়ে আসেন। তাঁদের পরিচয় জানতে চান। তাঁরা তাঁকে সব কথা খুলে বলেন।

তাতে কিন্তু ফল হয় প্রত্যাশার বিপরীত। কর্ত্রী বলেন, আপনারা হিন্দু। এখানে আপনাদের আশ্রয় দিলে আমাদের বিপদ হবে।

ঠিক এই সময় তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ান বাড়ীর বউ। তিনি সুধীরকান্তির স্ত্রীকে চিনতে পারেন। সুধীরকান্তির মেয়ে তাঁর মেয়ের বান্ধবী। এই পরিচয় পেয়ে তিনি দুজনকে ঘরে ডেকে নেন। তাঁদের আশ্রয় মেলে।

পরে ডাঃ আহমদ শরীফ লোকমুখে খবরটা শোনেন। এবং সহৃদয় প্রতিবেশী আবার এগিয়ে আসেন প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালনে, তাঁর সহজাত কর্তব্যবোধ নিয়ে। সুধীরকান্তি তখন তাঁর নাগালের বাইরে। অন্যের বাড়ীতে আশ্রিতা বন্ধুপত্নীকে ডাঃ আহমদ শরীফ নিয়ে যান রাজশাহী সরকারী হাসপাতালে। নকল রোগী বানিয়ে।

সুধীরকান্তির স্ত্রী হাসপাতালে ছিলেন এক মাস। এর মধ্যে স্বামীর কোনো খবর পাননি। শুধু জানতেন, বড়ো ছেলে সুব্রত ডাঃ আহমদ শরীফের সহায়তায় আগরতলা চলে গেছে।

একদিন তিনিও রওনা হন ওপারের দিকে। দালাল ধরে। গিয়ে ওঠেন ব্যারাকপুরে। সেখানে দেখা হয় সুব্রতর সাথে। অন্য ছেলেমেয়ের সঙ্গেও। তখন সবার খবরাখবর বিনিময় হয়।

খবর মেলে না শুধু একজনের। সুধীরকান্তির।

তাঁর খবর পাওয়া যায় সুব্রতর দেশ ছাড়বার অনেক পরে। তিনি সব খবরের অতীত। তারা শোনে, তাঁর লাশটিরও কোনো সন্ধান মেলেনি।

তবে, হীরালালের লাশ নাকি পাওয়া গিয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকেই এক বধ্যস্থলে পরিণত হার্ডিঞ্জ ব্রীজে।

সুধীরকান্তির পরিবার দেশে ফেরে বছরখানেক পর। একেবারে নিঃসহায়, নিঃসম্বল হয়ে। দেশে কিছু সরকারী সাহায্য অবশ্যি মেলে। কিন্তু তা সামান্যই।

তাদের তাই বাঁচতে হয় সংগ্রাম করে। যেভাবে বেঁচেছিলো নেত্রকোনার ডাঃ মিহির সেনের পরিবার। দেশের মাটি আঁকড়ে ধরে থেকে।

এখন সুধীরকান্তির ছেলেমেয়েদের সবাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। বড়ো ছেলে সুব্রত বিসিকে চাকরি করে। তার উপরি পরিচয়, সে রেডিয়ো বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের গীতিকার। বড়ো মেয়ে সুচরিতা এম.এ. এবং বি.এড. পাশ করবার পর আইন পড়ছে। সে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। ছায়ানটে আছে। ছোটো ছেলে সুভাষও চাকরি করে। সে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক। দাদার মতো তারও উপরি পরিচয় আছে। সে লেখক এবং সাংবাদিক। ছোটো মেয়ে সবিতা দর্শনে এম.এ.। সেও চাকরি করে। ভারতীয় হাই কমিশনে।

বাবা আজ তাদের আনন্দের মধ্যে স্থায়ী খাদের মতো বিষাদ হয়ে মিশে আছেন।

দিনটা কি খারাপ ছিলো

সুধীরকান্তি সেনগুপ্তর ছেলেমেয়েদের সেই বিষাদের সাথে জড়িত দিনটি—৮ এপ্রিল—কি খারাপ ছিলো?

সাধারণভাবে নিতে গেলে প্রশ্নটিকে মনে হবে কুসংস্কারঘেঁষা। কিন্তু এই দিন সুধীরকান্তির সাথে হীরালালসহ রাজশাহী শহরের আর যেসব মানুষ হানাদারদের হাতে ধরা পড়েছিলেন, তাঁদের কাছে কি ওটা ভালো ছিলো? কিংবা কুমিল্লা শহরের কটি পরিবারের কাছে? দিন তো ভালো-মন্দ লোকভেদে, ঘটনাভেদে। ৮ এপ্রিল অনেকের নিশ্চয়ই ভালোভাবে কেটেছে। কিন্তু সুধীরকান্তি, হীরালাল আর তাঁদের সহবন্দীদের জীবনে ওটি ছিলো সবচেয়ে খারাপ দিন। কুমিল্লা শহরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনেও।

সেদিন হানাদাররা সেখানকার বেশ কটি হিন্দু বাড়ীতে হানা দেয়। বিশেষ করে কান্দিরপাড়ে।

কুমিল্লার ঘরে ঘরে হানা অবশ্যি শুরু হয়েছিলো ২৫ মার্চের কালো রাতেই। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ীতে হানা। পাকিস্তান আমলের এক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ধীরেন্দ্রনাথ এদেশের রাজনীতিতে পরিচিত ব্যক্তি। বলতে গেলে তাঁকে দিয়েই শুরু হয় আমাদের ভাষা আন্দোলন,– যে–আন্দোলন ছিলো মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। তিনি ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে দাবী তোলেন, ইংরেজী আর উর্দূর সাথে বাংলাও পরিষদের এক ভাষা হোক। এই সাহসী বাংলাভাষা প্রেমিককে হানাদাররা কালো রাতেই কুমিল্লায় তাঁর ধর্মসাগরপাড়ের বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে যায়, তাঁর ছেলেসহ। তারপর তাঁরা আর ফেরেননি। তাঁর কাহিনী সবাই জানেন।

ফিরে আসেননি কান্দিরপাড়ের অতীন্দ্রনাথ ভদ্রও। তিনি তখন ছিলেন কুমিল্লার পাবলিক প্রসিকিউটর। থাকতেন বাদুড়তলায়। ৮ এপ্রিল রাত আটটায় হঠাৎ তাঁর বাসার সামনে এসে দাঁড়ায় একখানা ট্রাক। তাতে কিছু হানাদার। তারা অতীন্দ্রনাথের স্ত্রী এবং দুটি মেয়েকে কাঁদিয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় ট্রাকে।

ওই ট্রাকেই হানাদাররা আরো তুলে নিয়েছিলো কান্দিরপাড়ের শিশিরেন্দ্র দাশগুপ্ত ওরফে রানাকে। কুমিল্লার প্রখ্যাত জমিদার ভূধর দাশগুপ্তের নাতি, তেত্রিশ বছরের তরুণ শিশিরেন্দ্র জমিদার ছাড়াও ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এবং এক 'অপরাধী'। দালালরা হানাদারদের খবর দিয়েছিলো, তাঁর এক ভাই মুক্তিবাহিনীতে গেছে। সেই খবরে ক্ষ্যাপা, হানাদাররা রাত্তিরে ট্রাক এনে তাঁকে ঘর থেকে টেনে বার করে। বয়েসের ভারে অথর্ব মা, স্ত্রী আর কিশোরবয়েসী দুটি ছেলেমেয়ের সামনে, তাদের কান্না আর কাকুতি–মিনতিতে কানে তূলো দিয়ে রেখে। মা তখন সংজ্ঞা হারান।

শিশিরেন্দ্রর মা ধাক্কাটা শেষ পর্যন্ত সইতে পারেননি। দিন সাত–আট পরই তিনি মারা যান।

ইতিমধ্যে শিশিরেন্দ্র একবার ফিরে এসেছিলেন। ১৩ এপ্রিল। হানাদারদের কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে। কিন্তু তারপর তাঁকে আবার ধরে নিয়ে যায় ২২ এপ্রিল। তিনি আর ফিরে আসেননি।

শিশিরেন্দ্রকে যেদিন প্রথম হানাদাররা ধরে নিয়ে যায়, সেদিন তাঁর স্ত্রী জ্ঞান হারাননি। কিন্তু হয়ে যান স্তব্ধ, নির্বাক। পরদিন স্ত্রীর দেখা দেয়

মস্তিষ্কবিকৃতি। তিনি যাকে সামনে পান, তাকেই জাপটে ধরে ঘরে টেনে তুলে দরজা বন্ধ করে দেন। ছেলেমেয়ে দুটিকে ঘর থেকে বেরুতে দেন না। ভয়ার্ত, বিভ্রান্ত চোখে চেয়ে বলেন, ওই এলো রে! এবার তোদের ধরে নিয়ে যাবে, মেরে ফেলবে।

বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর ছেলেমেয়েরা মাকে সারাক্ষণ ঘরে আটকে রাখতো। খাবার যুগিয়েছে মেয়ে, সেই বন্ধ ঘরেই। এইভাবে কেটে যায় মাস ছয়েক। তারপর একদিন মেয়ে রাতের খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে, মা চিত হয়ে পড়ে আছেন মেঝের ওপর। তাঁর ব্যবহারের থালাখানা বুকের ওপর রেখে। দেহে প্রাণ নেই।

ছেলেমেয়ে দুটি এবার একেবারেই অনাথ হয়। তাদের দিনও কাটে অনাথের মতো। যুদ্ধের পর কাকা তাদের সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। আজও তারা কাকার কাছেই আছে। তাঁর ঢাকার বাসায়।

শিশিরেন্দ্র আর অতীন্দ্রনাথকে যেদিন ধরা হয়, কুমিল্লায় ঘাতকরা ঘরে ঘরে হানা দিয়েছে তারপরও, মাঝে মাঝেই। বিশেষ করে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়ীতে। তার ফলে নিখোঁজ হয়েছেন অনেকেই। কেউ কেউ বা অসহায়ের মতো প্রাণ হারান তাঁদের বাড়ীর সামনেই।

শহরের বিশিষ্ট বাসিন্দা এম.সি. রায় চৌধুরীও থাকতেন কান্দিরপাড়ে। একদিন রাত্তিরে কারফিউয়ের মধ্যে হানাদাররা আসে তাঁদের বাড়ীতে। ঘর থেকে টেনে বার করে তাঁকে আর তাঁর ছেলেকে। তারপর রাস্তায় নিয়ে গিয়ে তাঁদের উদ্দেশে চালায় গুলি। পরদিন যতোক্ষণ কারফিউ না ওঠে, তাঁদের লাশ রাস্তায়ই পড়ে থাকে।

একদিন যমদূতেরা হানা দেয় সুপারীবাগানের একটি বাড়ীতে। সেখানে থাকতেন অধ্যাপক অজিত গুহর ভাইপো বেণু গুহ, অল্পবয়েসী স্ত্রী আর তিনটি শিশুসন্তান নিয়ে। যমদূতগুলি বেণু গুহকে পাকড়াও করে। তারপর থেকে তাঁর আর কোনো খবর নেই।

রায় বাহাদুর অতীন্দ্র রায়ের ছেলে অসীম রায় ছিলেন বাগিচাগাঁ এলাকায়। শুধু স্ত্রীকে নিয়ে। একদিন হানাদারদের আবির্ভাব ঘটে তাঁর বাসায়। তারা তাঁকে তুলে নিয়ে যায় তাদের গাড়ীতে। স্ত্রীকে খালি বাসায় অসহায় হালে রেখে। অসীম রায়ের পাশের বাসার বাসিন্দারা ছিলেন সহৃদয় এবং সাহসী। তাঁর স্ত্রীকে তখনকার মতো উদ্ধার করেন তাঁরাই, তাঁদের বাসায় আশ্রয় দিয়ে। বলা বাহুল্য, অসীম রায়ও আর ফিরে আসেননি।

২৯ এপ্রিল যমদূতেরা আসে কান্দিরপাড় যতীন্দ্র ভদ্রের বাড়ীতে। এবারে আর শুধু ধরপাকড় নয়। তারা আসে সংক্ষেপে কাজ হাসিলের কুমতলব নিয়ে, যেমন এসেছিলো এম.সি.রায় চৌধুরীর বাড়ীতে। তারা তাঁর দুই ছেলেকে তাঁর সামনেই হত্যা করে। এবং লাশ দুটি তাঁকে দিয়েই ট্রাকে ওঠায়। তারপর তাঁকেও ট্রাকে তুলে নিয়ে চলে যায়।

যতীন্দ্র ভদ্রের স্ত্রী স্বামী আর ছেলেদের শোকে পাগল হয়ে যান।

এমনি কতো করুণ ঘটনা ঘটেছে 'একাত্তরে! শুধু রাজশাহীতে আর কুমিল্লায় নয়, সারা বাংলাদেশে।

মিনি আকারে গণহত্যা

এই যে বাড়ী বাড়ী ঢুকে মানুষ ধরা, মানুষ মারা,—'একাত্তরের জাতি নির্যাতনের ইতিহাসে এগুলি গুরুত্বে অনুপেক্ষ্য, মর্মান্তিকও বটে, কিন্তু ঘটনা হিসেবে ছোটো। ২৫ মার্চের কালো রাত থেকে এদেশে এমন ঘটনা ঘটেছে শত শত। বড়ো বড়ো হত্যাকাণ্ডের—গণহত্যার—পাশাপাশি। স্থানীয় বা সাময়িক বিবেচনায় এগুলিকে আমরা কখনো কখনো ভেবেছি জাতি নির্যাতনের মূলধারা সন্ত্রাসবাদী গণমেধ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে।

কিন্তু আসলে কি ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন ছিলো? তা-ই যদি হয়, তাহলে ঘরে ঘরে হানার সময় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিবার নিধনের ঘটনাকে কি বলবো? তেমন হত্যালীলা তো 'একাত্তরে কিছু কম ঘটেনি। এবং বিচার করলে দেখা যাবে, এগুলির মূলেও ছিলো হানাদারদের গণহত্যার প্রবণতা।

যেমন দেখি বাগেরহাটের একটি হত্যালীলায়। যার অন্যতম শিকার ছিলেন কবি আবুল হোসেনের বাবা রিটায়ার্ড পুলিস অফিসার, পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ ইসমাইল হোসেন। এটি ঘটে ২৪ এপ্রিল। এই ঘটনা এবং ইসমাইল হোসেনের

সব কথা আমাকে জানিয়েছেন আবুল হোসেন নিজে।

ঘটনাটি বিচিত্র। এতে হানাদারদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিলেন ইসমাইল হোসেন তথা তাঁর পরিবার। কিন্তু হত্যালীলার সময় দেখা যায়, মৃত্যুপথে তাঁর সহযাত্রীদের ভেতর বাইরের মানুষই বেশী। যার ফলে ব্যাপারটি মিনি আকারের এক গণহত্যার রূপ নেয়। অন্য দিকে, এ-ঘটনা ভিন্ন এক কারণে স্মরণীয়। সে-কারণ ব্যক্তি ইসমাইল হোসেন। তিনি ছিলেন এক অসমসাহসী, অতি শক্তিধর আর বর্ণিল চরিত্রের মানুষ। এবং তাঁর জীবনের কিছু ঘটনার দরুন প্রায় কিংবদন্তীর পুরুষ।

তাঁর কথাই আগে বলি।

ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী এবং দুর্দান্ত প্রকৃতির। এই প্রকৃতি তাঁর অভিধান থেকে 'ঝুঁকি' শব্দটি মুছে ফেলেছিলো। আর, তাই আমরা যাকে ঝুঁকির ব্যাপার বলি, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তিনি কখনো তার পরিণাম নিয়ে ক্ষণমাত্রও চিন্তা করেননি। এমনকি, তার পরেও। যদিও এ-জাতীয় হঠকারিতার ফলে একাধিক বার তাঁর প্রাণসংশয় দেখা দিয়েছে।

একদিনের কথা।

তাঁরা তখন থাকেন সে-আমলের ঢাকার পুরোণো এক এলাকায়। বাসার ঝি ছিলো ঢাকাইয়া মহিলা, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হত মামা। সেদিন সেই মামা বাসার কূয়োর পাড়ে বসে বাসন মাজছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইসমাইল হোসেনের ছোটো মেয়ে। আর, তিনি বারান্দায় বসে মুখ ধুচ্ছেন। হঠাৎ এক সময় মামা চীৎকার করে ওঠে, খুকী কূয়োয় পড়ে গেছে।

ইসমাইল হোসেন কথাটা শোনামাত্র লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে আসেন। তারপরই, কোনো কিছু না ভেবে, কূয়োতে ঝাঁপ। এবং ভেতরে পড়ে তিনি মেয়েকে দু'হাতে তুলে ধরেন।

সেদিন বাপ-মেয়ে দুজনেরই জীবন যেন অলৌকিকভাবে রক্ষা পায়।

আর একবার এমনি অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান চোর ধরতে গিয়ে।

না, সরকারী দায়িত্বে চোর ধরবার ব্যাপার সেটা ছিলো না, ছিলো তাঁরই বাড়ীর। তখন তিনি রাণাঘাট শহরে। টিপটিপে বৃষ্টিতে ভেজা ঘুটঘুটে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে শেষ রাতের দিকে তাঁর বাসায় চোর ঢোকে। আবহাওয়ার কারণে তাঁরা তখন ঘুমে বিভোর। এদিকে, চোর জানতো না, ঘরটি বাঘের। সে তাই নিশ্চিন্ত মনে আর নির্বিঘ্নে ঘরের বাক্স-প্যাঁটরা পাচার করতে থাকে।

কিন্তু এক সময় হঠাৎ একটা বিপত্তি ঘটে। চোর তখন শেষ বাক্সটি ঘর থেকে বার করছে। সেটি দরজার চৌকাঠে লেগে একটুখানি আওয়াজ হয়। আর, তাতেই ইসমাইল হোসেনের ঘুম ভেঙে যায়। এবং তিনি সন্দেহবশতঃ ঘরের ভেতর চোখ ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সুতরাং আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। বালিশের পাশেই তাঁর রিভলবার রয়েছে। সেটির কথাও মনে আসে না। তিনি খালি হাতেই ধাওয়া করেন চোরকে। পচা পাতা আর বৃষ্টির পানিতে স্যাৎসেঁতে হয়ে থাকা কাঁচা রাস্তা ধরে।

চোরকে একটু পরই পাওয়া যায়। তার মাথায় ট্রাঙ্ক। ইসমাইল হোসেন টান মেরে ট্রাঙ্কটা ফেলে দিয়ে চোরকে পাকড়াও করেন। তারপর দুজনে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। তারই মধ্যে তিনি চীৎকার করে লোকজন ডাকতে থাকেন। কিন্তু জায়গাটির আশপাশে কোনো বাড়ীঘর নেই। তার ওপর, বৃষ্টির আওয়াজ তাঁর চীৎকার তলিয়ে দেয়। তাঁর ডাকে তাই কারো সাড়া মেলে না।

উঁহু, ভুল বলা হল। অন্ততঃ একজনের সাড়া মেলে। সে চোরের এক অগ্রগামী সঙ্গী। ইসমাইল হোসেনের চীৎকার শুনে সে এগিয়ে আসে। তাঁরা তখন ধস্তাধস্তি করতে করতে একটা গর্তে পড়ে গেছেন। লোকটা ব্যাপার বুঝে কোথা থেকে জানি একটা বাঁশ এনে ইসমাইল হোসেনকে পেটাতে থাকে। অন্ধকারে চীৎকারের উৎসে আন্দাজ করে। কিন্তু ধস্তাধস্তির কারণে উৎস সব সময় ঠিক থাকে না। তাই বাঁশের বাড়ি একবার যদি পড়ে ইসমাইল হোসেনের গায়ে তো পরের বারে পড়ে চোরের গায়ে।

এমনি কাণ্ড চলে বেশ কিছুক্ষণ।

ইতিমধ্যে ইসমাইল হোসেনের স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন, স্বামীর ঘর খালি। আর, সেই ঘর এবং বাড়ীর বাইরের দরজা খোলা। এদিকে, দূর থেকে ইসমাইল হোসেনের গলার একটা ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যায়। বেগম ইসমাইল হোসেন আর দেরী করেন না। একটা লণ্ঠন নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে আওয়াজের উৎসের দিকে বেরিয়ে পড়েন।

তাঁকে লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসতে দেখে চোরের সঙ্গীটা বাঁশ ফেলে সরে পড়ে। ততোক্ষণে কয়েকজন লোকও জেগে উঠেছে। তারা এসে চোরসহ ইসমাইল হোসেনকে গর্ত থেকে টেনে তোলে। তিনি তখন গুরুতরভাবে আহত। হাত–পায়ে, বুকে পিঠে দারুণ জখম। কোনো আঙুলে নখ বলতে কিছু নেই।

সেবার তাঁর সেরে উঠতে সময় লেগেছিলো তিন মাস।

এর থেকেও সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছিলেন তিনি অন্য এক ঘটনায়।

কুষ্টিয়া শহর থেকে পার্শ্ববর্তী মীরপুর থানা এলাকায় যাওয়ার পথে।

তিনি যাচ্ছিলেন একখানা জীপে চেপে। পথে তার সামনে পড়ে একটা গরু। সেই গরুকে বাঁচাতে গিয়ে জীপ যেন নিজেই মরে। রাস্তা থেকে উলটে গিয়ে পড়ে পাশের খাদে। আর, ইসমাইল হোসেন ছিটকে চলে যান তার থেকেও দূরে, মাঠে। কিন্তু তিনি এতো বড়ো দুর্ঘটনার পরও একদম নির্বিকার। ভূমিশয্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ের ধূলো-মাটি ঝেড়েঝুড়ে রাস্তায় উঠে আসেন। কিছুক্ষণ পর এক সাইকেল-আরোহীর সাথে দেখা। ইসমাইল হোসেন তার সাইকেলখানা চেয়ে নেন। তারপর তাতে চেপে আট মাইল পথ পাড়ি দিয়ে শহরের বাসায় ফিরে আসা। এমন একটা ভাব নিয়ে, যেন কিছুই হয়নি!

কিন্তু কিছু হয়েছিলো বৈকি। এবং সেই 'কিছু' যে কেমন, তা বোঝা যায় একটু পরই। যখন ডাক্তার এসে বলেন, তাঁর বুকের মাত্র আটখানা হাড় ভেঙে গেছে!

ওই কুষ্টিয়া শহরে থাকাকালেই তিনি একবার অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন।

ঘটনাটা ১৯৩৭ সালের। শহরের মোহিনী মিলস নামের কাপড় কলের শ্রমিকেরা কোনো কারণে মালিকদের ওপর ক্ষেপে গেছে। তার ফল ঘেরাও, মালিকেরা বিপন্ন। খবর পেয়ে ইসমাইল হোসেন ঘোড়া নিয়ে ছুট দেন মিলের দিকে। একেবারে একা। শুধু তাঁর রিভলবারটি নিয়ে।

তারপর তাঁর যা কাম্য, তা-ই ঘটে। তাঁকে একা পেয়ে শ্রমিকেরা তাঁর ওপরও চড়াও হতে পারতো। কিন্তু তিনি অতো কথা ভেবে তাদের সামনে যাননি। শ্রমিকদের মাথায়ও তেমন কিছু আসে না। তারা তাঁর হাতের রিভলবারটি দেখেই রণে ভঙ্গ দেয়।

আর একদিনের কথা। সেটা 'তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের।

ইসমাইল হোসেন সেদিন সন্ধ্যেবেলা সপরিবারে সার্কাস দেখতে গেছেন। কিন্তু ঘন্টাখানেক সার্কাস দেখবার পর তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। স্ত্রীকে বলেন, আমার একটা কাজ আছে। সেরে আসি। কিন্তু আমার জন্যে তোমরা অপেক্ষা করো না। শো'র পর সোজা বাসায় চলে যেয়ো। আমার ফিরতে দেরী হবে।

তা-দেরী হয়েছিলোও বটে। স্ত্রী তাঁকে ভালো করেই চিনতেন। তাই রাত জেগে বসে ছিলেন। ইসমাইল হোসেন ফেরেন শেষ রাতে। একখানা গরুর গাড়ীতে চেপে। কিন্তু একা নয়। কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা চার-পাঁচজন ডাকাত সঙ্গে নিয়ে। তাঁর এক আরদালি আর হাবিলদারও আছে সাথে। তবে, সে-দুজন

গাড়ীতে শায়িত। তাদের একজনের মাথা রামদা'র কোপে ফাটা, অন্যজনের উরু বর্শার ঘায়ে এফোঁড় ওফোঁড়। কথায় কথায় জানা যায়, রামদা আর বর্শা দুটোরই মূল লক্ষ্য ছিলেন ইসমাইল হোসেন।

হ্যাঁ, তিনি সার্কাসের তাঁবু থেকে বেরিয়েছিলেন ডাকাতদের বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিত অভিযানে।

চাকরিজীবনের এই জাঁদরেল পুলিস অফিসার ইসমাইল হোসেনের ব্যক্তিগত জীবন ছিলো বিচিত্র। সে–জীবনের নানা অভ্যাস আর প্রবণতা তাঁকে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত মহলে এক বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। যার জন্যে তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর এলাকায় তো তিনি বহু মানুষের দৃষ্টির এক কেন্দ্রবিন্দু।

তাঁর এই মর্যাদার একটি কারণ অতিথিপরায়ণতা। তবে, অতিথিপরায়ণতা বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি, তাঁর ক্ষেত্রে তা ছিলো ভিন্ন ধরনের। বাড়ীতে অপ্রত্যাশিত কোনো অতিথি এলে তার সাদর আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি ঘটেনি অবশ্যই। কিন্তু সেটা তো সব সজ্জন গৃহস্থ পরিবারেরই সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। ইসমাইল হোসেনের ব্যাপারটা ব্যতিক্রমী। বাড়ীতে অতিথি না থাকলে তাঁর যেন মনই ভরতো না। তিনি তাই প্রায় যখন তখন এবং যেখান সেখান থেকে অতিথি ধরে এনেছেন। বাসায় তাৎক্ষণিক পরিবেশনের উপযোগী খাবার আছে কিনা, তা না ভেবেই। ফলে বহু ক্ষেত্রে তাঁর অপ্রস্তুত গৃহিণীকে অসময়ে অতিথি আপ্যায়নের প্রস্তুতিতে লেগে যেতে হয়েছে। ভদ্রমহিলার প্রায় সারাটি সংসার জীবনই এমনি ব্যস্ততায় কাটে।

ইসমাইল হোসেন স্বভাবগতভাবেই ছিলেন মিশুক। এবং মেলামেশার ব্যাপারে বয়েস বা সম্পর্কের বিচার করেছেন তিনি কদাচিৎ। বয়েস এবং মর্যাদায় তাঁর থেকে ছোটো, এমন ব্যক্তির সাথেও আড্ডা দিতেন সমবয়েসীর মতো। কবি আবুল হোসেন এমনি এক ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাঁর এক স্মৃতিচারণমূলক রচনায়। ইসমাইল হোসেনের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। আছেন ময়মনসিংহ শহরে। সেখানকার অফিসার্স ক্লাবে একদিন তাসের আড্ডা বসে। তাতে ইসমাইল হোসেনের সঙ্গী তাঁর ছেলের কয়েকজন বন্ধু। এবং সবাই তাঁর অর্ধেক বয়সের। তাদের নিয়ে তাঁর আড্ডা চলে এক নাগাড়ে তিন দিন তিন রাত। আর, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কারো চোখে এক ফোঁটা ঘুম ছিলো না!

ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছিলেন খেলাধূলোর ভক্ত। তখন তাঁর পড়াশোনার থেকে অনেক বেশী মনোযোগ আর উৎসাহ দেখা গেছে নানারকম খেলাধূলোয়।

এসবের জন্যে তিনি জীবনে বহু পুরস্কার পান। সারদা পুলিস ট্রেণিং কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে তিনি হন চ্যাম্পিয়ন তথা সবার সেরা খেলোয়াড়। দৌড়ে তাঁর ছিলো বিশেষ খ্যাতি। লোকে বলতো, তিনি দৌড়ে শেয়াল ধরতে পারতেন। বয়েস বৃদ্ধির সাথে সাথে খেলাধূলোয় তাঁর তৎপরতা কমে আসতে থাকে। কিন্তু মধ্যযৌবনেও ফুটবল খেলেছেন পরম উৎসাহে আর কৃতিত্বের সঙ্গে। প্রাগ্‌বিভাগকালের নদীয়া জেলার পুলিস দল এক সময় ফুটবলে খুব নাম করে। তাদের ফুটবল টিমটির সংগঠক ছিলেন ইসমাইল হোসেন। তখনকার অনেক নামী ফুটবল খেলোয়াড়—আব্বাস মীর্জা আর তাঁর ভাই আখতার মীর্জা, খুলনার আবদুস সবুর খান প্রমুখ—ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের সবাই নদীয়া পুলিসের ফুটবল টিমে খেলেছেন।

ইসমাইল হোসেনের পরিচিতিতে আর একটি কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। তাঁর খাদ্য–পানীয়ের তালিকায় অন্যতম প্রধান আইটেম ছিলো সিগারেট। কিন্তু শুধু সিগারেট বললে আইটেমটির গুরুত্ব বোঝা যাবে না। তিনি ছিলেন দামী সিগারেটের ভক্ত। আর, সেই বস্তু তাঁর মুখে থাকতো সর্বক্ষণ, ঘুমের সময় ছাড়া। এবং এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর দেশলাইয়ের কাঠি পুড়েছে মাত্র একটি। সকালবেলার প্রথম সিগারেটটি ধরানোর কালে।

এমনি নানান ঘটনা, নানান ব্যাপারই তাঁকে পরিণত করেছিলো কিংবদন্তীর পুরুষে।

এহেন ইসমাইল হোসেন কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরও ঈর্ষণীয় স্বাস্থ্য নিয়ে দিনাতিপাত করছিলেন। তাঁর ছেলেরা তখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, মেয়েরা সুপাত্রস্থ। বৈষয়িক কোনো চিন্তাও তাঁর ছিলো না। পঁচাত্তর বছরের ইসমাইল হোসেনের জীবনের বাকী দিনগুলিও নিশ্চিন্তে, বিনা বিপর্যয়ে কেটে যাবে, এই–ই ছিলো সবার ধারণা।

তবু একদিন বিপর্যয় আসে। এবং তা চরম। 'একাত্তরের আরো অসংখ্য বাঙালীর জীবনের বিপর্যয়ের মতো।

২৫ মার্চে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যখন বাংলাদেশে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যালীলা শুরু করে, ইসমাইল হোসেন তখন খুলনায়, আত্মীয়–পরিজনের সাথে। হত্যালীলার খবরে তিনি রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তারপর খুলনায় হানাদার বাহিনীর তৎপরতা তাঁর উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়। তখন তিনি আর খুলনা শহরে থাকা নিরাপদ মনে করেননি। সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর বাগেরহাট শহরের বাড়ীতে চলে যাবেন। শহরটি তখনও হানাদারমুক্ত ছিলো। আত্মীয়–পরিজন

তাঁকে অবশ্যি বারণ করেন। কিন্তু সারা জীবন স্বমতের অনুসারী ইসমাইল হোসেন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। বাগেরহাটে কেউ তাঁর কিছু করতে পারবে না, এই ধারণার বশে।

তিনি বাগেরহাটের বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি। বাড়ীটায় তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক এবং সেই শ্যালকের পরিবার। তাঁর তাই তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি।

দিন কয়েক পর, ২৪ এপ্রিল, হঠাৎ শহরে হানাদারদের আবির্ভাব ঘটে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় সন্ত্রাসরাজ কায়েমের অভিযান।

ইসমাইল হোসেনের বাড়ীতেও তারা আসে সেই দিনই সকালবেলা। এক বার নয়, তিন বার। এক ঘন্টা পর পর। পরে শোনা গেছে, তাদের কাছে নাকি দালাল মারফত পাওয়া খবর ছিলো, তিনি মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেন।

হানাদাররা প্রথম আসে সকাল আটটায়। তারপর নয়টায়। এক–এক বারে এক–এক দল। দু'বারই তারা সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে ফিরে যায়। ইসমাইল হোসেন প্রথম বারের হানার পরই বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু সাহসী মানুষটির সেকথা মনেই আসেনি। এমনকি, দ্বিতীয় হানার পরও। হয়তো দ্বিতীয় হানাতেও কিছুই হয়নি দেখে তাঁর সাহস বেড়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু তৃতীয় হানায় এর জন্যে তাঁকে খেসারত দিতে হয়। সেবারের হানাদার দলটি আসে বেলা দশটায়। তারা আর জিজ্ঞাসাবাদের বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেনি। তাঁকে সোজা ঘর থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এসেছে। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালকসহ। বন্দী হন অবশ্যি আরো দুজন মানুষ। তবে, তাঁরা ইসমাইল হোসেনের বাড়ীর কেউ নন। দুজনই ছিলেন রিকশাচালক। হানাদারদের ভয়ে কিছুক্ষণ আগে রিকশা ফেলে রেখে তাঁরা তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নেন। এ যেন টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাসা বাঁধা।

হানাদাররা তাঁদের চারজনকে বাড়ীর উঠোনে এনে দাঁড় করায়।

একটু পরই তাদের আরো দুটি শিকার জোটে। দুজন পথচারী। তাঁরা তখন ইসমাইল হোসেনের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। হানাদাররা ছুটে গিয়ে তাঁদেরও ধরে আনে। এবং ইসমাইল হোসেনদের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়।

তারপর সবাইকে লক্ষ্য করে অমোঘ ব্রাশফায়ার।

ঘটনাটা বাড়ীর অন্য লোকজন–মহিলারা–নিরাপদ দূরত্ব থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছিলেন। যেখানে উঠোনের কোনো কথা ভালো করে শোনা যায় না।

ব্রাশফায়ারের ফলাফল বোঝাও সম্ভব নয়। তাঁরা শুধু দেখেন, ব্রাশফায়ারে সব বন্দীই পড়ে গেছেন। অন্যেরা হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। কিন্তু ইসমাইল হোসেন রক্তাক্ত দেহে একবার উঠে দাঁড়ান। তর্জনী উঁচিয়ে জল্লাদদের উদ্দেশে কি যেন বলেন। উত্তরে তারা আবার গুলি চালায়। ইসমাইল হোসেনও আবার পড়ে যান। তারপর আর ওঠেননি।

দ্বিতীয় হামলার পর তাঁর ধড়ে প্রাণ ছিলো কিনা–কিংবা থাকলেও কতোক্ষণ ছিলো,–কেউ জানে না। কেননা, ভয়ে অনেকক্ষণ কেউ তাঁদের কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি। ছয়টি লাশ সাত–আট ঘন্টা উঠোনে পড়ে ছিলো।

আবুল হোসেন ঢাকায় খবরটা পান পরদিন। তাঁর এক বন্ধু, ফায়ার সার্ভিসের ডেপুটি ডাইরেক্টর কে. রহমান সাহেবের কাছ থেকে, ফোনে। কিন্তু সরকারী চাকুরে, তখন প্রাদেশিক তথ্য বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক, আবুল হোসেন ভয়ে অনেক দিন দুঃসংবাদটি আত্মীয়–পরিজন ছাড়া কাউকে জানাননি। মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখেন।

প্রসঙ্গতঃ, তিনি বাগেরহাটের আরো একটি মর্মান্তিক খবর পেয়েছিলেন। তবে, অনেক পরে। সেটি তাঁকে জানান তাঁর আর এক পরিচিতজন, এনামুল হক। তাঁর বাবা যখন শহীদ হন, এনামুল হক তখন বাগেরহাটে এস.ডি.ও. ছিলেন। আবুল হোসেনকে তিনি জানান, ওই দিন বাগেরহাট শহরে আরো বহু লোক মারা যায়। তাঁর হিসেবে একশোর ওপর।

চণ্ডীপুরে চণ্ডলীলা

বাড়ী বাড়ী ঢুকে হত্যালীলা চালানোর ঘটনামালায় ইসমাইল হোসেনের বাড়ীর ওই ঘটনাকে যদি বলি মিনি আকারের গণহত্যা, তাহলে তার আট দিন আগে সংঘটিত চণ্ডীপুরের হত্যালীলাকে কি বলবো? এই ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী

এবং নেহাৎই দৈবক্রমে বেঁচে-যাওয়া মীর শওকত আজিজ (মিঠু) পরোক্ষভাবে এর তুলনা করেছেন কারবালার হত্যাকাণ্ডের সাথে। প্রায় চৌদ্দোশো বছর আগে ফোরাত নদীর তীরে সংঘটিত সেই হত্যা-অভিযানের শিকার ছিলেন হজরত হোসেন আর তাঁর আত্মীয়-পরিজন। তাতে সরাসরি কতোজন শহীদ হন, আমরা জানিনে। কিন্তু চণ্ডীপুরের চণ্ডলীলায় একই দিনে এবং জায়গায় প্রাণ দেন দুটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বিখ্যাত পরিবারের দশজন সদস্য। এবং যাঁরা আহত হয়েছিলেন, পরে তাঁদের তিনজন মারা যান। মিঠুর তুলনাটি তাই একেবারে অযথার্থ নয়।

মিঠু-বর্ণিত ঘটনাটির শিকার পরিবারগুলির একাংশ ছিলো তাঁর পিতৃকুলের, একাংশ মাতৃকুলের। অংশ দুটি পরস্পরের আত্মীয় বৈবাহিক সূত্রে। মিঠুর বাবা এবং সেজো চাচা বিয়ে করেন বর্তমানে ভেড়ামারার শহরতলি চণ্ডীপুরের মরহুম ফতেহ্ আলী পণ্ডিতের দুই মেয়েকে। ফতেহ্ আলী পণ্ডিতও ছিলেন, ইসমাইল হোসেনের মতোই, এক কিংবদন্তীর পুরুষ। ভেড়ামারা এলাকায় বৃটীশ আমলের অনগ্রসর মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, তিনি ভেড়ামারা বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভেড়ামারা ঈদগাহ্সহ বেশ কটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পর পর কয়েক বার ভেড়ামারা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হন।

ভেড়ামারার মীর বংশও ও-অঞ্চলে সুপরিচিত। তাঁদের পৈতৃক ভিটে ছিলো বর্তমান দাখেলী মাদ্রসার পাশে। পরে তাঁরা চণ্ডীপুরে চলে যান। চণ্ডীপুরের চণ্ডলীলার বর্ণনাদাতা, এখন পলাশ সার কারখানায় কর্মরত মীর শওকত আজিজ ওরফে মিঠু এই বংশেরই সন্তান। সম্পর্কে ফতেহ্ আলী পণ্ডিতের দৌহিত্র। ঘটনার সময় তাঁর বয়েস ছিলো দশ। কিন্তু সেদিনের এবং তার আগের আর পরেকার সব কথাই তাঁর মনে গভীর দাগ কেটে যায়। স্মৃতিচারণ করতে আজও তাই তিনি শোকাবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে মিঠুর বাবা মীর জালালউদ্দীন ছিলেন ঈশ্বরদীতে রেলওয়ের লোকো বিভাগের কর্মচারী। সপরিবারে সেখানকারই লোকো কলোনিতে থাকতেন। 'সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল জয়ের পরও ইয়াহিয়া খান যখন ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করেন, তখন দেশের আর সব জায়গার মতো ঈশ্বরদীতেও দেখা যায় উত্তাল গণ আন্দোলন। শহরটি ছিলো বিহারীদের এক বড়ো ঘাঁটি। তারা তাই এই গণ আন্দোলনের সময়ও

বাঙালীদের সাথে নানারকম বৈরী আচরণ করতে থাকে। এমনকি, হত্যার হুমকিও দেয়। ছা-পোষা মানুষ, উচ্চ রক্তচাপের রোগী মীর জালালউদ্দীন তাতে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

তারপর, মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময়, তাঁর উদ্বেগ আরো বেড়ে যায়। যখন বাইরের নানা জায়গার খবরাখবর আসতে থাকে। এক সময় তাঁরা শোনেন, সান্তাহার আর পাবর্তীপুরে বাঙালী-বিহারী দাঙ্গা শুরু হয়েছে। তখন আর তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। বড়ো দুই মেয়ে আর ছেলে মিঠুকে ঈশ্বরদীর পাশের গ্রাম পাতিলখালীতে তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রেখে আসেন। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে। লোকো কলোনির বাসায় থাকেন শুধু স্বামী-স্ত্রী, বড়ো ছেলেটিকে নিয়ে।

ক্রমে ঈশ্বরদী আরো বিপদজনক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, ২৫ মার্চের পর। মীর জালালউদ্দীন এবার বাসা ছাড়েন। সপরিবারে, এপ্রিলের দু'তারিখে। তাঁর এক নিকট প্রতিবেশীর সাথে। দুই পরিবার টমটমযোগে ভেড়ামারার দিকে চলে আসে।

ভেড়ামারা তখনও মুক্ত এলাকা। তবু মীর জালালউদ্দীনের আশংকা, শহরটি যে কোনো সময় শত্রুর হানার লক্ষ্যস্থল হতে পারে। তিনি তাই ভেড়ামারায় পৈতৃক বাড়ীতে ওঠেন না, চলে যান চণ্ডীপুরে শ্বশুরবাড়ীতে। ঈশ্বরদীর প্রতিবেশী ভদ্রলোকের লক্ষ্য ছিলো অবশ্যি পার্শ্ববর্তী গ্রাম ধরমপুর।

ফতেহ্ আলী পণ্ডিতের দুই পক্ষ। প্রথম স্ত্রীর বড়ো ছেলে তখন থাকেন আলাদা, নিজের বাড়ীতে। তাঁর তিন ভাইয়ের বাসও আলাদা বাড়ীতে, পৈতৃক বাড়ীর সামনেকার রাস্তার উত্তর পাশে। দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলের বাস পৈতৃক ভিটেতেই। তাঁরা-বড়ো ছেলে শফীউদ্দীন আর ছোটো ছেলে আতিয়ার রহমান-সংসারের কাজকর্ম আর চাষবাস দেখাশোনা করেন। মীর জালালউদ্দীন যখন শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে ওঠেন, তার আগেই তাঁর ছোটো শ্যালিকা দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানে এসেছিলেন। তাঁরা থাকতেন পার্বতীপুরে। বাপের বাড়ীতে আসবার পর অসহযোগ আন্দোলনের কারণে ট্রেণ চলাচল বন্ধ থাকায় ফিরে যেতে পারেননি। সে যা-ই হোক, মীর জালালউদ্দীন যাওয়ার পর ফতেহ্ আলী পণ্ডিত আর তাঁর ছেলেদের বাচ্চাকাচ্চার কলকাকলিতে কয়েকটি বাড়ীতে যেন উৎসব-উৎসব ভাব দেখা দেয়।

হায়, কে জানতো, ক'দিন পরই বাড়ীগুলির এই উৎসব-উৎসব ভাব শোকের পাথারে তলিয়ে যাবে!

মীর জালালউদ্দীন চণ্ডীপুরে যাওয়ার পর দিন সাত-আট নিরাপদেই কাটে। তারপরই খবর আসে, পাকিস্তানী হানাদাররা নগরবাড়ী ঘাট পার হয়ে পাবনা এবং ঈশ্বরদী দখল করে নিয়েছে। আর, সেসব জায়গার বিহারীদের সাথে মিলে চালাচ্ছে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ আর গণহত্যা। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ভেড়ামারা তথা কুষ্টিয়া।

সেই লক্ষ্যের দিকে এগুনোর আগে হানাদাররা পাকশীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচে জমায়েত হয়। তারপর এপারে, ভেড়ামারা ফেরি ঘাটে ই.পি.আর., পুলিস আর জনতার সাথে সরাসরি সংগ্রাম। বাঙালীদের দিক থেকে এই সংগ্রাম ছিলো প্রবল প্রতিরোধের।

কিন্তু তাঁদের প্রতিরোধ ভারী সমরাস্ত্রের অভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তারা প্রতিরোধ ভেঙে ভেড়ামারা ফেরি ঘাট আর হার্ডিঞ্জ ব্রীজের পশ্চিম মাথার ই.পি.আর. ক্যাম্প দখল করে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ষোলোদাগে হানা। ষোলোদাগ, ভেড়ামারা আর চণ্ডীপুরের বাসিন্দারা তখন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সরে যেতে থাকে।

পরিস্থিতি যখন এমনি, তখন একদিন, ১৫ এপ্রিল, মীর জালালউদ্দীনের সেজো ভাই, ফতেহ্ আলী পণ্ডিতের আর এক জামাই, মীর আবুল হোসেনও ভেড়ামারা থেকে সপরিবারে শ্বশুরবাড়ীতে এসে ওঠেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই দিন বিকেলেই ফতেহ্ আলী পণ্ডিতের বাড়ীর উৎসব-উৎসব ভাবটা দীর্ণ হয়ে যায়। গোলাগুলির ভয়ে। বাড়ীর সবাই তখন ঘর ছেড়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু হঠাৎ মীর আবুল হোসেনের বড়ো ছেলে বাবলু ভেড়ামারা থেকে এসে বলে, এ-জায়গাটা নিরাপদ নয়। খান সেনারা ভেড়ামারা-কুষ্টিয়া সড়ক দিয়ে যাবে। আমাদের এখন উচিত মেজো মামার বাড়ীতে গিয়ে ওঠা।

মেজো মামা মানে ফতেহ্ আলী পণ্ডিতের দ্বিতীয় পক্ষের মেজো ছেলে দলিলউদ্দীন। তখন ফরিদপুরের কোনো থানার পুলিস। তিনি পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে রেললাইনের পশ্চিম পাশে আলাদা বাড়ী করেছিলেন। পৈতৃক বাড়ী রেললাইনের পূব পাশে, ভেড়ামারা-কুষ্টিয়া সড়কের কাছে। কিন্তু দলিলউদ্দীনের বাড়ী সড়ক থেকে বেশ দূরে।

বাবলুর কথা শুনে সবাই সেই বাড়ীর দিকে ছুট দেয়।

কিন্তু নিরাপত্তা সেখানেও মেলে না।

সন্ধ্যে তখন সবে একটু গাঢ় হয়েছে। এমনি সময় হঠাৎ শোনা যায়,

ভেড়ামারা থেকে কিছু বিহারী বাঙালীদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে রেললাইনের পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসছে। পথে যে বাঙালীকে পাচ্ছে, তাকেই খুন করছে। সুতরাং আবার সবার ছুট। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে।

মিঠুরা এবার গিয়ে ওঠেন চন্দনা নদীর পাড়ে, তাঁদের এক কালের জমিদার অনিলকুমার সরকারের বাড়ীর ঘাটে। রাতটা ছিলো সম্ভবতঃ কৃষ্ণপক্ষের। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পরিবেশ আর পরিস্থিতির কারণে যা রীতিমতো ভয়ংকর। তার ভয়ংকরতাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে ডাহুকের ডাকের সঙ্গতসহ ঝিঁঝি পোকার অবিরাম ঐকতান। মিঠু বলেন, রাত্তিরে ঝিঁঝি আর ডাহুকের সম্মিলিত ডাক শুনলে আজও, 'একাত্তরের বিশ বছর পরও, তিনি আঁতকে ওঠেন, তাঁর গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। ১৫ এপ্রিলের সেই ভয়াবহ অন্ধকারে তাঁরা বিশ–পঁচিশজন মানুষ কিভাবে যে ঘাটে বসে ছিলেন, তা ভাবতেও তাঁর ভয় লাগে।

তবু রাতটা তাঁদের নিরাপদেই কাটে। রাত ন'টা–সাড়ে ন'টার একটি ঘটনার কথা বাদ দিলে। সেই সময় হঠাৎ একটা শেলিং হয়। তাতে চারদিক আলোয় ভরে যায়। পরে মিঠুরা শুনেছিলেন, ওই শেলিংয়ের আঘাতে আলতাফুননেসা নামে তাঁদের গ্রামের এক মহিলা শহীদ হন।

তেমন কোনো বিপদ না ঘটলেও মিঠুদের মনে হচ্ছিলো, রাতটা যেন দুঃস্বপ্নের। সেই রাত যেন কাটতে চায় না। চন্দনার ঘাটে নৌকো বাঁধা ছিলো। নৌকোখানা খুলে তাঁরা ওপারে হিড়িমদিয়া গ্রামে গিয়ে উঠলে হয়তো সব দুশ্চিন্তা কেটে যেতো। কিন্তু কথাটা ভাবলেও সেটা মন থেকে সরিয়ে রাখেন। বিশেষ করে মিঠুর মায়ের কারণে। তিনি তখন আসন্নপ্রসবা। এবং সারা দিন তাঁর অনেক ধকল গেছে। আবার ছোটাছুটি করলে বিপদ হতে পারে।

তবে, ওপারে না গেলেও রাত্তিরে তাঁরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন, ঘাটে আর থাকবেন না। কারণ, জায়গাটি একটু ফাঁকা। যদিও এলাকাটা ঘন বাঁশঝাড় আর জঙ্গলে ভরা। এদিকে, গোটা ভেড়ামারা–চণ্ডীপুরে থমথমে ভাব। কয়েক দিনের মধ্যে কোনো মসজিদে নামাজ হয়নি। ইসলামের ধ্বজাধারীরা ইসলামকে রক্ষা করতে এসে কিছু মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ফাঁকা জায়গায় থাকার ঝুঁকি নেয়া চলে না। মিঠুরা তাই পরদিন অর্থাৎ ১৬ এপ্রিল সূর্যোদয়ের একটু আগে একটা গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেন। গর্তটা ছিলো ঘাটের কাছেই এবং বেশ বড়ো।

তাঁরা গর্তে একটু গুছিয়ে বসবার কিছু পরই শুরু হয় গুলি। একেবারে বৃষ্টির মতো। বেলা সাতটা–সাড়ে সাতটায়। মিঠুদের বুঝতে বাকী থাকে না, চণ্ডীপুরে হানাদারদের বিরাট বাহিনী ঢুকে পড়েছে। এখন আর করবার কিছুই নেই। তাঁরা তাই কানে আঙুল দিয়ে চুপচাপ বসে থাকেন। বড়োরা মনে মনে দোয়া–দরুদ পড়েন।

এভাবে মিনিট কয়েক কাটতে না কাটতেই মীর জালালউদ্দীনের একটা আর্ত চীৎকার শোনা যায়। সবাই বুঝতে পারেন, তাঁকে পাকিস্তানী পশুরা হত্যা করেছে। তাঁরা তাই জোরে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' বলে ওঠেন। আর মিঠুর মনে হয়, এবার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, তাঁরা বাড়ী ফিরতে পারবেন।

ছেলেমানুষ মিঠুর ধারণাটা যে কতো বড়ো ভুল ছিলো, তা বোঝা যায় পরক্ষণেই। যখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে হাসি–হাসি মুখে মাথা তুলে গর্তের আশপাশে চোখ ফেলেন। দেখা যায়, তাঁর একেবারে সামনেই একটি হানাদার দাঁত বার করে হাসছে আর তার হাতের এল.এম্.জি.–তে ম্যাগাজিন জুড়ছে। মিঠু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে নেন।

আর, ঠিক সেই সময়ই হানাদারটি শুরু করে গুলিবর্ষণ। সেই গুলিবর্ষণ চলে একটানা, অনেকক্ষণ। মিঠুর আন্দাজ, পশুটা অন্ততঃ তিনটি ম্যাগাজিন শেষ করেছিলো।

সে চলে যাওয়ার পর গর্তের মানুষগুলি নিজেদের অবস্থা জানার চেষ্টা করে। মিঠুর প্রথমেই চোখে পড়ে, তাঁর জীবনের দিশারী তথা দার্শনিক ছোটো আপা শাহিদা আহমদ (রুবি) বুকে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। ছোটো মামীর বাম পাঁজরে গুলি লেগে বেরিয়ে গেছে। ওই কোলেই ছিলো তাঁর শিশুপুত্র মিশরু। মেজো মামীও কাত হয়ে পড়ে আছেন। অন্য দুজনের মাথার খুলি উড়ে গেছে। বড়ো মামা আহত অবস্থায় ছটফট করতে করতে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই মারা যান।

এমনিভাবে হিসেব নিয়ে তিনি দেখেন, গর্তের দশজন মৃত, সাতজন আহত।

কিন্তু তিনি অবাক, হতাহতদের মধ্যে তাঁর মা নেই। মা তাহলে কোথায় গেলেন? মিঠু এদিক–ওদিক চেয়ে তাঁকে খুঁজতে থাকেন। এই সময় বড়ো ভাই বলে ওঠেন, বাবা নেই রে। মা ওখানে আছেন।

মিঠু সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে ছুটে যান। দেখেন, মা তাঁর লাশের ওপর পড়ে

আছেন। সারা শরীরে শুধু রক্ত আর রক্ত। তাঁর পেটে আর পিঠে গুলি লেগেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, পেটে লাগা গুলিটা কোনো দিক দিয়েই বেরিয়ে যায়নি।

এদিকে আহতদের মুখে তখন কেবল আর্তনাদ। 'পানি' 'পানি' বলে চীৎকার। যন্ত্রণায় ছটফট করছে সবাই।

বেলা দশটার দিকে মিঠুর ছোটো মামা তাঁদের দেখতে আসেন। ব্যড়ী থেকে আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। সব দেখেশুনে তাঁরা আবার বাড়ী চলে যান। গর্তের মানুষগুলিকে ঘরে নেয়ার ব্যবস্থা করবার কথা বলে। কিন্তু তারপর সারা দিন আর তাঁদের দেখা নেই। গর্তের জীবিত মানুষগুলি তাই দেখে ভাবে, হানাদাররা হয়তো তাঁদেরও শেষ করে ফেলেছে। তাদের এমন ধারণার কারণ, গ্রামে সারা দিনই গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো।

সে যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁরা আসেন। সন্ধ্যের দিকে, গ্রামে হানাদারদের অভিযান শেষ হলে। লাশগুলো অনিল সরকারের বাড়ীর কাছেই রেখে আহতদের নিয়ে ঘরে ফেরেন।

লাশগুলো পরে অনিল সরকারের বাড়ীর আঙিনায় দাফন করা হয়।

এদিকে, আহতদের ঘরে নিয়ে আসবার ঘন্টা কয়েক পর, রাত দশটার দিকে, একজনের মৃত্যু হয়। তিনি মীর জালালউদ্দীনের বড়ো ভাইয়ের তরুণ ছেলে বাবলু। আহত বাবলু মৃত্যুর আগে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।

দু'দিন পর, রবিবারে, মারা যায় আহতদের আরো একজন। মিঠুর এক চাচাতো বোনের মেয়ে, দশ বছরের রীতা। হতাহতদের মধ্যে সে ছিলো সর্বকনিষ্ঠ।

সপ্তাহ দুয়েক পর আহতদের আরো একজনের মৃত্যু হয়। তিনি মিঠুর ছোটো মামী।

মিঠু আমাকে তাঁদের ওপর হামলায় হতাহতদের একটি লিখিত তালিকা দিয়েছেন। মৃত্যুকালীন বয়েস এবং মিঠুর সাথে সম্পর্ক অনুযায়ী নিহতরা হলেন ঃ- মীর জালালউদ্দীন আহমদ (৫৫, বাবা), শাহিদা আহমদ (২৩, বোন), মোহাম্মদ শফীউদ্দীন (৪০, মামা), রাবেয়া খাতুন (৪৫, খালা), জহরা খাতুন (৩০, মেজো মামী), বাবলু (২৮, চাচাতো ভাই), মশিউর রহমান খুশি (১৪, মামাতো ভাই), সেলিনা (১৪, মামাতো বোন), সদরুল আলম সদু (১৮, মামাতো ভাই), ডায়মণ্ড (১৪, চাচাতো বোন), নতুন (১৩, চাচাতো ভাই), রীতা (১০, ভাগ্নী), লিচু (২৫, ছোটো মামী), মীর শফিরউদ্দীন (৭০, বড়ো চাচা), মীর আসাদুজ্জামান (৩৫, চাচাতো ভাই), মীর রশিদুল আলম দুলাল

(৩০, চাচাতো ভাই)।

শেষ পর্যন্ত বেঁচে-যাওয়া আহতদের নাম ঃ- মীর সাজেদা বেগম (৪৪), জাহানারা খাতুন মায়া (৫), আফরোজা খাতুন লুচি (৫) এবং আমীর খসরু (৪)।

ফতেহ্ আলী পণ্ডিত আর মীর জালালউদ্দীনের পরিবার-পরিজনের ওপর হামলা কিন্তু একদিনে শেষ হয়নি। ১৬ এপ্রিলের মর্মান্তিক হত্যালীলার পর পাকিস্তানী শ্বাপদরা তাঁদের ওপর হামলা চালায় আরো দু'বার।

দ্বিতীয় হামলার স্থান পাতিলাখালী, শিকার মিঠুর সেজো চাচার মেজো ছেলে মীর ইফতেখার আলম রাণু (২০)। মিঠুরা রাণুর মৃত্যুসংবাদটি পান আকস্মিকভাবে। একদিন ফতেহ্ আলী পণ্ডিতের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন মিঠুর বাবার সহকর্মী এক ভদ্রলোক। তিনিই সংবাদটি জানান। তারিখটা তিনি বলতে পারেননি। কিন্তু ঘটনার কিছু বিবরণ দেন। রাণুকে গুলি করা হয় পাতিলাখালীর ইটখোলায়। পরে এক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে মিঠুরা জানতে পান, রাণু গুলি খাওয়ার পরও তিন-চার দিন বেঁচে ছিলেন।

যুদ্ধের সময় রাণু ঈশ্বরদী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়তেন। তিনি ছিলেন খুব ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। এবং অতিশয় কৌতুকপ্রিয়। তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার কারণে তিনি ছিলেন পরিবারের সবার—বিশেষ করে, মীর জালালউদ্দীনের অতি স্নেহের পাত্র।

মিঠুদের আত্মীয়-পরিজনের ওপর তৃতীয় বারে হামলা হয় যুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে। এই সময়ই মারা যান বড়ো চাচা, সত্তর বছরের বৃদ্ধ মীর শফিরউদ্দীন এবং তাঁর বড়ো ছেলে মীর আসাদুজ্জামান আর সেজো ছেলে মীর রশিদুল আলম। বড়ো চাচা তখন থাকতেন ভেড়ামারার পুরাতন রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে তাঁর নিজের বাড়ীতে। হানাদাররা একদিন হঠাৎ সেখানে ঢুকে পড়ে ঘর থেকে তাঁদের ডেকে বার করে। তারপরই চালায় গুলি। বর্বর জল্লাদগুলি কিন্তু সেইখানেই ক্ষান্ত হয়নি। আহত মানুষ তিনটির দেহে প্রাণ থাকতেই তারা উঠোনে গর্ত খুঁড়ে তাঁদের পুঁতে ফেলে।

এরপরও কিন্তু তাঁরা কিছুক্ষণ বেঁচে ছিলেন। অন্ততঃ একজন। জল্লাদরা চলে যাওয়ার একটু পর শফিরউদ্দীনের স্ত্রী গর্তের কাছে ছুটে আসেন। দেখেন, গর্তের মাটি নড়ছে। আর, সেজো ছেলে রশীদুল আলম দুলালের একখানা হাত বেরিয়ে আছে। নড়ছে সেখানাও। তাঁদের অবশ্যি আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

মিঠুর শহীদ আত্মীয়-স্বজনের কাহিনীর একটুখানি এখনো বাকী আছে।

জমিদার অনিলকুমার সরকার যুদ্ধের শুরুতেই বাড়ী ছেড়ে ভারতে পালিয়ে

গিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর ফিরে এসে দেখেন, বাড়ীর আঙিনায় দশটি কবর। ফতেহ্ আলী পণ্ডিতের ছেলেদের সাথে পারিবারিক সূত্রে ঘনিষ্ঠ, অনিল বাবু ছিলেন বিচক্ষণ আর সদ্বিবেচক। ১৬ এপ্রিলের চণ্ডলীলার কথা শোনার পর তিনি ফতেহ্ আলী পণ্ডিতের জীবিত ছেলেদের ডেকে বলেন, তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের যে কবরগুলো আমার বাড়ীর আঙিনায় আছে, ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে সেগুলো মর্যাদার বস্তু। কারণ, আমি হিন্দু হলেও তোমাদের সাথে আমার একটা প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে। জাতীয়ভাবেও কবরগুলো মর্যাদার দাবী রাখে। কিন্তু কথা কি, জানো? তোমরা মুসলমান, তোমাদের ধর্মে মৃতদেহ বা কবর খুব পবিত্র। কিন্তু আমরা হিন্দু, আমাদের এখানে ছুঁতমার্গের ব্যাপার আছে। তোমরা কবরগুলো উঠিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করো। তবে, তোমাদের ধর্মে যদি তেমন বিধান না থাকে, তাহলে কবরগুলো যেমন আছে, তেমনি থাক। আমরা ওগুলোকে যতো দূর সম্ভব মর্যাদা দিয়ে চলবো।

ফতেহ্ আলী পণ্ডিতের ছেলেরা এসব কথা শুনে এলাকার বিশিষ্ট আলেমদের পরামর্শ নেন। আলেমরা বিধান দেন, লাশগুলো উঠিয়ে অন্য জায়গায় দাফন করা যেতে পারে।

সুতরাং একদিন লাশ তোলার ব্যবস্থা হয়।

লাশগুলো কবর থেকে বার করবার পর দেখা যায়, সবগুলোই অবিকৃত আছে। শুধু মাথার চুল এবং শরীরের নরম জায়গাগুলি ছাড়া।

তোলা হয়েছিলো মোট নয়টি লাশ।

আবার আপন ঘরে ছোবল

চণ্ডীপুরের এই চণ্ডলীলা—এবং বাগেরহাটে ইসমাইল হোসেনের বাড়ীতে হামলার মতো ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছিলো মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ধরেই। আর, তাতে প্রাণ দিয়েছে শত শত বাঙালী। তবে, যুদ্ধের এক পর্যায়ে ঘরে ঘরে হানার চরিত্র তথা লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটে। যখন দেখা যায়, হানাদারদের পরাজয় অনিবার্য। প্রথম দিকে হানা দিয়েছে প্রধানতঃ পাকিস্তানী সেনারা। তারপর তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে বিশ্বাসঘাতক—ঘরের শত্রু কিছু বাঙালী। দালাল, রাজাকার, আল—শামস, আল—বদর বাহিনীর সদস্যরা। এবং প্রথম দিকে হানাদারদের লক্ষ্য ছিলো সন্ত্রাসরাজ কায়েম। শেষ দিকে, তাদেরই নীল নকশা অনুসারে, এগিয়ে আসে আমাদের ঘরের শত্রুরা। এই নীল নকশার লক্ষ্য ছিলো বুদ্ধিজীবী হনন। স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যোগ্য লোকের অভাবে দেশ যাতে ভেঙে পড়ে।

বুদ্ধিজীবী হত্যার অভিযান বিশেষভাবে চলে ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ বাধবার পর। হানাদাররা যেদিন গ্লানিময় আত্মসমর্পণ করে, সেই ১৬ ডিসেম্বর সকাল অবধি। ডিসেম্বরের বারো—চৌদ্দো দিনে বাঙালী জাতি হারায় অগণিত মূল্যবান প্রাণ। এই সময় হানাদারদের সহযোগীরা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি শহরে গঞ্জে যেন বুদ্ধিজীবী হননের 'মহোৎসব' পালন করে।

তবে, ঢাকার হত্যালীলা ছিলো সবচেয়ে ব্যাপক। এবং নৃশংতার দিক থেকে সবচেয়ে ভয়ংকর। হানাদারদের আত্মসমর্পণের পরবর্তী কয়েক দিনে ঢাকার রায়ের বাজার বিলের পাশ থেকে পূব দিকে সাত মসজিদ অবধি ছড়িয়ে থাকা লাশ আর কঙ্কালগুলি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই অনুধাবন করেছেন, নৃশংসতা কতো দূর পৌঁছতে পারে। সভ্যতার ঘৃণ্যতম শত্রু পাকিস্তানী হানাদারদের সহযোগীকুলের হাতে ঢাকার যেসব বুদ্ধিজীবী প্রাণ হারান, তাঁদের কারো হত্যাই সহজ পন্থায় সাধিত হয়নি। নরপশুরা বাংলাদেশের এই সেরা সন্তানদের বাড়ীতে হানা দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে তাঁদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তারপর চালায় হত্যাযজ্ঞ। চোখ উপড়ে, নাক—ঠোঁট কেটে, গায়ের মাংস টেনে ছিঁড়ে নিয়ে শেষে কানের ভিতর দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে অথবা এমন গুলি মেরে, যা স্ক্রুর মতো ঘুরতে ঘুরতে বুকে বেঁধে। এই

হত্যাযজ্ঞের শিকার ছিলেন কবি–সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী প্রমুখ।

এমনি বুদ্ধিজীবী নিধনের সময় আবার নরপশুরা হানা দেয় আমার এক আপন ঘরে। আর, তার শিকার হয় ড. আবুল কালাম আজাদ। আমার ফুফাতো বোন কোহিনুর বাণুর ছেলে।

আমাদের আপন মহলে অটো নামে পরিচিত, আবুল কালাম আজাদ ছিলো দেশের বিদ্বৎসমাজে একটি শ্রদ্ধেয় নাম। গণিতশাস্ত্রে তার মতো পণ্ডিত বাংলাদেশ খুব কমই পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, তার সেবার, তার পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন যখন এদেশের সবচেয়ে বেশী, তখনই আমরা তাকে হারাই।

আজাদের শৈশবের একটা সময় আমার কোলেই কাটে। তারপরও, তার বিদেশবাসের সময়গুলি ছাড়া, প্রায় সর্বক্ষণ সে আমার কাছাকাছিই থেকেছে এবং আমি তাকে নানাভাবে জানবার অবকাশ পেয়েছি। কিন্তু আর যাঁরা তার সান্নিধ্যে আসেন, আজাদ সম্পর্কে তাঁদের ধারণাও কিছু কম বা অস্পষ্ট নয়। কারণ, সে ছিলো সরল, হাসিখুশী, দিলখোলা মিশুক মানুষ। গণিতশাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেও তা নিয়ে বড়াই করা তো দূরের কথা, সে–বিষয়ে নিজের মুখে কাউকে কখনো কিছু বলতোও না।

তবে, তার মুখে সাহিত্যের আলোচনা শোনা গেছে মাঝে মাঝেই। ইস্কুলে যখন সপ্তম–অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, তখনই সে বাংলা সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত বই পড়ে ফেলেছিলো। পরেও তাকে বিদেশী সাহিত্যের বিশাল বিশাল বই পরম উৎসাহে একটানা পড়তে দেখেছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার অন্যবিধ ভূমিকাও ছিলো। এক সময় সে লোকসঙ্গীত সংগ্রহে মন দেয়। এবং একবার জে.বি.এস হ্যলডেনের একটি প্রবন্ধ বাংলায় রূপান্তরিত করে। অনুবাদটি একখানি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে রাজনীতির সাথেও তার কিছুটা সক্রিয় সম্পর্ক দেখা যায়। রাজনীতিতে সে ছিলো বামপন্থী।

আজাদ সব সময় কথা বলতো যুক্তি দিয়ে। একজন গণিতবিদের পক্ষে যা ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু মতবিরোধ যুক্তিবাদী আজাদের কাছে কখনো মনোমালিন্যের কারণে পরিণত হয়নি। সে কখনো কারো কাছে মুখ ভার করে থেকেছে, কারো প্রতি অহেতুক ঘৃণাবিদ্বেষ পোষণ করেছে, এমন একটি ঘটনাও আমার জানা নেই। বরং মিষ্টি, অমায়িক ব্যবহারের জন্যে সে বন্ধু

পেয়েছে অসংখ্য। নিজেও সে ছিলো অতি মাত্রায় বন্ধুবৎসল। এবং বন্ধুদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। ২৫ মার্চের কালো রাত্রির কিছু দিন পর সে ব্যাঙ্ক থেকে তার সামান্য সঞ্চয়ের প্রায় সবই তুলে নেয়। কোনো প্রাক্তন সহকর্মীর কাছে তার কিছু ঋণ ছিলো। সে-ভদ্রলোক তখন কুমিল্লায়। সেখানে টাকা পাঠানোর সহজ কোনো উপায় নেই। তার কখন্ কি হয়, এই আশঙ্কায় আজাদকে সেদিন বিমর্ষ মুখে ঋণশোধের উপায় খুঁজতে দেখেছি।

এমন মানুষকেও যারা হত্যা করতে পারে, তাদের কি বলবো? 'পশু' তো তাদের জন্যে প্রশংসাসূচক শব্দ। কেননা, পশু অন্যকে হত্যা করে কেবল আত্মরক্ষা বা প্রাণধারণের প্রয়োজনে। কিন্তু হানাদার পাকিস্তানী দস্যু আর তাদের সহযোগীদের প্রয়োজনটা কি ছিলো? তাদের দুষ্কর্মের পরিচায়ক শব্দ বোধ হয় পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই নেই।

আজাদ সারা জীবন সংগ্রাম করেছে। তার বাবা ছিলেন রেলওয়ের চিকিৎসা বিভাগের স্বল্প মাইনের কর্মচারী। চিকিৎসক হিসেবে বাইরে থেকে যা পেতেন, তাও বেশী নয়। অথচ এক সময় তাঁর পরিবারে সদস্যসংখ্যা ছিলো আজাদের নানীসহ এগারো। এই বিরাট সংসারের ভার বহনের কষ্টটা তিনি ভুলে থাকতেন নানাবিধ কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীতের চর্চা করে। আজাদ ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর কষ্টের ভাগ নিতে চেয়েছে। কখনো সাময়িক চাকরি করে, কখনো জলপানির টাকা দিয়ে।

তারা চার ভাই, চার বোন। সে ছিলো সবার বড়ো। ১৯৬৩-তে বাবা আবদুস সোবহানের মৃত্যুর পর সংসারের সব ভার তারই ওপর এসে পড়ে। দুটি বিবাহযোগ্য বোনের চিন্তাসহ। সে তখন সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তবু সে সকল দায়িত্ব বহন করেছে হাসিমুখে, নিজেকে সকল সুখ থেকে বঞ্চিত রেখে। তার সমস্ত শক্তি সে লাগিয়েছিলো মা-ভাইবোনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে। তাদের কথা ভেবেই সে নিজের বিয়ে স্থগিত রেখেছে এবং বিপদের আভাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদেরই জন্যে নিরাপদ কোনো আশ্রয়ে সরে যেতে রাজী হয়নি।

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের ছেলে আজাদ ছাত্রজীবনে বরাবরই অত্যন্ত মেধাবী ছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে রেকর্ডভাঙা নম্বর নিয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে স্বর্ণপদক পায়।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আজাদ ফ্লাইং অফিসারের পদমর্যাদা নিয়ে অধ্যাপক হিসেবে তৎকালীন পাকিস্তান বিমানবাহিনী একাডেমীতে যোগ দেয়।

এক সময় তাকে সেখান থেকে প্রশিক্ষণের জন্যে যুক্তরাজ্যে পাঠানো হয়। বিমানবাহিনীতে বাঙালী আজাদের মেধা এবং কৃতিত্ব অবাঙালীরা ভালো চোখে দেখেনি। এ-কারণে, তাকে অপদস্থ করবার মতলবে তার প্রশিক্ষণের জন্যে এমন একটি বিষয় নির্ধারিত করে, যা ছিলো আজাদের কাছে প্রায় অনধিগম্য। এবং এক্ষেত্রে তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে মাঝপথ থেকেই ফিরিয়ে আনে। এর কিছু কাল পর তারা তার চাকরির মেয়াদ আকস্মিকভাবে শেষ করে দেয়।

এভাবে চাকরি হারিয়ে নিরুপায় আজাদ তখন ঢাকায় প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে চাকরির সন্ধান চেয়ে চিঠি লেখে। তার পুরো জীবনবৃত্তান্ত জানিয়ে। উত্তরে সে কোনো রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই একটি চাকরির জন্যে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পায়। এবং তাতে নির্বাচিত হয়ে পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। এক সময় সে জগন্নাথ মহাবিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের প্রধান ছিলো। সেখান থেকে গণিতশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞের পদমর্যাদায় উন্নত বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা শিক্ষণ কেন্দ্রে (আই.এ.এস.টি.টি) যায়। এই কেন্দ্রে সে বৎসরখানেক ছিলো। এখানে আজাদ তার এক অন্তরে জামাতপন্থী সহকর্মীর বিষনজরে পড়ে। স্বাধীনতার পর লোকটি কর্তৃপক্ষের চোখে ধূলো দিয়ে প্রথমে জনশিক্ষা দফতরের উপপ্রধান এবং তার পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপসচিব হয়। জনশিক্ষা দফতরে যাওয়ার কিছু দিন পর সে একবার অভব্য আচরণের কারণে কয়েকজন সাক্ষাৎকারীর হাতে মার খায়। সহকর্মী হিসেবে সে অবশ্যি আজাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

অধ্যাপকজীবনে আজাদ সরকারী বৃত্তি নিয়ে আর একবার যুক্তরাজ্যে যায়। এবার সে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী, আবহাওয়া বিজ্ঞানে ডক্টরেট এবং তরল পদার্থ সম্পর্কিত বলবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা নেয়। এছাড়া, গণিতশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্যে লণ্ডনের রাজকীয় আবহাওয়াবিজ্ঞান সমিতি, যুক্তরাজ্যের ফলিত গণিত সমিতি এবং বস্টনের আবহাওয়াবিজ্ঞান সমিতির ফেলো নির্বাচিত হয়। ম্যানচেস্টারে সে কিছু দিন খণ্ডকালীন অধ্যাপকও ছিলো। এই সময় একবার ইউরোপে আবহাওয়াবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে সার্বক্ষণিক এবং স্থায়ী অধ্যাপকের পদ দেওয়ারও কথা হয়। কিন্তু মা-ভাইবোনদের কথা ভেবে সে ফিরে আসে।

দেশে ফেরবার পর তার একটি ভালো চাকরি পাওয়ার কথা। লাহোর

বিশ্ববিদ্যালয়ে। চাকরিটার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা তখনকার পাকিস্তানে ছিলো কেবল আজাদের। কিন্তু বাঙালী বলে আজাদ সেটা পায়নি। চাকরিটা দেওয়া হয় তার থেকে কম যোগ্য এক পশ্চিম পাকিস্তানীকে। এই অবিচারের জন্যে আজাদকে একদিন খুব ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখেছি।

'একাত্তরের শেষ দিকে আবার তার ম্যানচেস্টার যাওয়ার কথা ছিলো। দু'বছরের জন্যে। এবার সে অন্য ভাইবোনের ব্যবস্থা করে মা আর ছোটো বোনটিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করছিলো। কিন্তু ঘাতকদের হামলার দরুন সে–আয়োজন শেষ হয়নি।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে ডিসেম্বরের যুদ্ধের আগে কয়েক দিন আজাদের সাথে আমি সাক্ষাৎ যোগাযোগ রাখতে পারিনি। শুধু একবার ফোনে কিছু কথা হয়। এরপর আকস্মিকভাবে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পাই আমার অন্য এক ভাগিনেয়র কাছে, ১৭ ডিসেম্বর। আমি সেদিন পাড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনার আয়োজনে ব্যস্ত। ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা, যতো দূর জানি, সেইটিই প্রথম। কাজের চাপে সেদিন আজাদদের বাসায় যেতে পারিনি। শুধু মুক্তিবাহিনীর কাছে তার সন্ধানের জন্যে অনুরোধ জানাই। পরদিন যখন তাদের বাসায় যাওয়ার উপক্রম করছি, ঠিক তখনই আসে শেষ খবর।

হ্যাঁ, একেবারে শেষ খবর। আজাদ ফিরেছে। কিন্তু নিষ্প্রাণ দেহে, রায়ের বাজারের বিল থেকে। তার দেহ তখন ঘাতকদের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। পিঠ থেকে গাছের ছাল তুলে নেয়ার মতো করে এক ফালি মাংস উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বুকে হৃৎপিন্ডের জায়গায় গভীর গর্ত।

খবরটি শোনামাত্র আমার স্ত্রী কাঁদতে শুরু করেছিলেন। আমার শিশুপুত্রকে কাজের মেয়ের জিম্মায় রেখে তাঁকে নিয়ে কোনো ক্রমে আজিমপুরের ছোটো দায়রা শরীফের দিকে ছুট দিলাম। সেইখানেই আজাদদের বাসা।

আমরা অবশ্যি বাসায় গিয়ে আজাদকে পাইনি। সে তখন গোরস্তানে। সেইখানেই তার শেষ গোসলের ব্যবস্থা হয়েছিলো। স্ত্রীকে আপার কাছে রেখে আমি তাই গোরস্তানে চলে যাই।

আজাদকে তখন কাফন পরানো হচ্ছে। তার বড়ো ভগ্নীপতি তার জখমগুলির সামান্য কিছু বর্ণনা দেয়। আমি আর সেগুলি দেখতে পারিনি। তবে, তার মুখ দেখেছি। বিশেষ করে, কাফন পরানোর পর যখন তাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। মাকে শেষ বার দেখানোর জন্যে। আমার তখন মনে হয়েছে, আজাদ সজীব। যেমন ছিলো ১৫ ডিসেম্বরের আগে। শুধু, চোখ দুটি বন্ধ।

তাদের বাসা ছিলো দরগাসংলগ্ন আবাসিক এলাকায়। সেই দরগার মর্যাদাহানি করে রাজাকার বাহিনীর পাঁচটি খুনী ১৫ ডিসেম্বর সকালে তাদের বাসায় ঢুকে পড়ে। প্রথমে তারা আজাদের সামনে রিভলবার ধরে তাকে নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে অকারণ তল্লাশি চালায়। তারপর নিরপরাধ, বাসিমুখ আজাদকে ধরে নিয়ে যায়।

ছোটো বোনটি তখন তাদের পায়ে ধরেছিলো। আর, মা বার বার তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, বাবা, তোমরা বাঙালী, তোমরাও আমার ছেলে, ওকে তোমরা ছেড়ে দাও। কিন্তু কেউ তাঁর কথা শোনেনি। বরং নরপশুগুলি প্রতি বারই এই বৃদ্ধা নারীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। আজাদকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাদের পেছনে পেছনে বাসার গেট পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে তারা তাঁকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়।

সেদিন তিন ঘন্টার জন্যে কারফিউ উঠে যায়। তখন আজাদের ছোটো ভাই হাবিবুল বাশার আর মেজো ভগ্নীপতি, ইস্টার্ণ নিউজ এজেন্সির মালিক গোলাম রসুল তার সন্ধান নেয়ার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। শেষে তাকে পাওয়া যায় ১৭ ডিসেম্বর, রায়ের বাজার বিলের একটি গর্তের পাড়ে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায়। ডাঃ ফজলে রাব্বিসহ আরো কয়েকজন জ্ঞানী–গুণীর লাশের পাশে। খুনীরা যখন তাকে ধরে নিয়ে যায়, আজাদ তখন মায়ের অনুরোধে বাসার আটপৌরে পোশাক ছেড়ে ভালো পোশাক পরেছিলো। কিন্তু গর্তের পাড়ে তার পরনে কোনো পোশাক দেখা যায়নি। গোলাম রসুল অনেক অনুমানে তার লাশ সনাক্ত করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখবার খুব সাধ ছিলো আজদের। মুক্তিযুদ্ধে সে নানাভাবে সহায়তাও করে। কিন্তু স্বাধীনতা সে দেখে যেতে পারেনি। পেয়েছে কেবল স্বাধীন দেশের মাটি। আর, তার ইচ্ছের কথা জেনে তার সঙ্গে দেওয়া হয়েছিলো স্বাধীন বাংলাদেশের একখানি পতাকা।

সেই পতাকা বুকে নিয়েই সে আজিমপুরের নতুন গোরস্তানে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে থাকে।

এবং তারপর

এবং তারপর আমাদেরও নিশ্চিন্ত মনে থাকার কথা। আজাদের মতো তিরিশ লাখ শহীদের জন্যে শোক, দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতহানির জ্বালা আর লাখো লাখো বাঙালীর ওপর শতবিধ নির্যাতনের যন্ত্রণার কথা বুকে রেখেও। কেননা, আমরা দূরাগত এক নিপীড়ক জাতির কবল থেকে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। যেখানে আমরা, কোটি কোটি বাঙালী, আমাদের আশা-আকাংক্ষার নির্বাধ বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছিলাম দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে।

তা – নিশ্চিন্ত আমরা ছিলামও, আমাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট-অসুবিধা সত্ত্বেও। অন্ততঃ কিছু কাল। যখন আমরা ভেবেছি, আমাদের ওই সব দুঃখ-কষ্ট-অসুবিধা সাময়িক, সেগুলি অনতিকাল পরই কাটিয়ে ওঠা যাবে।

কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ততা যে অন্য এক কারণেও স্বল্পায়ু হতে পারে, তা আমরা ভাবিনি। সে-কারণ আমাদেরই কিছু অনবধানতা তথা অসাবধানতা। 'একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের পর পাকিস্তানী হানাদাররা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু তাদের দোসর ঘাতক জামাতে ইসলামী, রাজাকার বাহিনী ইত্যাদির সদস্যরা আমাদের মাটিতেই থেকে যায়, আমাদেরই ভেতর মিশে গিয়ে। হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর তারা লিফলেট ছড়িয়ে ঘোষণা করেছিলো, এবার তাদের প্রকৃত কাজ শুরু হবে। সেই প্রকৃত কাজের পরিকল্পনা আর তার বাস্তবায়ন গোপনে গোপনে চলছিলোও। যার কিছু আলামত মেলে বড়ো বড়ো পাটগুদামে অগ্নিসংযোগে। কিন্তু আমরা সেসব জেনে এবং দেখেও বস্তুতঃ নিষ্ক্রিয় থেকেছি, সাবধান হতে ভুলে গেছি।

আর, তার জন্যে খেসারত দিতে হয় অচিরেই। আমরা দ্বিজাতি তত্ত্বের পাকিস্তান নামক যে প্রতারণার শিকার ছিলাম তেইশ বছর, তার প্রেতাত্মা আবার বাংলাদেশের ঘাড়ে চেপে বসতে শুরু করে। 'একাত্তরের পর দুটি বছরও না যেতেই।

ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু 'একাত্তরে স্বাধীনতাবিরোধী গণশত্রুদের জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। কেবল নির্দিষ্ট অপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের ছাড়া তাদের আর সবাইকে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক বাস্তবকে মেনে নেয়ার, তার

অগ্রগতি সাধনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য তথা আদর্শগুলিকে বজায় রেখে।

কিন্তু তারপর দেশ–জাতির পুনর্গঠনের তেমন সময় তিনি পান না। স্বাধীনতার পর সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে সেই পুনর্গঠনের সুযোগ কেড়ে নেয়া হয়। এবং তার মাধ্যমে পাকিস্তানী ভূত নবজন্ম লাভের অবকাশ পায়। যখন দেশে একের পর এক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে।

সেই সব পরিবর্তনে সংবিধানের চার মূলনীতির তিনটিরই মৃত্যু ঘটে। উদার অর্থের জাতীয়তাবাদের জায়গা জুড়ে বসে সংকীর্ণ অর্থের বাংলাদেশিতা, সুস্পষ্ট অর্থের সমাজতন্ত্রের বিকল্প হয় নানাবিধ বিতর্কিত অর্থের সামাজিক ন্যায়বিচার। সংবিধান 'বিসমিল্লাহ'–র মুকুট পরে আর ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করে বাঙালীকে ভুলিয়ে দিতে চায়, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয় এবং 'একাত্তরে অমুসলিম বাঙালীরা 'ইসলামের পা'বন্দ' পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলো ইসলাম রক্ষার দায়েও নয়।

কিন্তু শুধু এই সবের কথা বলি কেন? এগুলির থেকেও অনেক বেশী বিষময় ফল ফলেছে 'পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দরুন। বঙ্গবন্ধু–প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতিকে শত নিন্দায় জর্জরিত করেও চারটি সরকার তাকেই বুকে আঁকড়ে থাকে ষোলোটি বছর, গণতন্ত্রকামী মানুষকে ধোঁকা দিয়ে। গণতন্ত্রের নামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পুনরুজ্জীবিত হয় আর 'একাত্তরের ঘাতকরা তাদের পুনর্বাসনের অবাধ সুযোগ পায়। তখন গদি রক্ষার প্রয়োজনে শাসকেরা সেই ঘাতকদের সমর্থন খোঁজেন। প্রশ্রয়–পাওয়া ঘাতকেরা তাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সর্বদা তাঁদের পাশে থাকবে, এই কথা ভেবে। তাতে চিহ্নিত ঘাতক আর দালালেরাও প্রশাসনে কখনো হয় রাষ্ট্রপতি, কখনো উপরাষ্ট্রপতি, কখনো প্রধানমন্ত্রী, কখনো বিশিষ্ট মন্ত্রী বা অন্য কোনো উচ্চ পদের অধিকারী। আর, তারা ধর্মের নামে খুন, ধর্ষণ ইত্যাদির মতো অপরাধে মেতে ওঠে, যেমন উঠেছিলো 'একাত্তরে।

এমনি সব কাণ্ডের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে, মুক্তিযুদ্ধ–পরবর্তী কালের প্রজন্ম। নানাবিধ বিভ্রান্তি তাদের মনে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাকে ঝাপসা করে ফেলে। অনেকে তা ভুলেও যায়। কিংবা তা আঁকড়ে ধরবার সাহস হারায়। আর, তার সুযোগ নিয়ে 'নব্বইয়ের

গণবিস্ফোরণের পরও সংবিধানে 'পঁচাত্তরের পরে সংযোজিত সাম্প্রদায়িক এবং সংকীর্ণতাবাদী ধারাগুলি টিকেই থাকে।

আজাদ হত্যার অপরাধে তিনজন রাজাকারের বিচার এবং ফাঁসির হুকুম হয়। আপীলে দুজন বেকসুর খালাস পায়। আর, একজনের ছ'মাসের জেল হয়। খালাস পাওয়াদের একজন কিছু দিন পর আজাদের বড়ো ভগ্নীপতিকে বলেছিলো, বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না। মুরগীর মতো জবাই করে ফেলবো। —অর্থাৎ আমরা তখন থেকেই আবার ঘাতকদের হুমকির সম্মুখীন।

তবু আমরা আশাবাদী। একারণে যে, অন্ততঃ নতুন প্রজন্মের একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার সন্ধান রাখে। 'নব্বুইয়ের গণবিস্ফোরণের পরও হয়তো তাদের কিছুটা পরাজয় ঘটেছে। কিন্তু লাভও যে একেবারে হয়নি, তা তো নয়। তাই, বিশ্বাস নিয়েই বলা চলে, তারা আবার আন্দোলনে নামবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এই বিশ্বাসের কিছু সমর্থনও আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। যদিও তা আপাততঃ ক্ষীণ। গত সেপ্টেম্বরে আটটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য নামে একটি জোট গঠন করেছে। তাদের দাবী, সংবিধানের আটটি সংশোধনী বজায় রাখা চলবে না। এই সব সংশোধনীর অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক, দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষে দূষিত এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার বিরোধী। তারা সাধারণ ক্ষমা বাতিল এবং 'একাত্তরের ঘাতকদের বিচারও চায়। জোটটি আন্দোলনেও নেমেছে এরই মধ্যে।

তাদের জন্যে আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ঃ তোমাদের জয় হোক।

স্বাধীনতাকামী এদেশের জনগণ ১৯৭১ সালে ইতিহাসের একটি নিষ্ঠুরতম নিপীড়নের শিকার হয় ঘৃণ্য পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনী ও তার দালাল-দোসরদের হাতে। সারা দেশে তখন চলছিল মুক্তিযুদ্ধ, যাতে সামিল হয়েছিল এদেশের জনগণ – কেউ অস্ত্র হাতে সম্মুখসমরে, কেউবা দেশের মধ্যে থেকে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ইস্পাতকঠিন অসহযোগিতা করে। পাকিস্তানী হানাদার সেনাবাহিনী ও তার দালালদের চোখে এরা শত্রু। শহর-গঞ্জ-গ্রাম, যেখানে যাকেই তারা শত্রু মনে করেছে তার উপর নেমে এসেছে অশেষ নির্যাতন, পাশবিক অত্যাচার, উৎপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ। প্রয়াত লেখক আতোয়ার রহমান এই বইটিতে সেই সব নিষ্ঠুরতার কিছু আলেখ্য উপস্থাপন করেছেন, যে নিষ্ঠুরতার বিষাক্ত ছোবল থেকে তাঁর আপন ঘরও রক্ষা পায়নি। এর চরিত্রগুলো বাস্তব, কাহিনীগুলোতেও কল্পনার লেশ মাত্র নেই। আমরা এই বইটি প্রকাশ করে এদেশে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধে নিহত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত সকল মানব-মানবীর প্রতি আমাদের অপরিমেয় ঋণ স্বীকার ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

ISBN 978 984 506 191 9
9 789845 061919